KALLOLER KAL
KALLOL KALI-KALAM PRAGATIR DIN
By Jibendra Sinha Roy

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০

প্রকাশক : শ্রীসুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩

মুদ্রাকর : শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী পান, আদ্যাশক্তি এণ্টারপ্রাইজ
৩২/২ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৬

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগকে কেউ কেউ কল্লোল-যুগ বলেছেন। তাঁরা মনে করেন, কল্লোলের পর্বেই বাংলা সাহিত্যে নতুন কাল নেমে এসেছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক এতটা দাবি না করলেও কবির ভাষায় স্বীকার করেছেন—'কল্লোল কোলাহলে জাগে এক ধ্বনি'। আবার এক প্রখ্যাত সাহিত্যিক, যিনি কল্লোল-চেতনার পূর্বসূরি বলে স্বীকৃত, তিনি আমাদের বলেছেন —কাগজটি অনেক আলোড়ন তুললেও বাংলা সাহিত্যে কল্লোল-যুগ বলে কিছু নেই, ও নিছক ফিকশান। আর বিরোধী দলের অধিনায়ক তো স্পষ্ট করেই বলেছেন—কল্লোলে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো কিছু নয়, আর পাঁচটা পত্রিকা যেমন হয় সেই রকমই পাঁচমিশেলি, থোড়-বড়ি-খাড়া—খাড়া-বড়ি-থোড়। কল্লোল ও বাংলা সাহিত্যে তার ভূমিকা সম্পর্কে এমনিতর নানা মত এখন পর্যন্ত শোনা গেছে।

কল্লোলের জন্মের পর ষাট বছর পার হয়ে গেছে। তার পর কালক্রমে প্রকাশিত হয়েছে—কালি-কলম, প্রগতি ও ধূপছায়া পত্রিকা। এগুলিকে কল্লোলেরই শাখা-স্রোত বলে ধরা হয়। আজ আমরা কল্লোলের কাল থেকে ঐতিহাসিক দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছি। পত্রিকাগুলির ভালো-মন্দ ও তার সাহিত্যিক ভূমিকা সম্পর্কে এখন নিরপেক্ষভাবে বিচার করবার সময় এসেছে। তার জন্য প্রথম প্রয়োজন সমস্ত তথ্যের একত্র সমাবেশ। এই সমস্ত পত্রিকার জীবিত লেখকদের সাহায্যে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুসন্ধান চালিয়ে যে সব তথ্য সংগ্রহ করা যাবে তারই ভিত্তিতে রচনা করতে হবে কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতি ও ধূপছায়ার ইতিহাসকে। সেই ইতিহাস রচনার পর তারই আলোকে এই যুগের সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন এবং পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতিতে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ যদি করতে পারি তবেই বাংলা সাহিত্যে কল্লোল-যুগ বলে কিছু আছে কিনা বোঝা যাবে।

সেই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে আমি পূর্বে 'কল্লোলের কাল' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলাম। বইটি সমালোচক ও পাঠকমহলে গৃহীত হয়েছিলো বলেই কালক্রমে নিঃশেষিত হয়ে যায়। সেই 'কল্লোলের কাল' গ্রন্থেরই সম্প্রসারিত ও পরিমার্জিত রূপ হচ্ছে এই 'কল্লোল কালি-কলম প্রগতির দিন'। আশা করি, এটিও সাহিত্য-রসিক সমাজের সমাদর থেকে বঞ্চিত হবে না।

বর্তমান গ্রন্থের প্রথম আটটি অধ্যায়ের বিষয়বিন্যাস ও তথ্যপুঞ্জ নতুন বলেই অনেকের কাছে মনে হবে। কল্লোলের অগ্রদূত ফোর আর্টস ক্লাবের নাম মাত্র কেউ কেউ শুনে থাকবেন। তাই সে-সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছি প্রথম অধ্যায়ে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে কল্লোলের প্রকাশ ও পরিচালনা সম্পর্কিত নানা দিকের পরিচয়, তাতে অনেক প্রাসঙ্গিক সংবাদ পাঠক প্রথম জানতে পারবেন। তৃতীয় অধ্যায়ে কল্লোলের আড্ডাধারী ও লেখকগোষ্ঠী সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছি। চতুর্থ অধ্যায়ে সংকলন করে দিয়েছি কল্লোলের পূর্ণ সূচিপত্র। পঞ্চম অধ্যায়ে আছে কল্লোলের মূল্যবিচার। সামাজিক ও সাহিত্যিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কল্লোলের সাহিত্য সাধনার মূলসূত্রগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে। পত্রিকাটির ঐতিহাসিক ভূমিকা ও বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার স্বরূপ নির্ণয়ে এই সূত্র-নির্দেশ কাজে লাগবে বলে মনে করি। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে যথাক্রমে কালি-কলম, প্রগতি ও ধূপছায়ার ইতিবৃত্ত রচনা করেছি এবং বাংলা সাহিত্যের পালাবদলে পত্রিকা তিনটির ভূমিকা নির্ণয় করার চেষ্টা করেছি। পরিশিষ্টে কল্লোলের দুই স্তম্ভ—দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুলচন্দ্র নাগের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছি।

এই গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে আমি নানা জনের কাছ থেকে ব্যক্তিগত ভাবে অনেক সাহায্য পেয়েছি। যাঁরা আমাকে এই কাজে নানা সময়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অ জত দত্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, মনোজ বসু, সুনীতি দেবী, শান্তা দেবী, নিরুপমা দাশগুপ্তা, মণিকা সেন, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সতীপ্রসাদ সেন, ভবানী মুখোপাধ্যায়, সুরেশ চক্রবর্তী (উত্তরা' সম্পাদক) শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও ভূপতি চৌধুরী। তাঁদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তথ্য সংগ্রহে সংযোগিতা করেছেন অধ্যাপিকা ডঃ সুমিতা সরকার, অধ্যাপক ডঃ 'শ্যামসুন্দর বাঁট, অধ্যাপক ডঃ কল্যাণীশংকর ঘটক ও অধ্যাপক ডঃ ভগবানচন্দ্র রাহা ও অধ্যাপক মনোজ অধিকারী। তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জীবেন্দ্র সিংহরায়

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সব লেখা লুপ্ত হয়, বারম্বার লিখিবার তরে
নূতন কালের বর্ণে। জীর্ণ তোর অক্ষরে অক্ষরে
কেন পট রেখেছিস পূর্ণ করি? হয়েছে সময়
নবীনের তুলিকারে পথ ছেড়ে দিতে। হ'ক লয়
সমাপ্তির রেখাদুর্গ। নব লেখা আসি দর্পভরে
তার ভগ্নস্তূপরাশি বিকীর্ণ করিয়া দূরান্তরে
উন্মুক্ত করুক পথ, স্থাবরের সীমা করি জয়,
নবীনের রথযাত্রা লাগি। কালের মন্দিরে পূজাঘরে
যুগবিজয়ার দিনে পূজার্চনা সাঙ্গ হ'লে পরে
যায় প্রতিমার দিন। ধুলা তারে ডাক দিয়ে কয়—
'ফিরে ফিরে মোর মাঝে ক্ষয়ে ক্ষয়ে হবি রে অক্ষয়,
তোর মাটি দিয়ে শিল্পী বিরচিবে নূতন প্রতিমা,
প্রকাশিবে অসীমের নব নব অন্তহীন সীমা।'

১১ই চৈত্র, ১৩৩৩ —রবীন্দ্রনাথ।

["লেখা" । 'পরিশেষ']

নিবেদন

'কল্লোলের কাল' বহুদিন আগেই নিঃশেষিত। সংযোজিত কলেবরে, প্রকাশিত হতে একটু বিলম্ব হলো। তার জন্য ক্ষমা চাইছি। সংশোধন ও সংযোজন লেখক তাঁর মৃত্যুর আগেই করে গেছেন। এবং তিনিই বইটি প্রকাশকের হাতে তুলে দেন। প্রকাশক শ্রীসুধাংশুশেখর দে বইটি প্রকাশ করে অত্যন্ত সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন। কোনো ত্রুটি থাকলে ক্ষমা চাইছি।

প্রকাশক শ্রী দে এবং দে'জ পাবলিশিং-এর সকল কর্মীকে আমার সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাই। নতুন কলেবরে কল্লোলের কাল পাঠক সমাজে সমাদৃত হলে খুশী হবো, লেখক খুশী হবেন। তাঁর বিদেহী আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক এই প্রার্থনা করি।

গীতা সিংহরায়

প্রকাশকের নিবেদন

প্রয়াত লেখকের পাণ্ডুলিপিতে কিছু কলম-পিছিল ভুল ছিল। কিছু পাদটীকার উল্লেখও ছিল না। সেসব ক্ষেত্রে তৃতীয় বন্ধনীতে প্রকাশকের মন্তব্য যুক্ত হলো। দু'টি পরিশিষ্ট ও 'কল্লোলের সূচিপত্র লেখকের নির্দেশেই অষ্টম বা শেষ অধ্যায়ের আগেই সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

বিনীত

সুধাংশুশেখর দে

সূচিপত্র

ফোর আর্টস ক্লাবের নিদর্শন-পত্র

JUNE 4 1921.
Four Arts Club.

ফোর আর্টস ক্লাবের চার জন



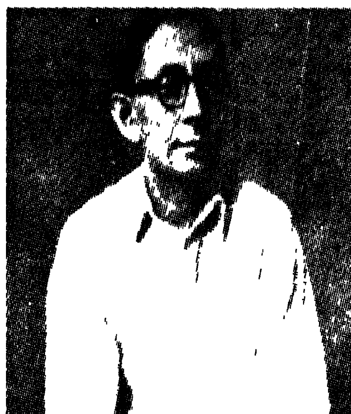
দীনেশরঞ্জন দাশ



গোকুলচন্দ্র নাগ



সুনীতি দেবী



সতীপ্রসাদ সেন

কল্লোলগোষ্ঠীর পুনর্মিলন সমাবেশ



সম্মুখে (বাঁ দিক থেকে): ডঃ সোমনাথ সাহা, ভবানী মুখোপাধ্যায়, মণীশ ঘটক সুধীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্র চাকী।

মাঝের সারি: প্রেমেন্দ্র মিত্র, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব বসু।

পিছনের সারি: শিবরাম চক্রবর্তী, ক্ষিতীন সাহা, বিভাস রায়চৌধুরী, ভূপতি চৌধুরী অজিত দত্ত, আশুতোষ ঘোষ, নির্মল সিংহ।

উত্তরা-সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তীকে লেখা দীনেশরঞ্জনের চিঠি



কল্লোল কার্য্যালয়
১০।২, পটুয়াটোলা লেন.
কলিকাতা ~~২৯।৪।২৭~~

প্রিয় বন্ধু,

আপনার চিঠি পেয়ে খুসী হোলাম। চিত্তরঞ্জন-স্মৃতির আপনার [illegible] দেরীতে দিলে হবে।

আপনার শরীর-মন কেমন আছেন? এখনই কি ফিরবেন? দেওঘর [illegible] কল্লোলের এবার বৈশাখের সংখ্যা [illegible] করেছি। [illegible]

কল্লোলের [illegible] খুব আনন্দ হচ্ছে। আপনাদের শুভেচ্ছায় [illegible]।

[illegible] দু'একটি [illegible] -[illegible] 'দাও' 'দাও' আমাদের [illegible] না। [illegible] আমার [illegible], [illegible] আমার [illegible]। [illegible] লেখো।

প্রথম অধ্যায়

কল্লোলের অগ্রদূত ঃ ফোর আর্টস ক্লাব

ফোর আর্টস ক্লাব বা চতুষ্কলা সমিতি বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম। বঙ্গসংস্কৃতির মুখ্য কেন্দ্র কলকাতায় নারী-পুরুষের ক্লাব হিসেবে এর প্রতিষ্ঠা। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল সদস্যের সমানাধিকার ছিলো এর ভিত্তি। এর আগে মান্‌ডে ক্লাবেও[১] নারীর প্রবেশাধিকার ছিলো, কিন্তু তাতে মেয়েদের বিভাগের দিকে ফোর আর্টস ক্লাবের মতো প্রবল ঝোঁক ছিলো না। এর দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিলো একটা আধুনিক রুচিসঙ্গত ও মনোভাবসম্পন্ন পরিবেশ পারিবারিক গণ্ডির বাইরে গড়ে তোলা। আর এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য সভ্যরা অনুশীলনের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন চারটি বিদ্যা—সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প ও কারুশিল্প। তাই ফোর আর্টস ক্লাব অন্তত কিছুদিনের জন্য হতে পেরেছিলো বাংলার চতুষ্কলার রঙ্গমঞ্চ।

ক্লাবটি মুখ্যত দু'জন ব্যক্তির স্বপ্ন ও ভাবনার ফল। দীনেশরঞ্জন দাশ একদা কলকাতার রাজপথে পরিচিত হয়েছিলেন গোকুলচন্দ্র নাগের সঙ্গে। প্রথম জন তখন চৌরঙ্গি অঞ্চলে খেলার সরঞ্জাম বিক্রেতা এস. রায় অ্যাণ্ড কোম্পানিতে কাজ করতেন; আর দ্বিতীয়জন দেখাশুনা করতেন তাঁর মামা এস. বোস ফ্লোরিস্টের নিউ মার্কেটের ফুলের স্টলটি। এর পর দীনেশরঞ্জন আগের কাজটি ছেড়ে দিয়ে লিণ্ডসে স্ট্রীট-এ একটি ওষুধের দোকানে কাজ নেন। তখন একেবারে কাছাকাছি থাকতেন বলে তিনি মার্কেটে গোকুলচন্দ্রের দোকানে যখন তখন যেতেন। উদ্দেশ্য, আড্ডা দেওয়া ও ফুল কেনা। সেই ফুলের দোকানেই সব আড্ডাধারীদের,[২] বিশেষ করে গোকুলচন্দ্রের কাছে নারীপুরুষের সম্মিলিত একটি আধুনিক রুচিসঙ্গত ক্লাব প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন দীনেশরঞ্জন। এ-সম্বন্ধে তাঁর সাক্ষ্য-উদ্ধার অপরিহার্য :

'এই Clubএর ideal ও কল্পনা মনে বহু বৎসর ধরিয়া রূপ ধরিয়া বিকশিত হইতেছিল। আদর্শ-সাধক দেশের বহু নরনারীর ম্লান মুখে নীরব বেদনার চিহ্ন দেখিয়া হৃদয় চাহিত চিত্তের অন্ধকার গুহা হইতে এই কল্পনাকে পথ কাটিয়া আলোকের পারে মূর্তি দান করি। তখনকার সে

বেদনা মুখের উপর বুঝি ছায়া ফেলিয়াছিল। গোকুল একদিন জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাবছ বল ত এমন করে? মনে হচ্ছে যেন আমিও তোমার সঙ্গে একই কথা ভাবছি, কিন্তু সে যে কি কথা তা আমি জানি না।

আমি বলিলাম, ভাবছি একটি পান্থশালার কথা—যেখানে মানুষ এসে শ্রান্ত জীবন-ভার নিয়ে বিশ্রাম করতে পারবে। জাতি, sex ও position সেখানে কোনও বাধা হবে না। আপন আপন কাজকে মানুষ আনন্দময় করে তুলবে, মানুষ মানুষের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে মিশে আপন স্বচ্ছন্দ ইচ্ছায় আপনাকে সার্থক মনে করতে পারবে। গোকুল আমার হাতের উপর তার হাতে জোরে তালি দিয়া মহা আনন্দে বলিয়া উঠিল, আমারও যে এটা জীবনের স্বপ্ন!—ঠিক রূপটা ধরে উঠতে পারছিলাম না এতদিন!'[৩]

এই ক্লাব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাঁরা অতঃপর দেখা করলেন কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কন্যা ও অধ্যাপক বিজলীবিহারী সরকারের[৪] স্ত্রী সুনীতি দেবীর সঙ্গে।[৫] ব্রাহ্মসমাজের সূত্রে তাঁর সঙ্গে উভয়ের আগে থেকে পরিচয় ছিলো। সেদিন ক্লাব সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে বিস্তৃত আলোচনা হয়। সুনীতি দেবী খুব উৎসাহ ও আগ্রহ দেখান। এক পূর্ণিমার রাত্রির জ্যোৎস্না-ধৌত পরিবেশে চিড়িয়াখানার প্রাঙ্গণে[৬] অনুষ্ঠিত প্রাথমিক আলোচনা-সভায় ঠিক হয়, ৪ঠা জুন, ১৯২১ তারিখে ক্লাবের উদ্বোধন হবে। কিছু নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ করা হয়, ঠিক হয় মাসিক চাঁদা হবে এক টাকা। 'ফোর আর্টস ক্লাব' নামকরণ করেন গোকুলচন্দ্র, দীনেশরঞ্জন সম্পাদক নিযুক্ত হন। জাতিধর্ম, স্ত্রীপুরুষ, বালকবৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলকে সভ্য করার নীতিও গৃহীত হয়।

সেই নির্দিষ্ট দিনে ৮৮বি হাজরা রোডে প্রথম অধিবেশন হয়। তাতে সুনীতি দেবী ছাড়া গোকুলচন্দ্র ও দীনেশরঞ্জনের আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধুবান্ধব, ফুলের দোকানের আড্ডাধারীদের নিমন্ত্রণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সর্বসমক্ষে ক্লাব প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হয়। গান-বাজনা প্রভৃতি আনন্দোৎসব এবং রচনাদি পাঠের ব্যবস্থাও ছিল। চতুষ্কলা সমিতি প্রতিষ্ঠার যে নিদর্শন-পত্র[৭] সেদিন রচিত হয় দীনেশরঞ্জন নিজের হাতে তার অলংকরণ করেন। তারপর চারজন বিশিষ্ট সদস্য তাতে আপন আপন অন্তরের কথা লিখে স্বাক্ষর করেন।[৮] নিদর্শন-পত্রটি নিম্নরূপ:

> যে আনন্দ কখনও আশা করে না মানুষ তাও পায়, আবার যে দুঃখ কখনও সইতে পারবে না মনে করে—তাও সয়। এই অসহ্য সুখ আর দুঃখের বোঝা বয়ে আমরা চলেছি। সুখের ভারেও বুক

কাঁপে, দুঃখের বেদনায়ও ভেঙে পড়ে,—তবু চলার শেষ নেই। চাওয়ারও শেষ নেই—পৃথিবীতে তাই পাওয়ারও অন্ত নেই। —সু

*

মানুষকে জাগিয়ে তোলে—তৃষ্ণা
মানুষকে কাজের পথে এগিয়ে দিয়ে যায়—কামনা
মানুষকে নির্ম্মল করে—বেদনা
মানুষকে সুন্দর করে—প্রেম।

—গো

"ছিল যে পরাণের অন্ধকারে
এল সে ভুবনের আলোর পারে।
স্বপনবাধাটুটি—বাহিরে এল ছুটী
অবাক আঁখি দুটী হেরিল তারে।
নীরব বেদনায় পূজিনু যারে হায়
নিখিল তারি গায় বন্দনা রে।"

—দী

*

কালের অজেয়.........মৃত্যুঞ্জয়।

—স

June 4, 1921.

Four Arts Club

এখানে প্রথমত উচ্চারণ করেছেন 'সু' অর্থাৎ সুনীতি দেবী, দ্বিতীয়ত 'গো' অর্থাৎ গোকুলচন্দ্র নাগ, তৃতীয়ত 'দী' অর্থাৎ দীনেশরঞ্জন দাশ, চতুর্থত 'স' অর্থাৎ সতীপ্রসাদ সেন। সবাই নিজের মনোমত মন্ত্রোচ্চারণ করেছেন সত্য, কিন্তু সব মিলিয়ে দেখলে একটা পুরো জীবনমন্ত্র পাই। সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া নিয়ে জীবন। তাকে এগিয়ে নিয়ে চলে তৃষ্ণার তাড়না, কামনার বেগ, বেদনার দাবদাহ, প্রেমের অভিষেক। সকলের উপর আছে স্বপ্নের মানসী-প্রতিমা—অস্ফুটতার অন্ধকার থেকে প্রকাশের আলোতে তার সুন্দর জাগরণ। এই তো 'চলমান' জীবনের চিরকালের রূপ—যা কালের অজেয়, মৃত্যুঞ্জয়। সুতরাং ফোর আর্টস ক্লাবের সেই প্রথম অধিবেশন দিনেই পথিক মানুষের শিলালিপি রচিত হয়েছিলো নিদর্শন-পত্রটির মধ্যে। পরে জীবনের এই রূপটিকে পরিস্ফুট করার চেষ্টাই কল্লোল-যুগে হয়েছিলো।

প্রথম দিনের অধিবেশনে স্বরচিত রচনা পাঠ করেছিলেন সুনীতি দেবী। কান্তিচন্দ্র ঘোষ তাঁর ওমর খৈয়মের অনুবাদ আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। যতদূর জানা গেছে, দু-তিন জন মুখে কিছু বলেছিলেন। গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন অনেকে। সেদিন কারুশিল্প শাখার সূচনারূপে নিরুপমা দাশগুপ্তা যে কথিকাটি[৯] পাঠ করেছিলেন তা হচ্ছে এই :

'এই শিল্পের কথা শুনে আমার দু-একটি কথা মনে এসেছে। কথাগুলো অন্য কারো অনুরোধে বলা নয়, আমার নিজের মনে যেভাবে সাড়া পেয়েছি তারই প্রকাশ।

যাঁদের সাহিত্য, সঙ্গীত বা চিত্রকলা বিষয়ে মনের তেমন বিকাশ হয় নি তাঁরা এই crafts জিনিসটিকে সহজেই ধরতে পারবেন। এর ভেতরে আছে কর্মের আনন্দ আর সৃষ্টির নেশা।

সংসারে সব রকম দাবী বজায় রেখেও একে চালিয়ে নেওয়া যায় অনায়াসে, বিশেষতঃ ঘরের ভেতর দাগ কেটে যাঁদের সীমার মধ্যে রাখা হয়েছে সেইসব মেয়েদের জীবনে একটা মহাসুযোগ। স্বাধীন মনের আনন্দ দিয়ে তাঁরা এই শিল্পকে রূপ দিতে পারবেন।

আমাদের সেবার জন্য উন্মুখ হাতদুটি বিশ্বের সেবায় লাগবে। নিজের পরিবারেরও প্রয়োজন মেটাবে। নিজের হাতে নানা জিনিস তৈরি করে যদি গৃহের শ্রী বাড়ানো যায় তবে তার মধ্যে যে আনন্দ ও তৃপ্তি পাওয়া যায় তার তুলনা হয় না। এখানে মেয়েরা তাঁদের বিশেষ অধিকার খুঁজে পান। কিন্তু সবাই তো আর সবরকম শিল্পকাজ জানেন না। কাজেই পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের চলতে হবে। এমন কেউ বোধ হয় নেই যিনি অন্য একজনের শেখার জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা দেখেও নিজেকে সঙ্কুচিত রাখতে পারেন। যেখানে কাজের ভিতর দিয়ে মানুষের মিল সেখানে ফাঁকি টিকতেই পারে না। কাজের প্রেরণা তাদের চালিয়ে নেবেই।

তাই আজ মনে হচ্ছে যাঁরা শিল্পী, যাঁরা গুণী, যাঁদের এসব বিষয়ে গভীর জ্ঞান আছে তাঁরা আমাদের কাছে খুশী মনে ধরা দেবেন। তাঁদের ওপরে ভরসা রেখে আমরা আজ চলতে আরম্ভ করি।'

ফোর আর্টস ক্লাবের উদ্‌যোক্তা ও সদস্যরা প্রথমেই ঠিক করে নিয়েছিলেন, ক্লাবের কর্মধারা যথাসম্ভব সবদিকে সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করা হবে। প্রতি বুধবার[১০] ক্লাবের সাধারণ সভা বসবে বলেও ঠিক হয়। এক এক সাধারণ

সভার দিন এক এক বিষয় আলোচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্লাব প্রতিষ্ঠার পর প্রথম সমস্যা দেখা দেয় ঘর নিয়ে। নারী-পুরুষের যৌথ ক্লাবের জন্য ঘর ভাড়া দিতে অনেকেই রাজী হন নি। এই অবস্থায় দীনেশরঞ্জনের বোন নিরুপমা দেবী ও তাঁর স্বামী সুকুমার দাশগুপ্ত তাঁদের বাড়ির (৮৮বি হাজরা রোডে) বাইরের ঘরটি স্বল্প ভাড়ার বিনিময়ে ক্লাবের জন্য ছেড়ে দেন। ফলে প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিকভাবে 'গৃহস্থ' হওয়ার সুযোগ ঘটে। কিন্তু কিছু-দিনের মধ্যেই ক্লাবের নাম এত ছড়িয়ে যায় যে, তার বড় বড় বৈঠকে অনেক লোকের সমাগম হতে থাকে। তখন ছোট্ট ক্লাব ঘরে স্থান সংকুলান হতো না, আসর বসতো বাইরে গ্রামে কিংবা উন্মুক্ত প্রান্তরে। আরম্ভে ঘরটিকে নিজের অশিক্ষিতপটু তুলির আঁকা বেশ কয়েকটি ছবি দিয়ে সাজিয়ে দিলেন দীনেশরঞ্জন, গোকুলচন্দ্র উপহার দিলেন একখানি সুন্দর ছবি। ঘরের মাঝখানে শোভা পেতে লাগলো ফ্রেমে-বাঁধানো ফোর আর্টস ক্লাবের নিদর্শন-পত্রটি।

চতুষ্কলার অন্যতম কলা সাহিত্য-বিভাগ[১১] সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন অনেকেই। মণীন্দ্রলাল বসু, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, সুনীতি দেবী, সুধীরকুমার চৌধুরী, গোকুলচন্দ্র, দীনেশরঞ্জন, নিরুপমা দাশগুপ্তা, উমা দাশগুপ্তা[১২] প্রভৃতি কয়েকজন ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রণী। এই সাহিত্য-বিভাগের একটা সুন্দর আলেখ্য ফুটে উঠেছে সুনীতি দেবীর কলমে :

> 'আমাদের সভ্যদের মধ্যে খ্যাত, অখ্যাত, উদীয়মান সব রকম সাহিত্যিকই ছিলেন। একটি মেয়ের কথা মনে আছে, বিদেশে স্বামীকে চিঠি লেখাতেই যার সাহিত্যচর্চা নিবদ্ধ ছিল,—সে হঠাৎ খুব গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লিখতে শুরু করে দিল, এবং প্রতি সপ্তাহের সাহিত্য-বাসরে, বিরূপ সমালোচনার ভয় না রেখেই, সে সব পড়ে শোনাতে লাগল।
>
> সাহিত্য-জগতে রমলার লেখক হিসেবে পরিচিত মণীন্দ্রলাল বসু আমাদের সভায় যোগ দিতেন। তবে এত চুপ করে থাকতেন যে তাঁর গলার স্বর যেন শুনি নি।…ঝরণা নামে পত্রিকা বের করতেন সোমনাথ সাহা। ইনিও কাজের তুলনায় কথা কমই বলতেন। প্রবাসীর কবি সুধীর চৌধুরীও কটা কথা বলতেন তা আঙুলে গোনা যেত। যদিও তাঁর অত সঙ্কোচের কারণ ছিল না, কেননা তখনই তাঁর কবি খ্যাতি যথেষ্ট ছড়িয়ে পড়েছিল। চুপচাপের দলে গোকুল নাগও ছিলেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ও এখানে নিয়মিত আসতেন। সকলের নাম দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু পাঠক বুঝতে পারছেন নিশ্চয় যে আমাদের উৎসাহী সভ্যদের সংখ্যা নিতান্ত কম

ছিল না। এখানে একত্র হয়ে গল্পগুজব করার যে আনন্দ তা ত ছিলই, তাছাড়া যার মধ্যে যেটুকু গুণ ছিল তা ফুটিয়ে তুলবার এমন একটা পরিবেশ ছিল যা সচরাচর এখনকার ক্লাব-জীবনে কমই দেখা যায়।'[১৩]

কোনো এক দিনের সাহিত্য-অধিবেশনের আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে আছে—'সেদিনকার বৈঠকে, যতদূর মনে পড়ে, উমা দেবীর স্বপ্ন শীর্ষক কবিতা ও সুনীতি দেবীর নিবন্ধ পঠিত হয়েছিলো।'[১৪] এক বছরের মধ্যে যতগুলি লিটারেরি ডে বা সাহিত্য-বৈঠক হয়েছিলো তাদের সার্থক করে তুলতে দীনেশরঞ্জন ও গোকুলচন্দ্রের চেষ্টার ত্রুটি ছিলো না। তার প্রমাণ আছে, ক্লাব প্রতিষ্ঠার একমাস সাতদিন পরে প্রথম সাহিত্য-বৈঠক সম্পর্কে নিরুপমা দাশগুপ্তার কাছে লেখা গোকুলচন্দ্রের এই চিঠিটিতে ঃ

Zoo Garden
Alipore P. O.
Calcutta
11.7.21

নিরুদি,

কাল কখন চলে গেলেন বুঝতে পারিনি। একটা কথা বলবার ছিল—একটা অনুরোধ মাত্র। মুখে বললেই ভাল হ'ত। যাক চিঠিতেই সেটা সেরে নিচ্ছি।

বুধবার আপনাকে কিছু পড়তে হবে। নিজের লেখা। 'না' বলবেন না। কারণ এইটেই আমাদের literary sec. এর প্রথম অধিবেশন।

সুনীতিদি পড়বেন। দীনেশকে এখনও বাগ মানাতে পারিনি। যে এক-বগ্‌গা ছেলে! উমা দেবীও আশা করি আমাদের অনুরোধ রাখবেন। সেদিন কিন্তু আমি কিছুই করব না। শুধু শুনব। কেমন? একটা লোভ দেখিয়ে রাখি এইখানে।—বুধবারে যদি আপনারা সবাই লক্ষ্মী ছেলেমেয়ের মত যা বললাম তা করেন, তাহলে এর পরের বারে লক্ষ্মী ছেলের মত আমিও আপনাদের হুকুম শুনব। নইলে নয়।

এ বিষয়ে আপনি সুনীতিদি আর উমা দেবীর সঙ্গে সব কথা বলে রাখবেন। এখনও সময় ঢের আছে। আপনার পুরান লেখা থেকেও কিছু বার করে পড়তে পারেন। আপনার লেখবার ক্ষমতা আছে। ওটা নষ্ট হ'তে আর দেবো না।

আপনারা আমার নমস্কার নিন। ইতি

P. S. শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ

ছবি যা পারেন কিছু করে রাখবেন।

এ-চিঠিতে তুটো জিনিস লক্ষণীয়। এক, সুনীতি দেবী, নিরুপমা দাশগুপ্তা, উমা দাশগুপ্তা প্রমুখ লেখিকা বা ক্লাবের মহিলা-সদস্য সম্পর্কে গোকুলচন্দ্র তথা ফোর আর্টস ক্লাবের আস্থা। তাঁরা আগে থেকেই একটু আধটু সাহিত্যচর্চা করতেন। তুই, সাহিত্যালোচনার জন্য নির্দিষ্ট দিনেও বোধ হয় অন্যান্য শাখার ক্রিয়াকলাপ বন্ধ থাকতো না—বিশেষ করে সঙ্গীত ও চিত্রশিল্প। তাই গোকুলচন্দ্র পুনশ্চে লিখেছেন, 'ছবি যা পারেন কিছু করে রাখবেন।' সতীপ্রসাদ সেনের কাছে জানা গেছে, ক্লাবের সাধারণ অনুষ্ঠানগুলি বৈচিত্র্যময় করা হতো। তাতে অনেকে গান গাইতেন।

সে যাই হোক, সাহিত্য-বৈঠকের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি ছিলো বলে তার কার্য-বিবরণী, আলোচনার সারাংশ এবং পঠিত লেখা একটা খাতায় টুকে রাখা হতো। বছর তুই পরে ক্লাবের মৃত্যুকালে দেখা গেলো, সেই খাতাটি ভরে গেছে।

চিত্রশিল্প বিভাগে প্রধান ভূমিকা নেওয়ার যোগ্যতা প্রতিষ্ঠাতা দীনেশরঞ্জন ও গোকুলচন্দ্রের ছিলো। প্রথম জন কমার্সিয়াল আর্টে ও কার্টুন অংকনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন; দ্বিতীয় জন ছিলেন পাশ-করা আর্টিস্ট এবং তৈলচিত্র চিত্রণে নিপুণ। এঁরা ছাড়া ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন পরবর্তীকালে শিল্পী ও ভাস্কর হিসেবে খ্যাত অতুল বসু, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি. জি.), যামিনী রায় ও দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী। এঁরা আর্ট স্কুলে গোকুলচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। সুনীতি দেবী লিখেছেন—'বিখ্যাত শিল্পী অতুল বসু এলেন গোকুলবাবুর নিমন্ত্রণে। এসেই তাঁর প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছ্বসিত করে তুললেন সবাইকে। আমাদের মত আনাড়িও তাঁর উৎসাহে কাগজে আঁচড় কাটতে সুরু করে দিল। তিনি মাঝে মাঝে নিয়ে আসতেন শ্রদ্ধেয় যামিনী রায় মহাশয়কে। যামিনীবাবু নীরবে সব দেখতেন, কাউকে বা একটু আধটু ছবি আঁকার পদ্ধতি দেখিয়ে দিতেন, সে ধন্য হয়ে যেত। একটি মেয়ে ত তাঁর কাছে আশ্বাস পেয়ে শান্তিনিকেতনে কলাভবনে গেল চিত্রবিদ্যা অনুশীলন করতে। তার ভিতরের শিল্পীকে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন বলে তার আঁকার কাজে সে এগিয়ে যেতে সাহস করেছিল। তাঁর শান্ত সমাহিত ভাবটুকু মনের ওপর গভীর ছাপ রেখে যেত। স্বনামধন্য দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীও আমাদের কাছে এক আধবার আসতেন। এতগুলি গুণী শিল্পীর সমাবেশ আমাদের কতটা গর্বিত করত তা না লিখলেও সকলে

বুঝবেন'।[১৫] এই শিল্পীচতুষ্টয়ের মধ্যে যামিনী রায়ই ছিলেন সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। এই ঘনিষ্ঠতা পরবর্তী কালেও যে বজায় ছিলো তার প্রমাণ আছে একটি মেয়েকে ছবি আঁকা শেখানো সম্পর্কে তাঁর লেখা একটি চিঠিতে—'পূজনীয়া দিদি—দীনেশদা আমাকে একখানা পত্র লিখেছেন। অমুকে (দীনেশরঞ্জনের অনুজ প্রিয়রঞ্জনের স্ত্রী রেণু দাশগুপ্তার বোন।—লেখক) ছবি আঁকা শেখাবার জন্যে।…পূজার আগেটা একটু কাজ বেশী, তার জন্য বড্ড ব্যস্ত আছি। শীঘ্রই আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। এ সাক্ষাতে সমস্ত বিষয়ের ঠিক কোরে নেব। এজন্য অমুকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিবেন।…উমাদিদি ও তাঁর মেয়েটি কেমন, উমাদিদিকে আমার নমস্কার দিবেন। ইতি প্রণত যামিনী'। ৯৩।সি শ্যামবাজার স্ট্রীট। (চিঠিটি নিরুপমা দাশগুপ্তাকে লিখিত। শ্যামবাজার পোস্ট অফিসের ছাপ ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৪)। এঁদের সমবেত প্রচেষ্টায়, চিত্রকর্মে ও শিল্প-আলোচনায় ক্লাবের চিত্রকলা বিভাগের ইতিবৃত্ত যে সমৃদ্ধ হয়েছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রখ্যাত শিল্প-সমালোচক অধ্যাপিকা স্টেলা ক্রামরিশও চিত্রশিল্পের বৈঠকে একদিন এসেছিলেন। তিনি যেদিন এসেছিলেন, সেদিন ক্লাবের আর্টিস্ট সদস্যরা নিজেদের আঁকা ছবির একটা ছোট্ট চিত্র-প্রদর্শনী করেছিলেন। শ্রীমতী ক্রামরিশ বাংলা দেশের ঘরোয়া একটি ক্লাবে উচ্চস্তরের শিল্পচর্চা দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন।

ফোর আর্টস ক্লাবের সাপ্তাহিক সাধারণ সভার দিনটি ছাড়া কারুশিল্প ও সঙ্গীত শেখার জন্য আলাদা আলাদা দিন ছিলো। সুনীতি দেবী সুগায়িকা ছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত গাইতেন। তিনি গানের ক্লাস নিতেন। ক্লাবের স্মৃতি-চারণা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—চিত্রাঙ্কনে সবাই মাথা গলাতে পারত না, কিন্তু গানের ক্লাসে কাউকে বাদ দেবার জো কি! 'যত ছিল নলবনে, সব হল কীর্তনে, কাস্তে ভেঙে গড়াল করতাল।' কে শিক্ষক, কে ছাত্র বোঝা দায় ছিল। যে যেটুকু জানত অন্যকে শেখাত। ক্লাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও কীর্তনের চর্চা হতো। ঠাকুর বাড়ির পরিমণ্ডলের বাইরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা এর আগে তেমন হয় নি।

কারুশিল্প বিভাগের কাজকর্মে, বিশেষ করে সূচীশিল্পে মহিলা-সদস্যরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। তাঁরা ছাড়া সস্ত্রীক সুকুমার দাশগুপ্তও ক্লাশ নিতেন, কারণ তিনি কাটিং জানতেন। একটা মজার কথা—সেলাইতে ঔৎসুক্য দেখা গেলো মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের বেশি। এমন কি একজন বেশ বয়স্ক ভদ্রলোকও অত্যন্ত মনোযোগ সহযোগে আরম্ভ করে দিলেন সেলাই ও কাটছাট শিখতে।

কয়েক বছর পর তিনি সন্ন্যাসী হয়ে যান ; অত কোট, প্যাণ্ট, শার্টের কাট ও সেলাই তাঁর জীবনে কোনো কাজেই লাগলো না। তাঁর নাম প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়—তিনি কল্লোলে 'আনন্দসুন্দর ঠাকুর' নামে লিখতেন।

চতুষ্কলা সমিতির প্রতিটি অধিবেশন মনোজ্ঞ হতো। একটি অধিবেশনের সুন্দর বর্ণনা পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় দিয়েছেন তাঁর আত্মস্মৃতিতে :

'ঠিক চারটের সময়েই এসে হাজির হলাম। এসপ্লানেডে ট্রাম বদল করে দুজনে এসে নামলাম হাজরা রোডের মোড়ে। দরজা খোলা, সামনের ঘরে দেখলাম, বৈঠকের আয়োজন। সব কিছু শিল্পশ্রীমণ্ডিত। মেজেতে ফরাসপাতা, মাঝখানে আলপনা-কাটা ছোট একখানি জলচৌকির উপর ফুলদানিতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ। ধূপদানিতে সুগন্ধি ধূপকাঠি জ্বলছে, পিলসুজের উপর তেলের প্রদীপ জ্বেলে দিচ্ছেন একটি মহিলা। মাথার উপর বিজলী বাতি ও পাখা, ফরাসের উপর জন চার-পাচ উপবিষ্ট।'[১৬]

অর্থাৎ ফোর আর্টস ক্লাবের প্রতিটি অধিবেশনের মধ্যে থাকতো একটা মার্জিত পরিবেশ ও শিল্পরুচির ছাপ। এ-প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই মনে পড়ে ভিন্ন জাতের সবুজসভার বিবরণ।[১৭]

এই ক্লাবের প্রসঙ্গে চারজন মহিলার ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সুকুমার দাশগুপ্ত যে একখানা ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন তার পেছনে তাঁর স্ত্রী নিরুপমার উৎসাহ ও সমর্থন ছিলো অকুণ্ঠ। তিনি ক্লাবের প্রথম উদ্‌যোক্তার মধ্যে একজন ছিলেন। দাশগুপ্তদের ছিলো ত্রিশজনের একান্নবর্তী পরিবার। সেই পরিবারের বৌ হয়ে ক্লাবে নিয়মিত যাওয়া ও তার কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করা সহজ ছিলো না, কারণ আত্মীয়-পরিজনেরা এ-ব্যাপারে ঠিক অনুকূল ছিলেন না। ক্লাবে অভুক্ত কেউ এলে নিরুপমা তাঁকে বাড়িতে ডেকে খাওয়াতেন। এ-রকম মাঝে মাঝেই ঘটতো। যামিনী রায় এমনভাবে অনেক দিন তাঁর কাছে খেয়েছেন।[১৮] তাঁর স্বামীর ও নিজের অত্যুগ্র আগ্রহ ছিলো বলেই পরিবারের নতুন-বৌয়ের পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছিলো। নিরুপমা দেবী বলেছেন, সত্যিই ক্লাবের এমন নেশা ছিলো যে, অধিবেশনের দিন শিশুপুত্রকে ভালো করে খাওয়ানো শোয়ানো হতো না। এটা ঘটতো বিকেল চারটে থেকে রাত্রি সাত আটটা পর্যন্ত—যতক্ষণ অধিবেশন চলতো। ক্লাবের কথা বলতে গিয়ে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন[১৯]

'গৃহকর্ত্রী নিরুপমা দেবীর উৎসাহই শুনলাম অপরিসীম এবং সে উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছে তাঁর ছোট জা উমা দেবীর মধ্যে। ঘরে যখন ঢুকি তখন তিনিই প্রদীপ জ্বেলে দিচ্ছিলেন।'—

কবি ও গল্প-লেখিকা স্থনীতি দেবী ছিলেন, আগেই বলেছি, ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একজন। তিনি এর উন্নতি ও সার্থকতার জন্য আগাগোড়াই খুব পরিশ্রম করেছেন। মেয়েদের কাজকর্ম ইনিই পরিচালনা করতেন, নতুন সদস্যা নিয়ে আসতেন, সমস্ত অধিবেশনে উপস্থিত থাকতেন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি এই ক্লাবের অগ্রগণ্যা কর্মী ছিলেন এবং সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। তাঁকে অন্তরঙ্গ বন্ধু-সদস্যরা বলতেন angel guide. সস্তা জনপ্রিয়তার দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিলো না, দৃষ্টি ছিল সত্যিকারের কলাকর্মের দিকে। শেষের দিকে অন্য একজন মহিলা-সদস্যের কর্মচাঞ্চল্য যখন একটু বেশি, তখন তিনি একটু পিছনে চলে গেলেও সমিতি তিনি ছাড়েন নি, নীরবে কাজ করে গেছেন তাঁর জীবনচর্যার মধ্যে একট শালীনতাবোধ ও মর্যাদাজ্ঞান সব সময়েই চোখে পড়তো।

'বাতায়ন'-এর কবি উমা দাশগুপ্তা আর একজন স্মরণীয় সদস্যা। তাঁর কবিতার সপ্রশংস আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ফোর আর্টস ক্লাব প্রসঙ্গে তাঁর কথা সর্বাগ্রে মনে পড়া উচিত, কারণ তিনি সকলের আগে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। 'অত অল্প বয়সে তাঁর যে কবিত্বশক্তির স্ফুরণ হয়েছিল, বেঁচে থাকলে তা আরও হয়ত বিকশিত হত। শুধু লেখায় নয়, গানে, ছবি আঁকায়, অভিনয়ে—সবেতেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যেত—যদিও তা প্রকাশ পেত, শুধু অন্তরঙ্গদের কাছে। নিজেকে জাহির করবার মধ্যে তাঁর বেশ একটু সলজ্জ কুণ্ঠা ছিল।'[২০]

সদস্য নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়[২১] একাউন্টেন্ট জেনারেল রজনীনাথ রায়ের কন্যা মায়া দেবীকে[২২] তাঁর স্বামী ব্যারিস্টার ব্যানার্জিসাহেব সহ ক্লাবে নিয়ে আসেন। এই সুদর্শনা মহিলা লোরেটোয় পড়াশুনো করেছিলেন। ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিলো ভালো। তিনি খুব হৈচৈ করতে ভালোবাসতেন। খামখেয়ালীপনায় অনন্যা ছিলেন এবং নিজের ইচ্ছা-গুলিকে অপ্রতিরোধ্য করে চলতে চাইতেন। তাঁর দেশাত্মবোধ ও সোশ্যাল ওয়ার্ক সম্পর্কে আগ্রহ ছিলো খুব তীব্র। ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রে তিনি ক্লাবের অনেক সদস্যকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন, তাঁদের কাছে হয়ে উঠেছিলেন মূর্তিমতী inspiration. তাঁর যোগদানে ক্লাবের জীবনে যে একটা সাড়া ও প্রাণের আবেগ সঞ্চারিত হয়েছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ফোর আর্টস ক্লাবের পুরুষ সদস্যদের মধ্যে দীনেশরঞ্জন ও গোকুলচন্দ্র ছাড়া সুকুমার দাশগুপ্ত ও সতীপ্রসাদ সেনের নাম স্মরণীয়। পারিবারিক বিরোধিতা

ও সামাজিক কোলাহল সত্ত্বেও সুকুমারবাবু তাঁর বাড়িতে যে ক্লাবের কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এতে তাঁর মনের ঔদার্য ও কলা-কুতূহলের পরিচয় আছে। তার জন্য তাঁকে অনেক গঞ্জনা ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। সুকুমার দাশগুপ্ত সম্বন্ধে একজন গুণগ্রাহীর মন্তব্য এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে :

> 'স্বল্পভাষী গৃহকর্তার মৃদুহাস্যে তাঁর সহৃদয় মন স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। পত্নী নিরুপমা দেবী[২৩] ও পত্নী-অগ্রজ দীনেশরঞ্জনের আগ্রহে স্থাপিত ফোর আর্টস ক্লাবকে বাধ্য হয়েই যে তিনি সহ্য করেছেন, তা নয় শিল্পচর্চার উদ্দেশ্যে এতগুলি সুধীজন যে তাঁর গৃহে নিয়মিত জমায়েত হন, এর জন্যে একটা প্রসন্নতা ধরা পড়ে তাঁর চোখের দৃষ্টিতে, মুখের ভাবে ও সাধারণ ব্যবহারে।'

সভ্যদের অনেক তাঁকে টুলটুলিদা বলে ডাকতেন।

সতীপ্রসাদ সেন[২৪] ছিলেন ফোর আর্টস ক্লাবের নীরব কর্মী। তিনি ক্লাবের যুগে ও কল্লোলের কালে বন্ধুজনের কাছে গোরাবাবু নামে পরিচিত ছিলেন। চতুষ্কলার প্রতিটি কলার ক্রিয়াকলাপে তাঁর সহযোগিতা ছিলো অপরিহার্য। প্রতিটি ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। সেই প্রায়-বিস্মৃত যুগের স্মৃতিধর রূপে তিনি আজও আমাদের মধ্যে বিরাজমান।

ক্লাবের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মায়া দেবীর স্বামী ব্যানার্জী সাহেব, পরিচয়-সম্পাদক হিরণকুমার সান্যালের স্ত্রী মীরা সান্যাল এবং তাঁর বোন[২৫], দ্বিজেশ সেন, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের অফিসার কিরণ দে এবং তাঁর দুই বোন[২৬], অজয় দাশগুপ্তের স্ত্রী মীরা দাশগুপ্তা[২৭], উমা দাশগুপ্তার স্বামী শিশির দাশগুপ্ত[২৮] যতটা সম্ভব বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও সাপ্তাহিক অধিবেশনের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। তবে ক্লাবে থাকতে থাকতেই অবিবাহিতা মহিলা সদস্যদের মধ্যে কারো কারো বিয়ে হয়ে যায়, পুরুষ সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যত্র কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েন। সদস্য ও অতিথি সংগ্রহে সুনীতি দেবী, মায়া দেবী ও নগেন্দ্রনাথের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নগেন্দ্রনাথ ছিলেন খুব বুদ্ধিমান, প্রতিপত্তিশালী ও মিশুকে মানুষ; ভালো বলতে কইতে পারতেন। তিনি সুন্দর খোল বাজাতেন এবং গানের আসর জমিয়ে রাখতেন। মায়াদেবীর স্বামী ব্যানার্জী সাহেবও ভালো গান গাইতেন। তিনি ক্লাবের সদস্যদের স্বদেশী গান শিখিয়েছিলেন এবং দু' একদিন স্বদেশী গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে শান্তা দেবী, সীতা দেবী, স্টেলা ক্রামরিশ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদির নাম

করা যেতে পারে। নগেন্দ্রনাথ একদিন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ক্লাবের অধিবেশনে নিয়ে আসেন। শ্যামাপ্রসাদ অবশ্য কিছু বলেন নি, শুধু উপস্থিত ছিলেন। আর মাঝে মাঝে আসতেন কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার, তিনি অতি সহজেই বয়ঃকনিষ্ঠ সভ্যদের আড্ডায় সব রকম আলোচনা করে যেতেন। ক্লাবঘরে অবাধে যাতায়াত করতেন বর্ষীয়সী গৃহকর্ত্রী—সুকুমার দাশগুপ্তের মা—এবং সেই সঙ্গে তাঁর শিশু নাতি-নাতনীর দল। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মান্‌ডে ক্লাবে গেলেও ফোর আর্টস ক্লাবে কোনোদিন আসেন নি। তবে কাজী নজরুল ইসলাম মাঝে মাঝে এসে হাজির হতেন; তিনি গান গাইতেন, কবিতা শোনাতেন।

ফোর আর্টস ক্লাবের জীবৎকালের শেষদিকে সুকুমার দাশগুপ্তের বাড়ি থেকে ক্লাব উঠে যায়। তখন মায়া দেবী নিজের বাড়িতে ক্লাবের কয়েকটি অধিবেশন বসিয়েছিলেন। সেখানে একটি বৈঠকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এসে তাঁর 'সাগরসঙ্গীত'[২৯] থেকে কিছু কবিতা পাঠ করেছিলেন। আর একটিতে এসেছিলেন অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট ও পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগীশ্বরী অধ্যাপক শাহেদ সুরাবর্দি। একবার বৈঠকে বিপিনচন্দ্র পাল বৈষ্ণব কবিতা নিয়ে আলোচনা করেন। এঁরা ছাড়া আরও কিছু কিছু অভিজাত মহলের লোক ক্রমশ ফোর আর্টস ক্লাবে এসে ভিড় জমাতে লাগলেন। কুচবিহারের তৎকালীন মহারাজার ভাই কুমার ভিক্টর নারায়ণ সেই সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন। এর ফল হলো এই যে, ক্লাবের মূল উদ্‌যোক্তা ও কর্মীরা ধীরে ধীরে সরে আসতে থাকেন। মায়া দেবী অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের অশ্রদ্ধা বা অবহেলা করেন নি।

ফোর আর্টস ক্লাবের সভ্যদের একটি বিচিত্র খেয়ালের কথা অতঃপর উল্লেখ করা যেতে পারে। দীনেশরঞ্জনের মাথায় নানারকম অদ্ভুত আইডিয়া খেলতো। বেশ কিছুদিন ক্লাব চলার পর তিনি সদস্যদের কাছে একটি মজার প্রস্তাব করে বসেন। তিনি বলেন, সকলেই সকলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেছেন। এখন ক্লাবের পুরুষ ও মহিলা সদস্যরা পরস্পরের কাছে চিঠি লিখবেন। প্রত্যেকে নিজের বাড়ি থেকে ডাকে চিঠি লিখবেন। যিনি চিঠি লিখবেন তাঁকে লিখতে হবে, যাঁকে লিখছেন তাঁকে কেন তাঁর ভালো লাগে। চিঠিতে লেখক বা লেখিকার মনের অনুভূতিগুলিকে সাহিত্যিক ভাষা ও ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। পরে সেই চিঠিগুলি প্রাপকরা ক্লাবের অধিবেশনে পড়বেন।

দীনেশরঞ্জনের এই প্রস্তাব অনুযায়ী চিঠি লেখা শুরু হলো। কিছুদিন ধরে চললো চিঠির আদান-প্রদান। চিঠি লিখেছিলেন বা পেয়েছিলেন অনেকেই।

নিরুপমা দাশগুপ্তা ও সতীপ্রসাদ সেন বলেছেন, তাঁরা ডাকে চিঠি পেয়েছিলেন। পরে জানা গিয়েছিলো, সতীবাবুকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন উমা দাশগুপ্তা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সমস্ত পরিকল্পনাটির মধ্যে একটা চপলতা ও সস্তা ঢং আছে। কিন্তু যতদূর জানা গেছে, তরুণ সদস্যদের সংযম ও শালীনতাবোধ লঘুতাকে প্রশ্রয় দেয় নি, কেউ কেউ নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে বিষয়টাকে মার্জিত রুচির সীমার মধ্যে রাখতে পেরেছিলেন। আর প্রস্তাবক দীনেশরঞ্জনের উদ্দেশ্য ছিলো, চিঠি আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষের সম্পর্কটা সহজ, শোভন ও স্বাভাবিক হোক ; তাঁদের অনুভূতি প্রকাশের সাহিত্যিক কুশলতা বৃদ্ধি পেতে থাক।

মোটামুটি বছর দুই চলবার পর ফোর আর্টস ক্লাব উঠে যায়। এ সম্পর্কে দীনেশরঞ্জন লিখেছেন—'নানা কারণে Four Arts Club উঠিয়া যায়। Club-এর একজন বিশেষ উদ্যোক্তা ও একনিষ্ঠ সভ্যের মৃত্যুই তার প্রথম কারণ। তারপর মানুষের শত্রুতা ত আছেই। এমন জিনিস এই কয়জন যুবক এমন সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবে ইহাই যেন অনেকের অশান্তির কারণ ছিল।'[৩০] যতদূর জানতে পেরেছি দ্বিজেশচন্দ্র সেন[৩১] ক্লাব চলা কালেই মারা যান। মনে হয়, দীনেশরঞ্জন ক্লাবের 'একজন বিশেষ উদ্যোক্তা ও একনিষ্ঠ সভ্যের মৃত্যু বলতে দ্বিজেশচন্দ্র সেনের মৃত্যুই বুঝিয়েছেন। এতে তাঁদের উৎসাহে ভাঁটা পড়েছিলো নিঃসন্দেহে। কিন্তু সতীপ্রসাদ সেন জানিয়েছেন, অন্যান্য অবস্থা অনুকূল থাকলে দ্বিজুবাবুর মৃত্যু যতই গুরুতর ঘটনা হোক ক্লাবের মৃত্যু ডেকে আনতো না। তাঁর মতে, 'মানুষের শত্রুতা' বলতে দীনেশরঞ্জন যা বুঝিয়েছেন সেটাই ক্লাব বন্ধ হ'য়ে যাওয়ার আসল কারণ।

১৯২১-২২ সালে কলকাতা শহরে শিক্ষিত সমাজের সকলেই এমন কি কোনো কোনো প্রগতিশীল ব্রাহ্ম পর্যন্ত নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও মিলিতভাবে ক্লাব-জীবন যাপনকে সহজ বা সুস্থ চোখে দেখতো না। অবশ্য সুকুমার দাশগুপ্ত কিছু কিছু পারিবারিক আপত্তি সত্ত্বেও নিজের বাড়িতে ক্লাবের ঠাঁই করে দিয়েছিলেন।

পারিপার্শ্বিক ও পারিবারিক গঞ্জনা মাঝে মাঝেই চাড়া দিয়ে উঠতো। নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা অনিবার্যভাবে যে ক্লেদ জমিয়ে তোলে তা ক্রমে পুঞ্জীভূত হতে লাগলো, নানা মহলে পাড়ায় বে-পাড়ায় গুঞ্জন শুরু হয়ে গেলো, প্রশ্ন উঠলো কারো কারো চারিত্রিক সুনাম নিয়ে।[৩২] ক্রমে সুকুমারবাবুর বাড়িওয়ালা রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও আপত্তি জানাতে লাগলেন। সদস্য-সদস্যাদের আধুনিক চালচলন, প্রায়ই মেয়েদের সদলবলে গাড়ি থেকে নামা,

নারী-পুরুষের সম্মিলিত কণ্ঠে গান গাওয়া—এসব বরদাস্ত করা অনেক প্রাচীনপন্থী ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ছিলো না। সেই ক্রমবর্ধমান সমালোচনা, বিরাগ ও শত্রুতার জন্য ক্লাব সুকুমারবাবুর বাড়ি থেকে উঠে যায়। তারপর মায়া দেবীর বাড়িতে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় পেলেও অনতিবিলম্বে ফোর আর্টস ক্লাব মৃত্যু বরণ করে।

ফোর আর্টস ক্লাবের একটি পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু সে পরিকল্পনা কার্যে রূপায়িত করা যায় নি। তবে এর দ্বারা একটি গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয়—নাম 'ঝড়ের দোলা' (১৯২২)। এতে আছে সুনীতি দেবী, গোকুলচন্দ্র নাগ, মণীন্দ্রলাল বসু ও দীনেশরঞ্জন দাশ লিখিত যথাক্রমে পাগল, মাধুরী, শ্রীপতি ও জয়মালা শীর্ষক চারটি গল্প। দীনেশরঞ্জনের মতে, 'গ্রন্থ বলা উচিত নয়, গুচ্ছও নয়, চারজনের মনের চারটি ফুল।'[৩৩] ক্লাব-প্রকাশিত আরেকটি গ্রন্থ ছোটদের ছড়া ও গল্পের বই উমা দাশগুপ্তার লেখা 'ঘুমের আগে'। এছাড়া ছোটদের নিজের লেখা গল্পের বই 'উষার আলো' প্রকাশের বিজ্ঞাপন ছিলো, কিন্তু প্রকাশিত হয় নি।

এই হলো চতুষ্কলা সমিতির দু'বছরের (১৯২১-২২) আয়ুষ্কালের ইতিহাস। সেই ইতিহাসের পর্যালোচনায় এমন অনেকের নাম উল্লিখিত হয়েছে যাঁরা পরবর্তী-কালে লেখক ও শিল্পীরূপে প্রখ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁদের ফলপ্রসবিনী প্রতিভার বীজক্ষেত্র ছিলো (ফুলের দোকানের আড্ডাসহ) ফোর আর্টস ক্লাব, লীলাভূমি ছিলো কল্লোল পত্রিকা। সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে ক্লাবটিকে নিশ্চিতভাবে কল্লোলের অগ্রদূত বলা যায়। যে নির্বাধ জীবনচর্চা, যৌবনবন্দনা, অন্তহীন পথ চলার আবেগ, নানামুখিন্ চিন্তা ও অনুভূতির উষ্ণ রক্তপ্রবাহ, সাহসিক দৃষ্টির দিশাসন্ধান, নব্যরুচির সজীব হাওয়া কল্লোলের কালে উদ্বেলিত হয়েছিলো চতুষ্কলা সমিতিতে তার প্রথম সাড়া জেগেছিলো। হয়তো তাতে উচ্ছ্বাস ও বায়বীয়তা ছিলো কিছু বেশি, কিন্তু সেও তো যৌবনায়মান প্রাণেরই আনুষঙ্গিক। তাই ফোর আর্টস ক্লাবের মৃত্যু-প্রসঙ্গে মনে পড়ে প্রায় সমসাময়িককালে (১৯২৮) যৌবনের মৃত্যু-প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায়ের উক্তি—'অনবচ্ছিন্ন যৌবনপ্রবাহের মৃত্যু একটু বাঁক, জন্ম তার উল্টোপিঠ। ···মৃত্যুর পরেও যৌবন আছে, কিন্তু জরার মধ্যে যৌবন নেই। যৌবন যেন ঠাস্-বুনন, মৃত্যু তাকে যেখান থেকেই ছিঁড়ে নিক—সে অল্পের মধ্যে সম্পূর্ণ।'[৩৪]

১. মানডে ক্লাবের (১৯১৫) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুকুমার রায় (চৌধুরী)। সভ্যদের মধ্যে ছিলেন—শিশিরকুমার দত্ত, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, জীবনময় রায়, প্রশান্তচন্দ্র

মহালনবীশ, হিরণকুমার সান্যাল, দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী অজিতকুমার চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুবিনয় রায়, শ্রীশচন্দ্র সেন, অমলচন্দ্র হোম, অতুলপ্রসাদ সেন, কালিদাস নাগ, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি। এর অধিবেশনে অন্যান্যদের মধ্যে শান্তা দেবী ও সীতা দেবী যোগদান করতেন। এটিকে সেকালে (ব্রাহ্ম) সমাজ-পাড়ার ক্লাব বলা হত। সেখানে মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ আসতেন। কিছু কিছু ব্যক্তির উভয় সভাতে যাতায়াত থাকলেও মানডে ক্লাব ও ফোর আর্টস ক্লাবের মধ্যে প্রত্যক্ষ কোনো যোগ ছিলো না। মানডে ক্লাবের বিবরণ লিখেছেন প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (দ্রঃ যুগান্তর সাময়িকী, ২৩শে আষাঢ়, ১৩৭০ ও ১৮ই শ্রাবণ, ১৩৭০)।

২. গোকুলচন্দ্রের ফুলের দোকানে প্রথম দিকে আড্ডাধারীদের মধ্যে ছিলেন অতুল বসু, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, যামিনী রায়, সতীপ্রসাদ সেন (গোরাবাবু), দীনেশরঞ্জন দাশ ইত্যাদি।

৩. দীনেশরঞ্জন দাশ, 'গোকুলচন্দ্র নাগ', কল্লোল, অগ্রহায়ণ, ৮ম সংখ্যা, ১৩৩২।

৪. শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা হেমলতা সরকারের পত্র।

৫. ক্লাবে মেয়েদের আনা সম্পর্কে প্রথমে উদ্‌যোক্তাদের মনে কিছু সংশয় ছিলো। কিন্তু প্রাথমিক দ্বিধার পর মেয়েদের প্রবেশাধিকারের সপক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দীনেশরঞ্জন আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, 'সমাজে' সুনীতি দেবী গান করেন—তাঁকে ক্লাবে আনা যাবে।

৬. গোকুলচন্দ্রের মামা বিজয় বসু ছিলেন চিড়িয়াখানার অধিকতা। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর থেকে গোকুলচন্দ্র মামার কাছেই থাকতেন। আর সেই সূত্রেই চিড়িয়াখানার প্রাঙ্গণে ক্লাবের প্রাথমিক আলোচনা সভা হয়। বিজয় বসু এ-ব্যাপারে বাধাও দেন নি, উৎসাহও দেন নি, তিনি নীরব ছিলেন।

৭. মূল নিদর্শন-পত্রের প্রতিলিপি অন্যত্র দেওয়া হল। সতীপ্রসাদ সেনের সৌজন্যে মূল নিদর্শন-পত্রটি দেখতে পেয়েছি।

৮. দীনেশরঞ্জনের কনিষ্ঠা ভগ্নী নিরুপমা দাশগুপ্তা জানিয়েছেন, নিদর্শন-পত্রটিতে স্বাক্ষর করার জন্য তাঁকেও অনুরোধ করা হয়েছিলো। কিন্তু তিনি স্বাক্ষর করেন নি।

৯. কথিকাটির অনুলিপি নিরুপমা দাশগুপ্তার সৌজন্যে প্রাপ্ত। তিনি বর্তমানে শান্তিনিকেতনবাসিনী।

১০. 'রোববার রোববার বৈঠক বসে'—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'চলমান জীবন' (দ্বিতীয় পর্ব, ১৩৬১, ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড প্রকাশিত, পৃ: ২৭৭)-এ একথা কান্তিচন্দ্র ঘোষের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। সতীপ্রসাদ সেন জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার বৈঠক বসতো। এই প্রবন্ধে গোকুলচন্দ্রের যে চিঠিটি উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে বুধবারের কথা আছে। সেই লিখিত প্রমাণ-পত্র অনুযায়ী অধিবেশনের দিন বুধবার বলে ধরে নেওয়া উচিত। অন্যদের বক্তব্য স্মৃতির উপর নির্ভরশীল বলে মনে হয়।

১১. সাহিত্য-বিভাগের প্রথম বৈঠক বসে ১৯২১ সালের জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে, খুব সম্ভবত ১৭ জুলাই।

১২. সুকুমার দাশগুপ্তের খুড়তুতো ভাই ইঞ্জিনিয়ার শিশির দাশগুপ্তের স্ত্রী ও নিরুপমা দাশগুপ্তার জা। তিনি মোহিতচন্দ্র সেনের মেয়ে ছিলেন। এঁর সম্পর্কে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—'কবি হিসাবে ইতিপূর্বে তাঁর (উমা দাশগুপ্তার) পরিচিতি হয়েছে। তাঁর রোমান্সধর্মী কবিতার পরিস্ফুটন রয়েছে তাঁর সর্ব অবয়বে, তাঁর চোখের দৃষ্টিতে। প্রথম পরিচয়ে যে মধুর হাসি হেসে আমাকে অভিবাদন করলেন, তার মধ্যে একটা বিষাদের আভাস যেন তাঁর কাব্যের রোমান্সকেই প্রতিফলিত করছিল।'—'চলমান জীবন' (দ্বিতীয় পর্ব), পৃ: ২৭৮। পুলিনবিহারী সেন লিখেছেন—'উত্তরকালে তাঁর (মোহিতচন্দ্রের) কন্যা বাতায়ন-এর কবি উমা দেবীও (১৯০৪-৩১) রবীন্দ্রনাথের একান্ত স্নেহভাজন হয়েছিলেন, তাঁর মধ্যে মাতার সাহিত্য-

শক্তি বিশেষভাবে স্ফুরিত হয়েছিল, অকালমৃত্যুতে তা সম্পূর্ণ বিকাশলাভ করার সুযোগ লাভ করেনি।' দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৮, পৃ ৫৪।

১৩. সুনীতি দেবী, 'ফোর আর্টস ক্লাব', প্রবাসী ষষ্টি বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ১৩৬৭।

১৪. 'চলমান জীবন' (দ্বিতীয় পর্ব), পৃ ২৮১।

১৫. সুনীতি দেবী, 'ফোর আর্টস ক্লাব', প্রবাসী ষষ্টি বার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, ১৩৬৭।

১৬. 'চলমান জীবন' (দ্বিতীয় পর্ব), পৃ ২৭৭।

১৭. জীবেন্দ্র সিংহ রায় রচিত 'প্রমথ চৌধুরী' (দ্বিতীয় সং, ১৯৫৭ পৃ ৯ ও ৬৯) এবং 'চলমান জীবন' (প্রথম পর্ব, ১৩৫৯)।

১৮. কান্তিচন্দ্র ঘোষ, গোকুল নাগ ও যামিনী রায়ের সঙ্গে দাশগুপ্ত পরিবারের আত্মীয়ের মতো সম্পর্ক ছিলো।

১৯. 'চলমান জীবন' (দ্বিতীয় পর্ব), পৃ ২৭৮।

২০. 'চলমান জীবন' (দ্বিতীয় পর্ব) পৃ ২৭৮।

২১. রবীন্দ্রনাথের জামাতা ও মীরা দেবীর স্বামী। তিনি দীনেশরঞ্জনের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে ক্লাবে আসেন।

২২. দেশবন্ধুর সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিলো। দেশবন্ধুকে তিনি 'চিত্তমেসো' বলে ডাকতেন বলে শুনেছি।

২৩. তাঁর আসল নাম নীরুবালা। বিয়ের পর নিরুপমা নাম রাখেন কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ। কান্তিচন্দ্র ছিলেন তাঁর স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

২৪. সতীপ্রসাদ সেন সাউথ সাবার্বাণ স্কুলে গোকুলচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। পরে তিনি দীনেশরঞ্জনের ভাই-ঝি মণিকা দাশগুপ্তাকে বিয়ে করেন।

২৫. অধ্যাপক বিজলীবিহারী সরকারের বোন ও সুনীতি দেবীর ননদ।

২৬. ডাঃ গিরিশ দে-র পুত্র-কন্যা। এ'রা ব্রাহ্ম।

২৭. ইনি মোহিতচন্দ্র সেনের কন্যা ও উমা দাশগুপ্তার বোন।

২৮. সুকুমার দাশগুপ্তের খুড়তুতো ভাই।

২৯. প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৩।

৩০. দীনেশরঞ্জন দাশ, 'গোকুলচন্দ্র নাগ', কল্লোল, অগ্রহায়ণ ৮ম সংখ্যা, ১৩৩২।

৩১. ইনি ভালো গান করতেন। বেঙ্গল ষ্টীম লণ্ড্রি-তে কাজ করতেন। তাঁকে দ্বিজুবাবু বলে ডাকা হতো। তিনি অধ্যাপক তেজেশচন্দ্র সেনের ভাই ছিলেন।

৩২. একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করি একবার ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে সুনীতি দেবী ক্লাবের ও বাইরের কাউকে কাউকে নিয়ে মাঘোৎসবে গানের অনুষ্ঠান করতে যান। কিন্তু সমাজের আচার্য একজনের চারিত্রিক দুর্নামের কথা উল্লেখ করে আপত্তি তোলেন। তাতে ফোর আর্টস ক্লাবের অধিকাংশ ব্যক্তি অনুষ্ঠান-ক্ষেত্র থেকে চলে আসেন। এ-ব্যাপারে সুনীতি দেবীকে খুব বিব্রত হতে হয়, কোনো রকমে বাকীদের নিয়ে তিনি অনুষ্ঠানটি চালিয়ে যান।

৩৩. 'চলমান জীবন' (২য় পর্ব), পৃ ২৭৯।

৩৪. 'তারুণ্য ধর্ম,' প্রবন্ধ (১৯৬৪), পৃ ৫।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কল্লোলের ইতিবৃত্ত ঃ বিচিত্র সংবাদ

মাসিক পত্রিকা কল্লোলের জন্মের বীজ নিহিত ছিলো ফোর আর্টস ক্লাবের স্বল্পায়ু সত্তার মধ্যে। ক্লাবের চর্চিত চতুষ্কলার মধ্যে মুখ্য কলা ছিলো সাহিত্য। ক্লাব প্রতিষ্ঠার সময় সাহিত্য বিভাগ থেকে পত্রিকা বার করবার পরিকল্পনা উদ্‌যোক্তাদের ছিলো। তা নিয়ে গোকুলচন্দ্র, দীনেশরঞ্জন প্রভৃতি আত্মদর্পী তরুণেরা মাঝে মাঝে আলোচনাও করতেন। কোথায় সম্বল, কোথায় লেখা তার কিছু খোঁজ তখন পর্যন্ত ছিলো না। ক্লাব ভেঙে যেতেও তাঁরা কিন্তু নিরাশ হলেন না। কতকটা রাতারাতি কাগজ বার করা ঠিক করে ফেললেন। লেখার আয়োজন বলতে ফোর আর্টস ক্লাবের সাহিত্য-বিভাগের একটি খাতা, 'রমলা'-খ্যাত লেখক মণীন্দ্রলাল বসুর রচনা-দাক্ষিণ্যের প্রতিশ্রুতি, 'প্রবাসী'র সঙ্গে যুক্ত সুধীরকুমার চৌধুরীর লেখক যোগাড় করে দেওয়ার আশ্বাস, 'ঝড়ের দোলা'র অন্যতম লেখিকা সুনীতি দেবীর কলমের জোর। অবশ্য সর্বোপরি 'প্রবাসী' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার গল্প লেখক গোকুলচন্দ্রের স্বপ্ন-সমুথ আত্ম-প্রত্যয় তো ছিলোই। তার সঙ্গে এসে যুক্ত হলো গোকুলচন্দ্রের স্কুলের সহপাঠি সতীপ্রসাদ সেনের কর্মৈষণা, দীনেশরঞ্জনের পরিচালন-ক্ষমতা (এবং লেখার ক্ষমতাও বটে)। আর্থিক সংস্থান বলতে কিছুই ছিলো না। এ-সম্বন্ধে দীনেশরঞ্জন লিখেছেন—'নাম ঠিক করিয়া ফেলিলাম—কল্লোল। গোকুলের ব্যাগে ছিল এক টাকা আট আনা, আমার কাছে ছিল টাকা দুই—এই সম্বল লইয়া দোকান হইতে কাগজ কিনিয়া একটি ছোট প্রেসে কল্লোলের প্রথম হ্যাণ্ডবিল্ ছাপা হইল। ৩০শে চৈত্র সংক্রান্তি—চৈত্র মাসের সং দেখিতে পথে বিপুল জনতা হয়। সেই সুযোগে গোকুল ও আমরা কয়েকজন মিলিয়া হ্যাণ্ডবিল্ বিলি করিতে বাহির হইয়াছিলাম। ইহার পূর্বেই কল্লোলের কিছু কিছু কাপি প্রেসে ছাপিতে দেওয়া হয়। বিধাতার সাহায্যে ১৩৩০-এর পহেলা বৈশাখ কল্লোল ছাপিয়া বাহির হইল।' তবে সতীপ্রসাদ সেন জানিয়েছেন, ১৩২৯ সালের চৈত্র সংক্রান্তির দিনই পত্রিকাটি বন্ধুগোষ্ঠির মধ্যে বিতরিত হয়।

কল্লোলের কার্যালয় স্থাপিত হয় দীনেশরঞ্জনের দাদার বাড়ি ১০/২ পটুয়াটোলা লেনের দু'খানা ঘরে। মানিকতলায় এক বন্ধুর প্রেস থেকে প্রথম কয়েক মাস পত্রিকাটি ছাপা হয়। দীনেশরঞ্জনের সেই বন্ধু কম খরচে দু'মাস কল্লোল ছেপেছিলেন।

এইভাবে কল্লোলের জন্ম হলো। অনাড়ম্বর সেই জন্মের ইতিহাস। তবু প্রায় সাত বছরের পরমায়ু নিয়ে জন্ম-নেওয়া পত্রিকাটি এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়ে তুলেছিলো বাংলা দেশে। শুধু তাই নয়—

আশা আছে তবু যদি কোন দিন শত শত যুগ পরে
বধির শিলার ফেটে যায় বুক
গুঁড়াইয়া যায় তার নিজ সুখ,
জল-কল্লোল তুলি ভীমরোল বক্ষ তাগার ভরে!

—দীনেশরঞ্জন দাশ, কল্লোল, বৈশাখ, ১৩৩০।

দুই

বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকার একটা বিঘোষিত উদ্দেশ্য থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১২৭৯) একটা পত্রসূচনা লিখেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিলো বঙ্গদর্শন হবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 'উক্তি-পত্র'; তাঁদের অর্জিত বিদ্যা, কল্পনাশক্তি, লেখনচাতুর্য ও চিত্তোৎকর্ষ প্রকাশের ক্ষেত্ররূপে পত্রটি ব্যবহৃত হবে। বঙ্গদর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি হবে অপক্ষপাত—ঐতিহ্যাশ্রয়ী ও প্রাগ্রসর, এই উভয় চিন্তার প্রতি সমান সচেতন হওয়ার সঙ্কল্প সম্পাদক ঘোষণা করেছিলেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, বাংলার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্গদর্শনের জন্ম—সে সাধন-যজ্ঞ থেকে অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিতরা বাদ পড়বে না। তাই বঙ্কিম পত্র-মাধ্যমে জ্ঞানবিস্তারের প্রসঙ্গও মুখবন্ধে তুলেছিলেন। ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) প্রকাশ করেন। তিনি তাতে 'বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে' উপযুক্ত-ভাবে প্রতিফলিত করার সঙ্কল্প 'সূচনা'য় ঘোষণা করেন। সমকালীন চিন্তাবিদ্‌গণের সহায়তায় কবিগুরু অনতিবিলম্বে যুগধর্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন[১] —হিন্দুত্ব, ব্যাধি ও প্রতিকার, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ, ধর্মের সকল আদর্শ, মাভৈঃ ইত্যাদি সমাজ-ধর্ম, স্বাদেশিকতা বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে তার দৃষ্টান্ত মেলে। প্রমথ চৌধুরী সবুজপত্রের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩২১) যে মুখপত্র রচনা করেন, তাতে 'ওঁ প্রাণায় স্বাহা' বলে জাগরণ-মন্ত্র উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন—আমাদের মনের ও চরিত্রের অভাব সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করা, দেশের মন যাতে আর বেশি ঘুমিয়ে না পড়ে তার চেষ্টা করা, এবং বাঙালীর জীবনে যে নূতনত্ব এসে পড়েছে তাই পরিষ্কার করে প্রকাশ করা সবুজপত্রের লক্ষ্য হবে। শুধুই সাহিত্যের ফুলের

চাষ নয়—এই স্বল্পপরিসর পত্রিকা তখনকার চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত মনোভাবগুলিকে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করার পক্ষে লেখকদের সাহায্য করবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কল্লোলের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩৩০) কোনো পত্রসূচনা, মুখপত্র, ভূমিকা, সম্পাদকীয় নিবেদন নেই। তাই পত্রটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট ঘোষণা আমরা পাই না। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী স্ব স্ব পত্রিকা প্রকাশের সময় ছিলেন প্রতিষ্ঠিত লেখক ও চিন্তাবিদ্। দেশের কাছে নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু বলবার সামাজিক ও সাহিত্যিক অধিকার তাঁদের ছিলো। কিন্তু কল্লোল ছিলো দুজন স্বপ্নাভিলাষী সাহিত্যনবিশের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা মাত্র।[২] তাঁরা নিজেদের কণ্ঠ দেশের কাছে পৌঁছে দেবার স্পর্ধা তখনও অর্জন করেন নি। শুধু তাই নয়, কোনো বিধিবদ্ধ বা পরিচ্ছন্ন চিন্তা নিয়ে তাঁরা পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন বলেও মনে হয় না।

তবু কল্লোলে প্রকাশিত কিছু কবিতা, গদ্য-প্রস্তাব, সম্পদকীয় মন্তব্য, চিঠিপত্র ইত্যাদি থেকে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা করে নিতে পারি। এর প্রথম সংখ্যার প্রথম রচনা 'কল্লোল' শীর্ষক কবিতা, লেখক দীনেশরঞ্জন। এতে আছে—

আমি কল্লোল শুধু কলরোল ঘুমহারা নিশিদিন,
অজানা জানার নয়নের বারি
নীল চোখে মোর ঢেউ তুলে তারি
পাষাণ শিলায় আছাড়িয়া পড়ি' ফিরে আসি নিশিদিন।

এই সমুদ্রের কলরোলের মধ্যে কবি শুনেছেন সৃষ্টির প্রথম যুগ থেকে ভেসে-আসা মানুষের কান্নার প্রতিধ্বনি—সে কান্না দুঃখের, রোষের। কবি জানেন—

জানি এই ধ্বনি জনমে মরণে হবে না'ক তার সারা,
যাবে না শুকায়ে সাগরের বুক
যাবে না ঘুচিয়া মানুষের দুখ
তবু নিরুপায় কেঁদে দিন যায়, আমি যে বাক্যহারা

মানুষের জনম-মরণের অন্তহীন কান্নার যে রূপ বাক্যহারা, কবির পত্র কল্লোলে তারই মর্মরধ্বনি যে উঠবে, তারই পরোক্ষ আশ্বাস এখানে আছে।

এই সংখ্যাতেই 'কল্লোল' নামাঙ্কিত একটি গদ্য-প্রস্তাবে বর্ষীয়ান্ কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার নতুন বিশ্বামিত্র সেজে তাড়াতাড়ি নতুন কিছু সৃষ্টি করার কথা বলেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আর কারও না হোক তরুণদের চোখে জগৎ গতির লীলা, স্থিতি হচ্ছে সৃষ্টিছাড়া। তাদের মধ্যে আছে নতুন সৃষ্টির

ধৈর্যহীন উন্মাদনা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কল্লোলের তাৎপর্যের কিছু ভুল ব্যাখ্যাও তিনি করেছিলেন—'জল-কল্লোলের' তীরে নূপুর-কঙ্কণের ঝন্‌ঝনি থাকতে পারে; কাজেই সাথে সাথে কাঁসা পিতলের খন্‌খনিও থাকিতে পারে, কিন্তু কর্মের উৎসাহের নামে যে কোলাহল তাহা হয়ত থাকিবে না।' এ কথা সত্য নয়। দীনেশরঞ্জনের কবিতায় পূর্বে দেখেছি, সমুদ্র-কল্লোল মানুষের বুকভরা দুঃখ বা রোষেরই কল্লোল; অতএব তার অধিষ্ঠান কর্মকোলাহলপূর্ণ মানব-সংসার থেকে দূরে নয়। কল্লোলের সৃষ্টির আসরে যেখানে জীবন্ত মানুষেরই আনাগোনা এবং তাদেরই সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা কামনার কলগুঞ্জন[৩] সেখানে কর্মজগৎ বর্জনের প্রশ্ন ওঠে না। এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য সঙ্গীত-প্রসঙ্গে কল্লোলের সাক্ষ্য—'শুনা যায় পূর্বেকার দিনে সুরে ও সঙ্গীতে মানুষ জাগিয়া উঠিত—সুরের উত্তেজনায় কর্তব্যের কার্যে অনুপ্রাণিত হইত…। যে কারণেই হউক এই সুর ও সঙ্গীত ভারতবর্ষের সভ্যসমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। তাই ভারতবর্ষের মানুষ আজ প্রত্যেক দিনের সংগ্রামের ভিতর এত ক্লান্ত হইয়া পড়ে…।[৪]

কল্লোলের লক্ষ্য ছিলো শক্তি সঞ্চারের দিকে। এ শক্তি লাঠি খেলায় দেখানো যায় না, গলাবাজিতে সপ্রমাণ হয় না, নীরবে হা-হুতাশের সংখ্যা গুণে হয় না, অথবা 'আর পারি না' বলে অবসাদে নুয়ে-পড়া ভালোমানুষির মধ্যে হয় না। তার প্রমাণ হয় সেই শতখণ্ডে ছিঁড়ে পড়া একটি মানুষের প্রাণের মধ্যে। অন্যদিকে জীবনের দুঃখ ঝড় বিচ্ছেদ এ সমস্তগুলির ভেতরেই যে জীবনের সম্ভাবনা আছে তা আমরা ভাবতে পারি না বলেই জীবন শুকিয়ে যায়। এ সমস্তগুলির ভেতর থেকে রস সঞ্চয় করে নেওয়াটাই জীবনের আনন্দের কারণ! সেই থেকে শুরু হয় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জীবনের জন্ম। তারই মধ্যে সত্যের খাতির, নির্ভীক চিত্তের প্রতিষ্ঠা।[৫] কল্লোল এই নির্ভীক চিত্তের বাঁচার মন্ত্র, জীবনের শত দুঃখের মধ্যে প্রাণের সাড়া জাগিয়ে তোলার আদর্শ বাংলা দেশে প্রচার করতে চেয়েছিলো। তাই একটি বিজ্ঞাপনে[৬] কল্লোল ঘোষণা করেছিলো—'জীবন যেখানে বারে বারে সংহত হইতেছে সেইখানেই বাঁচিবার শক্তি সঞ্চিত রহিয়াছে।' বলা বাহুল্য, জীবনের সেই শক্তিপীঠ যৌবন ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু কল্লোলের এই আদর্শ সম্বন্ধে বোধ হয় কিছু সংশয়ের প্রচারণা ছিলো। কেউ কেউ একে অশ্লীল পত্রের পর্যায়ে ফেলতেন, কেউ বা হাল্‌কা ধরনের গল্প-মাসিক বলে মনে করতেন। কিন্তু কল্লোল কর্তৃপক্ষ মনে করতেন, তাঁদের একটা সীরিয়াস আদর্শ আছে। বিজয়চন্দ্র প্রথম সংখ্যাতেই গতিধর্মিতার সঙ্গে

স্থিরপ্রাণতার (seriousness) অঙ্গীকারের প্রশ্ন তুলেছিলেন। ১৩৩১ সালের আশ্বিন সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত পূর্বোক্ত বিজ্ঞাপনে সেই অঙ্গীকারের জের টেনে বলা হয়েছে—'পূর্ণবয়স্ক ও চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকাদের জন্য। অল্প বয়স্ক বা যাহারা কিছু পড়িয়া সময় কাটাইতে চান তাহাদের জন্য নহে।' কর্তৃপক্ষ জোর দিয়ে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, গল্পের ভেতর দিয়ে মানুষের জীবন-সমস্যার আলোচনা এবং কবিতায় নূতন অনুভূতির উল্লাস প্রকাশ তাঁদের লক্ষ্য। এই সময়ে বিরোধীদের নিন্দামূলক প্রচারকার্য খুব সম্ভব বেশি ছিলো বলেই কল্লোল নিজের আদর্শ ঘোষণায় প্রথম প্রবৃত্ত হয়। ১৩৩১ সালের কার্তিক সংখ্যা কল্লোলে[৭] সম্পাদকগোষ্ঠী বলেন—'এখন সময় আসিয়াছে বিভিন্ন আদর্শ লইয়া বিভিন্ন কাগজের সৃষ্টি করা। হয়ত ইহাতে আশার দিক হইতে বিফলতার সম্ভাবনা বেশী কিন্তু আজ বিফলতাকে লইয়া ঘর করিবার সময় আসিয়াছে; কখন যে সে সহজ হইয়া আশারও অতীত হইয়া আসে কেহ জানে না। কল্লোল প্রকাশ করিবার সময় এইরূপ একটি আদর্শ লইয়াই অগ্রসর হইয়াছিলাম। এতকাল তাহা সমস্ত বাধা ও অনটনের মধ্য দিয়া রক্ষা করিয়া আসিয়াছি ইহা আমাদের বিশ্বাস। হিতৈষীগণ আশা দিয়া এবং বিরুদ্ধবাদিগণ অনাদর দিয়া আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করিয়াছেন।......শান্তির মধ্যেই সৌন্দর্যের পূর্ণতা, বিরোধের মধ্যে নহে। সাহিত্য বা কাব্যের রস প্রবাহকে সর্বাঙ্গসম্পন্ন শান্তির মধ্যে মিলিত করিয়া যে মহান পরিণাম তাহাই ভারত-বর্ষের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার বস্তু। বাহিরের কাজ এবং ভিতরের মনকে এক করিয়া লওয়াতেই ভারতবর্ষের ধর্ম। সে ধর্মকে সত্য বলিয়া জানিবার জন্য নানা আন্দোলনে নানাভাবে যে মাঝে মাঝে আদর্শ বিক্ষুব্ধ হইতে দেখা গিয়াছে তাহাতে কেবল এই পরিণত সৌন্দর্যের প্রশান্তি গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে মাত্র। ...এই বিশ্ব-প্রবাহের অন্তরের কথাকে সমাজের রূঢ়তার সমক্ষে গল্পের আকারে, কবির চিন্তাতে, নির্ভীকভাবে প্রকাশ করা কল্লোলের একটি উদ্দেশ্য। মানুষের প্রেমের মধ্যে যে ধ্রুবত্ব ও সৌন্দর্য, কামনায় যে অশান্তি ও বেদনা তাহাই কথা-সাহিত্যের আকারে প্রকাশ করিবার চেষ্টা কল্লোলের প্রত্যেক রচনাতে অন্তর-লোকের আকাঙ্ক্ষার মত নীরবে নিহিত থাকে।' এখানে আদর্শগত তিনটি চিন্তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে—পরিণত সৌন্দর্যের প্রশান্তি, প্রেমের ধ্রুবত্ব ও সৌন্দর্য এবং কামনার অশান্তি ও বেদনা।

এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, যুগচিন্তার প্রতি কল্লোলের ঔদাসীন্য ছিলো দ্বিতীয় বর্ষের শেষ সংখ্যায়[৮] সম্পাদকদ্বয় পরবর্তী বর্ষের কাগজ সম্পর্কে

দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন—'যে সুর যে দিন বাজিয়া উঠিবে, তাহা সময়ের হৃদয়বার্তা, কল্লোলের তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।' সুতরাং ধ্রুবত্ব ও সৌন্দর্যই শুধু কল্লোলের আকাঙ্ক্ষিত ছিলো না, যুগের ফসলের প্রতিও তার আগ্রহ ছিলো প্রচুর। তার আরও প্রমাণ পাই কল্লোলের প্রথমবর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায়—বর্তমানের বিশ্বব্যাপী জীবন-সমস্যাকে অবলম্বন করে রচিত গল্প বা প্রবন্ধ কার্যকরী মনে হলে মুদ্রণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তবে ঐ সকল রচনার বক্তব্য সর্বক্ষেত্রে কল্লোলের মত বলে গ্রহণ না করার অনুরোধও জানানো হয়।

যুগচিন্তার অনিবার্য পরিণাম হিসেবে একটা বিদ্রোহাত্মক মনোভঙ্গিকে সামনে রেখে কল্লোলকে চলতে দেখি। যা যৌবনের স্বাভাবিক দাবির বিরোধী, পথিক মানুষের চলার পরিপন্থী, যা সত্যের নামে ভণ্ডামি বা কাপট্যের জঞ্জাল মাত্র, কল্লোলের আদর্শগত পরিমণ্ডলে তার কোনো স্থান ছিলো না। নরনারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে, মনের সঙ্গে দেহের অধিকারগত প্রশ্নে, সামাজিক অন্যায়ের বিচারে তার একটা আপসহীন মনোভাব ছিলো। সে ছিলো যে-কোনো প্রকারের বাবাজী-তন্ত্রের বিরুদ্ধে। তার সোচ্চার ঘোষণা—'যুদ্ধের পর সকল ব্যবসাই মন্দা চলছে—কিন্তু সাধুগিরি ব্যবসাটি দিন দিন খুব প্রতিষ্ঠা লাভ করছে।...এই সব গুরুরা যে কি ক'রে অনেক পণ্ডিত ও বিদ্বান্ লোককেও মোহাচ্ছন্ন করে ফেলে, সে কথা ভেবে ঠিক করা যায় না।... যদি তারা সন্ন্যাসী হয়ে বনে চলে যেত তাতে কারু কিছু আপত্তি করার ছিল না।'[৯]

গোকুলচন্দ্রের জীবৎকাল পর্যন্ত এই হচ্ছে কল্লোলের আদর্শ ও উদ্দেশ্যগত বিঘোষণা। পত্রিকাটি এই সময়-সীমার মধ্যে মোটামুটিভাবে তার সঙ্কল্পের কাঠামো ঠিক করে নিয়েছিলো। কারণ গোকুলচন্দ্র যতটা কাজের লোক ছিলেন তার চেয়ে বেশি ছিলেন ভাবের লোক। আর সেই কারণে অন্তত আদর্শ রচনার ক্ষেত্রে দীনেশরঞ্জন বন্ধু গোকুলচন্দ্রের অগ্রগণ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কল্লোলের আদর্শের প্রশ্নে যদি অতিরিক্ত কোনো কথা ওঠে তবে তা উঠবে পত্রিকাটির সপ্তবর্ষীয় চারিত্র্য বিচার থেকে। গোকুলের মৃত্যুর পর পত্রিকা-প্রসঙ্গে দীনেশরঞ্জন আর যা বলেছেন তা হচ্ছে ওপরের কথাগুলির বিস্তার বা অবস্থাগত বিন্যাস মাত্র।

আরম্ভের দিন থেকে কল্লোল-কর্তৃপক্ষ কাগজটির উদ্দেশ্যকে উচ্চ মানের বলেই মনে করতেন। বাংলার জাতি, ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি তাতে ত্বরান্বিত

হবে বলে তাঁদের বিশ্বাস ছিলো। তাই 'ডাকঘরে'[১০] আশাদীপ্ত বাণী তাঁরা রেখে গেছেন—'... মনে হয়, যে সব কাগজ উচ্চ আদর্শের উপযুক্ত হয়ে না চলবে, সে সব কাগজ বাঙলার পাঠক-সাধারণকে বহুকাল মোহাচ্ছন্ন করে রাখতে পারবে না। সকল চেষ্টার মূলেই উদ্দেশ্য যা থাকুক, বাঙলা ভাষা ও বাঙালীর পক্ষে ভালই হচ্ছে একথা আমি বলব।'

তিন

কল্লোলের পদযাত্রা শুরু হয় গল্প-মাসিক হিসেবে। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (পৃঃ ১২৩) একটি ঘোষণা ছিলো—'কল্লোল—মাসিক গল্প-সাহিত্য।...এরূপ গল্প-সাহিত্য বাংলা দেশে এই প্রথম।' দ্বিতীয়বর্ষের (১৩৩১) ভাদ্র সংখ্যা পর্যন্ত প্রচ্ছদপটে লেখা থাকতো 'বাংলার মাসিক গল্প-সাহিত্য।' ১৩৩১-এর আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনেও কল্লোল সম্বন্ধে বলা হয়—'বাংলার মাসিক গল্প-সাহিত্য পত্রিকা'। সুতরাং কল্লোল কর্তৃপক্ষ পত্রিকাটিকে যে মুখ্যত গল্প মাসিক রূপেই চালাতে চেয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐ ১৩৩১-এরই আশ্বিন থেকে নতুন প্রচ্ছদপট মুদ্রিত হতে থাকে এবং তাতে উপরি-উক্তি পরিচয়-লিপিটি বর্জিত হয়। এর কারণ দু'টি বলে শুনেছি। এক, শুধু গল্প-মাসিক হিসেবে চালালে পত্রিকার এলাকা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, লেখকদের সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্র কর্ষণের সুযোগ কমে যায় এবং ফলত নানা শ্রেণীর পাঠকের কাছে তার আকর্ষণ ও সমাদর সীমিত হয়। এর অনিবার্য পরিণতি পাঠকসংখ্যা হ্রাস এবং ব্যবসায়িক ক্ষতি। অথচ সেকালের জনপ্রিয় ও প্রতিষ্ঠিত কাগজগুলি ছিলো পাঁচমিশেলি, সব রকমের লেখাই তাতে ছাপা হতো। দুই, কল্লোলের নায়করা ক্রমে দেখতে পেয়েছিলেন কিছু উদীয়মান প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন গল্পকার[১১] যেমন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তেমনি কিছু প্রতিভাধর নবীন কবিও[১২] তাঁদের দলে এসে ভিড়েছেন ; কেউ কেউ বা গল্প ও কবিতা উভয় শ্রেণীর রচনাতেই সমান উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। তাছাড়া চিন্তামূলক গদ্য-রচনায় মুন্সীয়ানা আছে এমন প্রাবন্ধিকও তৈরি হয়ে চলেছে—দু'একজনের[১৩] মধ্যে সে ধরণের সম্ভাবনা বিশেষভাবে দেখা যাচ্ছিলো। মোটামুটি এ দুটি কারণে কল্লোলের গল্প-মাসিক নামক বিশেষ পরিচয়াত্মক ছাপটি তুলে দেওয়া হয়। রঙিন ছবি না ছাপার পূর্বসিদ্ধান্তের রদ-বদল যেমন কল্লোলকে

এক সময় করতে হয়, তেমনি শুধু গল্প-মাসিকরূপে কাগজটিকে পরিচায়িত করবার সঙ্কল্পেরও পরিবর্তন ঘটাতে হয়। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, কল্লোল অন্যান্য 'বাজারে' পত্রিকার পুরোপুরি অনুসরণ করতে চেয়েছিলো।

প্রথমে গল্প-মাসিকরূপে আত্মপ্রকাশ করলেও কবিতার জন্য সব সময়ে তার দ্বার উন্মুক্ত ছিলো। প্রথমবর্ষের প্রথমসংখ্যার প্রথম রচনাটিই হচ্ছে দীনেশরঞ্জন লিখিত একটি কবিতা—নাম 'কল্লোল'। সপ্তবর্ষীয় কল্লোলের প্রতিসংখ্যার অঙ্কেই একাধিক কবিতা স্থান পেয়েছে।[:৪] তবে শুধু কবিতা নিয়ে কোনো সংখ্যাই আত্ম-প্রকাশ করেনি। তুলনামূলকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে কল্লোলে গল্পের পরেই স্থান ছিলো কবিতার। এবং সে-সমস্তই নানা মাপের গীতিকবিতা। কল্লোলের পৃষ্ঠায় কবি হিসেবে যাঁদের দেখতে পাই তাঁদের মধ্যে হচ্ছেন—দীনেশরঞ্জন দাশ, কালিদাস নাগ (দীপঙ্কর), নজরুল ইসলাম, জীবনময় রায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, গিরিজাকুমার বসু, সুধীরকুমার চৌধুরী, বনফুল, সুনীতি দেবী, রবীন্দ্রনাথ, সুবোধ রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী, সুরেশচন্দ্র ঘটক, জসীমউদ্দীন, নলিনীকান্ত সরকার, হেমন্দ্রকুমার রায়, নরেন্দ্র দেব, মোহিতলাল মজুমদার, জগৎবন্ধু মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অজিতকুমার দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, প্রিয়ম্বদা দেবী, গোপাললাল দে, হুমায়ুন কবির, জীবনানন্দ দাশ, হেমচন্দ্র বাগচী, রাধাচরণ চক্রবর্তী, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সুনির্মল বসু, আবদুল কাদের, হেমেন্দ্রলাল রায়, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারাণী দেবী (দত্ত), সুকুমার সরকার, চামেলীপ্রভা ঘোষ, কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রণব রায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, ভবানী ভট্টাচার্য, সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, জিতেন্দ্র বক্সী, বন্দে আলী মিয়া, মনোজ বসু ইত্যাদি। কবিতা ছাড়া গানও ছাপা হয়েছে কল্লোলের পৃষ্ঠায়, তাদের রচয়িতা হচ্ছেন—নজরুল ইসলাম, অতুলপ্রসাদ সেন, চিত্তরঞ্জন দাশ, নিরুপমা দেবী, বিশ্বপতি চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (অনুবাদ-গীতি), কল্যাণী ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ, জসীমউদ্দীন, আবদুল কাদের প্রমুখ কবিগণ। প্রকাশিত কবিতাগুলির মধ্যে অনুবাদ কবিতাও দেখা যায়। যেমন, অবনীন্দ্রনাথের খাসিয়া গান, তারাকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ইংরেজী কবিতার অনুবাদ (মূল: হারীন্দ্রনাথ), সারদাচরন রায় (মূল : সংস্কৃত) ও অজিতকুমার দত্তের (মূল : পুশকিন) অনুবাদ-কবিতা।

কল্লোলের প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত গল্প সংখ্যায় প্রচুর। প্রথম দিকে গড় রচনার সংখ্যা যদি হতো পনের তবে দুই তিনটি কবিতা, আলোচনা কাহিনী-

ডাকঘর-সমাচার শীর্ষক গদ্য-নিবন্ধ তিন চারটি এবং বাকি সবই হতো গল্প ও উপন্যাস। শুধু তাই নয় গল্প নিয়েই কল্লোলের কোনো কোনো সংখ্যাকে আত্মপ্রকাশ করতে দেখি—যেমন ১৩৩১-এর আশ্বিন সংখ্যা,[১৫] ১৩৩৪-এর কার্তিক সংখ্যা ('পাষাণ মানব' নামক গাথাটিকে গল্প ধরে নিয়েছি)। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে কল্লোল নিয়ে যে আলোড়ন শুরু হয় তা মুখ্যত গল্প নিয়ে, সে তুলনায় কবিতা নিয়ে আলোড়ন কম হয়েছে। পত্রিকাটিতে প্রকাশিত গল্প বা উপন্যাস দুই শ্রেণীর—মৌলিক ও অনূদিত। মৌলিক গল্পের লেখকরা হচ্ছেন—সুনীতি দেবী, শৈলজানন্দ, দীনেশরঞ্জন, কেতকী দেবী, অতুলেন্দু সেনগুপ্ত, ভবতারণ বসু, রেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সান্ত্বনা বসাক, গোকুলচন্দ্র, সুশীলকুমার রায়, নৃসিংহদাসী দেবী, কৃষ্ণধন দে, কৃষ্ণপদ দাস, অহল্যা গুপ্ত, রামকান্ত সামন্ত, সুরুচিবালা রায়, সুকুমার ভাদুড়ী, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, ভূপতি চৌধুরী, প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত, সুবোধ রায়, প্রিয়কুমার গোস্বামী, প্রবোধ সান্যাল, রবীন্দ্রলাল রায়, সোমনাথ সাহা, সরোজকুমারী দেবী, মিনতি দেবী, অনিল ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়, কুমুদিনীকান্ত কর, প্রমথ চৌধুরী, মুরলীধর বসু, সুধাংশুবিকাশ রায় চৌধুরী, সত্যেন্দ্রকুমার বসু, শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নীলিমা বসু, বিজয় সেনগুপ্ত, হীরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরী, হরিসত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, শিবরাম চক্রবর্তী, বেণুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সুষমা মুখোপাধ্যায়, সুবোধ দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তা দেবী, শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রামনারায়ণ রায়, রবীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারাণী দেবী (দত্ত), রমেশচন্দ্র দাশ, নরেন্দ্র দেব, মণীশ ঘটক (যুবনাশ্ব), শৈলবালা ঘোষজায়া, প্রফুল্লকুমার রায়চৌধুরী, নির্মলকুমার রায়, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র লোধ, জলধর সেন, জগদীশ গুপ্ত, পঞ্চানন ঘোষাল, গিরিজাকুমার বসু,, তারানাথ রায়, হিমাংশুপ্রভা শিকদার, চারুচন্দ্র ঘোষ, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সুধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রীতি সেন, বিমলা দেবী, হরিপদ গুহ, সত্যভূষণ সেন, বিমল দত্ত, মায়া বসু, দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, জগৎবন্ধু মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, উমা মিত্র, অদিতি দেবী, অখিল নিয়োগী, শশিভূষণ পাল, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, সুরমা দেবী, হেমেন্দ্রলাল রায়, নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অমলেন্দু বসু, পঞ্চানন মজুমদার, নিরুপমা দেবী, সুরেশ

চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমলাচরণ বিদ্যারত্ন, হেমেন্দ্রকুমার রায়, অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, পরিমল গোস্বামী, তারানাথ রায়, অনিন্দিতা দেবী, অমিয়া চৌধুরী, কিরণকুমার রায়, সত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত, ভবানী ভট্টাচার্য, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পান্নালাল অধিকারী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায় চৌধুরী, শচীন্দ্রনাথ মজুমদার, কিশোরীমোহন ভট্টাচার্য, সরলকুমার অধিকারী, ভবানী মুখোপাধ্যায়, জাহাঙ্গীর ভকীল, ফণীন্দ্র পাল, সুশীলকুমার ধর, রাণী সুরুচিবালা চৌধুরানী, হরিহর চন্দ্র, প্রণব রায়, দেবকী বসু, সুধীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, তারা মুখোপাধ্যায়, মায়া দেবী, রবীন্দ্রনাথ সেন, বিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, কল্যাণী পাল ইত্যাদি। এই নামমালার মধ্যে কোনো কোনোটিকে ছদ্মনাম বলে মনে করি।

অনুবাদ গল্প কল্লোলে ছাপা হয়েছে, তবে বেশি নয়। মূল লেখকদের নামসহ অনুবাদকদের নাম উল্লেখ করছি—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (জোলা), শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (গ্রেপ্তার : কোনো ইংরেজী গল্পের ছায়া অবলম্বনে), সুকুমার ভাদুড়া (গর্কি), রেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় (ত্যাগ : জাপানী কাহিনী), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (লিও টলস্টয় ও মার্সেল প্রুস্ত), শামসুন নাহার (বিদেশী ছায়া অবলম্বনে), নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (রেমণ্ট), অজ্ঞাতনামা (ডোরা : গর্কি), চিত্তরঞ্জন আচার্য (জাপানী গল্প) প্রভৃতি।

পত্রিকাটিতে মোট এগারোটি মৌলিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের রচয়িতা হিসাবে পাই গোকুলচন্দ্র নাগ ('পথিক'), হরিপদ বসু ('ঘাটের পথে'—বড় গল্প ?), শৈলজানন্দ মুখোপাধায় ('পাম্ববীণা' ও 'ডাক-পিওন'), সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ('স্মৃতির আলো'), সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ('রূপছায়া'), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ('বেদে'), দীনেশরঞ্জন দাশ ('দীপক') ও অসমাপ্ত 'রাতের বাসা'), নরেন্দ্র দেব ('যাদুঘর') ও প্রেমেন্দ্র মিত্র ('মিছিল')। অনুবাদ-উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিলো দুটি—কালিদাস নাগ, গোকুলচন্দ্র নাগ, ও শান্তা দেবা অনূদিত রম্যাঁ রলাঁর 'জাঁ ক্রিসতফ' এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অনূদিত ন্যুট হামসুনের 'মীনকেতন'।

দীনেশরঞ্জন ও গোকুলচন্দ্র উভয়েই নাট্যকলার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তাঁরা দুজনেই সখের অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতেন। তার প্রামাণ্য তথ্য মিলবে দীনেশরঞ্জন ও গোকুলচন্দ্র সম্পর্কিত অধ্যায় দুটিতে। সিনেমা-শিল্পেও তাঁদের আগ্রহ ছিলো যথেষ্ট। গোকুলচন্দ্র প্রাথমিক যোগাযোগের পর তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

পড়েছিলেন, কিন্তু দীনেশরঞ্জন শেষের দিকে পুরোপুরি সিনেমারই লোক হয়ে পড়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ফোর আর্টস ক্লাবের উদ্‌যোগে প্রকাশিত দুই তিনটি চটি বই নিয়ে কল্লোলের যাত্রা শুরু হলেও তার নিজস্ব প্রথম প্রকাশন হচ্ছে স্কুল-কলেজ -ক্লাবে সহজে অভিনয়যোগ্য কবি সুবোধ রায়ের কথানাট্য 'নাট মন্দির'। নাট্যশিল্প ও চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সত্ত্বেও, ভাবতে অবাক লাগে, কল্লোলে কোনো পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রকাশিত হয়নি। তবে একাঙ্ক নাটকই যে বাংলার নাট্যশিল্পের ভবিষ্যৎ এটা তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই শুধু একাঙ্ক নাটকের অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেই[১৬] তাঁরা ক্ষান্ত হননি, কয়েকটি নাটিকা বা একাঙ্কিকা তাঁরা কল্লোলে ছেপেছিলেন। নাট্যকার হচ্ছেন—মণীন্দ্রলাল, বসু (অনুবাদ। মূল : ব্যারী), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ('মুক্তি' ও 'কেয়ার কাঁটা'), মণীশ ঘটক বা যুবনাশ্ব ('পটলডাঙার পাঁচালী'), হরিসাধন চট্টোপাধ্যায় ('অকাজের বাঁশী'), মন্মথ রায় ('অজগরমণি', 'চরকা' ও 'মাতৃ-মূর্তি')।

গদ্য-নিবন্ধ কলোলের বিশেষ অনুশীলনের বিষয় ছিলো বলে মনে হয় না। প্রথম দিকে সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশের কোনো চেষ্টা হয় নি। জ্ঞানের সাহিত্যের প্রতি পত্রিকাটির এই ঔদাসীন্যের কারণ, কর্তৃপক্ষ ও লেখকদের তারুণ্য। তখনকার দিনে যাঁরা প্রাবন্ধিক বলে পরিচিত ছিলেন তাঁদের অনেকেরই পাণ্ডিত্য ছিলো, জ্ঞানের ভার ছিলো—কিন্তু তাঁদের লেখা যতটা গুরুভার ও সারবান্ হতো ততটা চিন্তার অভিনবত্ব ও স্বচ্ছতায় চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতো না। তাঁদের রচনা পাঠকের নিজস্ব মননক্রিয়াকে স্থিতিস্থাপক করতে, আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে পাঠকের মনে ভাবনার আগুন জ্বালাতে প্রায়শই অসমর্থ ছিলো। তাই তরুণ মনের ক্ষুধা মেটাবার খাদ্য তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না বলেই কল্লোলের আসরে তাঁদের ডাক পড়েনি। যেমন প্রথমদিকে ডাক পড়েনি পুরনো আমলের প্রতিষ্ঠিত গল্পকার ও ঔপন্যাসিকদের (দু' এক জন শুধু ব্যতিক্রম)। কিন্তু শেষের দিকে নানা কারণে প্রবীণ কথাসাহিত্যকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়, ছাপা শুরু হয় প্রবীণ-নবীনের নানা জাতের প্রবন্ধ। তবে সুখের কথা এই, পাণ্ডিত্যসর্বস্ব ও ভারী ওজনের প্রবন্ধ প্রকাশের দিকে কল্লোলের নজর তখনও পড়েনি, প্রবাসীর সঞ্চয়নের পাতায় স্থান পাওয়ার মতো তথাকথিত জ্ঞানগর্ভতা তাঁদের ছিলো কিনা সন্দেহ।

সবুজপত্রের যুগে একদল প্রাবন্ধিকের আবির্ভাব ঘটে যাঁরা নিজেদের মতো করে চিন্তা ও বিচার করতে পারতেন, অন্যের চিন্তার ভার অযথা বহন করে চলতেন না। তাঁদের বলবার বিষয় হাল্‌কা ছিলো না, কিন্তু বলবার ধরণটা

ছিলো হালকা। তাঁদের কয়েকজনকে কল্লোলের আসরে দেখতে পাই—প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায় ও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। এছাড়া যাঁরা নতুন প্রাবন্ধিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন—কালিদাস নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ, কাজি আবদুল ওদুদ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জসীমউদ্দিন, বুদ্ধদেব বসু, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, যুবনাশ্ব (মণীশ ঘটক), নীহাররঞ্জন রায়, অমলেন্দু বসু, ভবানী ভট্টচার্য, হুমায়ুন কবির, মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, শান্তা দেবী, বিষ্ণু দে ও অন্নদাশঙ্কর রায়। নতুনদের মধ্যে আরও কিছু নাম—ইন্দুশোভা দেবী, ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সত্যেন্দ্র প্রসাদ বসু, নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, আবদুল হাকীম বিক্রমপুরী, সুরেশচন্দ্র নন্দী, সত্যানন্দ রায়, জগৎবন্ধু মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অবনীনাথ রায়, হেমচন্দ্র বাগচী, অমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, আবদুল কাদের, সত্যেন্দ্র দাস, সুশীলচন্দ্র চক্রবর্তী, ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ, গিরিজাকুমার মুখোপাধ্যায়, ফণিভূষণ চন্দ, হীরেন্দ্রকুমার বসু, অভিনব গুপ্ত, বিজনবিহারী বসু। প্রবীণদের মধ্যে পাই মাত্র কয়েকজনের প্রবন্ধ—বিপিনচন্দ্র পাল, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও পৃথ্বীসিং নাহার। আর ছিলেন বাংলা গদ্যের চিরকালের যাদুকর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এঁদের রচনা প্রায় সবই মৌলিক, অনুবাদ-প্রবন্ধ কম। দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনার নিদর্শন 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (প্রমথ চৌধুরীর ইংরেজী রচনার বঙ্গানুবাদ), 'টলস্টয়ের স্মৃতি' (গর্কি), 'কেমন করে লিখতে শিখি' (সেল্‌মা ল্যাগার্লফ্‌)।

কল্লোলের ফাইল থেকে জানা যায়, ১৩৩০-এর বৈশাখ সংখ্যা থেকে ১৩৩১-এর পৌষ সংখ্যা পর্যন্ত 'সংগ্রহ' নামে একটি বিভাগ থাকতো, অবশ্য দু'এক সংখ্যায় বাদও গেছে। এই বিভাগে অন্যদের লেখা থেকে সুভাষিতাবলী নির্বাচন করে প্রকাশ করা হতো। সবই গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ ইত্যাদি থেকে উদ্ধৃতি। উদ্ধৃতিগুলির নিচে লেখকের নাম থাকতো না, থাকতো লেখার নাম। ১৩৩১-এর পরেও কোনো কোনো সংখ্যায় এই জাতীয় চয়ন চোখে পড়ে। গোকুলচন্দ্র যতদিন জীবিত ছিলেন মুখ্যত তিনিই ভালো ভালো লাইন সংগ্রহ করে দিতেন। কল্লোলের আড্ডাধারী ও লেখকরাও পছন্দমতো উদ্ধৃতি সরবরাহ করতেন। চয়ন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতিশয় সংক্ষিপ্ত। এই প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে 'প্রবাসী'র কষ্টিপাথর ও অন্যান্য সাময়িকীর মাসিক পত্র-পরিক্রমা বিভাগ। কিন্তু সে-সমস্ত ক্ষেত্রে নানা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার উদ্ধৃতি, সারসংক্ষেপ, অনুবাদ বা পর্যালোচনা দেখা যায়, কিন্তু কল্লোলের 'সংগ্রহে' শুধু অর্থপূর্ণ সংক্ষিপ্ত সুভাষিতের সমাবেশ।

পত্রিকাটির অনেক সংখ্যার দ্বিতীয় ফিচার 'আলোচনা'। এতে পুস্তকাদি ও পত্র-পত্রিকার পরিচয়, নানাবিষয়ক চিন্তা, নাট্যালোচনা, সাহিত্য-ভাবনা ইত্যাদি প্রকাশ করা হতো। সময়কালে 'প্রবাসী'তে ছিলো 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ও 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগ। অন্যান্য পত্রিকায়ও অনুরূপ বিভাগ থাকতো। কল্লোল এই দুটি বিভাগ একত্র ক'রে 'আলোচনা' বিভাগ প্রবর্তন করে এবং নিজের ঢঙে বক্তব্য নিবেদনে অগ্রসর হয় (প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে এর আরম্ভ, দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা পর্যন্ত, মাঝে দু'এক সংখ্যায় নেই)। আবার পৃথকভাবে পুস্তক ও পত্র-পরিচয়ও (যেমন ১৩৩১-এর কার্তিক সংখ্যায়) চোখে পড়ে। সুতরাং ঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ী যে এই বিভাগগুলি চলতো, তা নয়।

কল্লোলের তৃতীয় ফিচার 'সমাচার' (আরম্ভ প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে)। এতে দেশ-বিদেশের নানা সংবাদ কিছু কিছু মন্তব্যসহ প্রচারিত হতো। এই বিভাগটিও অনিবার্যভাবেই 'প্রবাসী' পত্রিকার 'দেশ-বিদেশের কথা' বিভাগটি স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু 'সমাচার' বিভাগে সংবাদ-পরিবেশনের নিয়মও সর্বত্র রক্ষিত হয়নি। যেমন ১৩৩১-এর শ্রাবণ সংখ্যায় সংবাদের পরিবর্তে আছে পুস্তক ও পত্র-পরিচয়।

পত্রিকাটির প্রথম থেকে চতুর্থ ফিচার হচ্ছে 'পরিচয় লিপি'। প্রথমটি প্রসঙ্গে কল্লোলের দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় বলা হয়েছে—'কল্লোলে গত এক বৎসর ধরিয়া পরিচয় লিপি লেখা হইতেছে। এই পরিচয় লিপির উদ্দেশ্য, লেখক বা লেখিকাদের রচনার ভিতর যে একটি বিশেষ ভাব থাকে তাহা পাঠক-পাঠিকাদের নিকট উপস্থিত করা। কল্লোলের প্রতি সংখ্যার সমস্ত রচনাগুলির বিচিত্রতা হইতে একটি সহজ সুর সংগ্রহ করিয়া তাহাও পরিচয়লিপির আকারে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা অনেক লেখকের লেখাকে সাধারণের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত করিয়া দিবার সুযোগ পাওয়া যায়।' এই পরিচয় লিপি একসময় বর্জিত হয়। কল্লোলের পঞ্চম ফিচারের নাম 'ছবি'। এই বিভাগে একটি চিত্রধর্মী বর্ণনা থাকতো—উদ্ধৃতি কিংবা মৌলিক। সঙ্গে একটু অলঙ্করণ। চিত্রশিল্পীদের শিল্পকর্মের বিষয় সংগ্রহ করে দেওয়াই ছিলো এর উদ্দেশ্য।

যে সমস্ত ফিচারের কথা উল্লেখ করা হলো তাদের সবই প্রথম দুই বছরের কল্লোল সম্বন্ধে প্রযোজ্য। পত্রিকাটির তৃতীয় বর্ষে (আষাঢ় সংখ্যা থেকে) দেখছি, দীনেশরঞ্জন একটি নতুন বিভাগ খুললেন—'ডাকঘর'। গোকুলচন্দ্রের আমলের ফিচারগুলি সম্পাদক পুরে দিলেন ডাকঘরের বৃহৎ বাক্সে। এতে পুস্তক-পরিচয়, স্মৃতি-তর্পণ, কল্লোলের নানা কথা, দেশ-বিদেশের মনীষী ও লেখক

পরিচিতি, পত্র-পত্রিকা পর্যালোচনা, সম্পাদকীয় নিবেদন, বিচিত্র-সংবাদ-পরিক্রমা, সাহিত্যের নানা দিক, সাহিত্য সম্মেলন ইত্যাদি বহু বিষয়ের অবতারণা ঘটে। মোটামুটিভাবে তৃতীয় বর্ষ আষাঢ় সংখ্যা থেকে ষষ্ঠ বর্ষের মাঘ সংখ্যা পর্যন্ত এই বিভাগ চলতে থাকে, যদিও মাঝে মাঝে বাদ গেছে। কল্লোলকে সমগ্রভাবে জানতে হলে, তার বিচিত্র চিন্তার অনুগামী হতে গেলে 'ডাকঘর' অবশ্য পঠনীয়। ১৩৩৫-এর ফাল্গুন সংখ্যা থেকে বিভাগটি উঠে গেলে কিছুটা পরিবর্তিত ঢঙে তার স্থান অধিকার করে 'প্রবাহ' বিভাগ (এর প্রথম প্রবর্তন ১৩৩৪-এর মাঘ সংখ্যায়)। কল্লোলের মৃত্যু পর্যন্ত এই বিভাগটি মোটামুটি অক্ষুণ্ন ছিলো।

কল্লোলের একটি বিশেষ ফিচার—'কাহিনী'—সেকালের পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না করতেই শেষ হয়ে যায়। এর আরম্ভ ১৩৩০-এর মাঘ সংখ্যা থেকে। এর উপজীব্য বিষয় দেশ-বিদেশের সাহিত্য চিন্তা ও সাহিত্যিক পরিচয়। এটিও ঠিক নিয়মিত বিভাগ ছিলো না। আর্নল্ড বেনেট, William Le Quex, কালিদাস ইত্যাদি কয়েকজনের মানস-সান্নিধ্য লাভের সুযোগ এতে পাওয়া গিয়েছিলো। লেখক হিসেবে মুখ্যত পাই নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কে। এই প্রসঙ্গেই আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়। কল্লোলের অন্যতম কৃতিত্ব এই যে, দেশী ও বিদেশী মনস্বী লেখকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মহৎ সাহিত্যব্রত পত্রিকাটি উদ্‌যাপন করেছিলো। ন্যূট হাম্‌সুন, গর্কি, বেনাভান্তে, বোয়ার, নোগুচি, শ', আন্‌দ্রিভ্‌, শেলী জেরোম, টলস্টয়, বুনিন, গলস্‌ওয়ার্দী, টমাস মান্‌ ইত্যাদির জীবন ও সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব কল্লোলের প্রাপ্য। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ[১৭], ও ভূপতি চৌধুরী আমাকে বলেছেন, সেই সময় বিদেশী লেখকদের বইয়ের ইংরেজী মূল বা অনুবাদ পড়ে এবং বিদেশী পত্র-পত্রিকা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে লেখক-পরিচয় লেখা হতো। সজনীকান্ত দাসও লিখেছেন[১৮], তাঁদের ছাত্রাবস্থায় নরওয়েজিয়ান, স্কাণ্ডিনেভিয়ান, আইসল্যাণ্ডিক, ড্যানিশ, পোলিশ ভাষার বহু গল্প বা উপন্যাস ইংরেজী অনুবাদে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছে। সেই সব গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে বিদেশী সাহিত্যিকদের পরিচায়িত করার সুযোগ কল্লোল গ্রহণ ক'রে একটা নূতনত্ব সম্পাদন করতে পেরেছিলো। বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁদের নিয়ে কল্লোলে কিছু না কিছু আলোচনা হয়েছিলো তাঁরা হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, গোকুলচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সরোজিনী নাইডু, বীরবল, দিলীপকুমার, অবনীন্দ্রনাথ, জলধর সেন, কেদারনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, নজরুল, অমৃতলাল বসু ও কালিদাস নাগ। এই ক্ষেত্রে কল্লোলের গৌরব খুব বেশি নয়, কারণ এঁদের নিয়ে লেখা অন্যান্য কাগজেও বেরুতো। তবে যে প্রবন্ধটিতে বুদ্ধদেব বসু সুকুমার রায়কে পরিচায়িত করেছেন তা সর্বকালের বিচারেই উৎকৃষ্ট। সেকালের বুকে দাঁড়িয়ে অতি তরুণ লেখক কী করে 'আবোল-তাবোলে'র লেখকের এমন মূল্যায়ন করলেন ভাবতে অবাক লাগে।

চার

প্রথম তিন বছর কল্লোলের আকার ছিলো ডিমাই সাইজের পনেরো ফর্মার মতো। কল্লোলের প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিলো প্রথমে চার আনা[১৯] পরে হয় পাঁচ আনা।[২০] ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক মূল্য ছিলো আগাগোড়াই সাড়ে তিন টাকা। অথচ সেকালের বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকাগুলির—যেমন প্রবাসী, ভারতবর্ষ ও বসুমতীর—আকার ছিলো ডবল ক্রাউন সাইজের। তাতে সাময়িক পত্রের একটা আভিজাত্য বজায় থাকতো। কিন্তু কল্লোলের তরুণ কর্তৃপক্ষ দুটি কারণে ডিমাই আকারে তাঁদের কাগজ প্রকাশ করেন—এক, তাতে প্রচলিত রীতির অনুকরণ হবে না ; দুই, পড়বার সুবিধা হবে। কিন্তু এই ছোট আকারের জন্য কল্লোলকে বিক্রির দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছিলো। বিজ্ঞাপন-দাতারা তাঁদের বিজ্ঞাপন ও ব্লক ডবল ক্রাউন আকারের দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরি করতেন। ফলে কল্লোলের জন্য বিজ্ঞাপন পেতে অসুবিধা হতো।[২১] এছাড়া ছোট সাইজ থাকার দরুণ বড় লেখা ও বেশী লেখা ছাপা যেতো না। তাই কল্লোল চতুর্থ বর্ষ (বৈশাখ, ১৩৩৩) থেকে ডবল ক্রাউন আকার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত সেই পরিবর্তিত আকার অক্ষুণ্ণ থাকে।

কিন্তু কল্লোলের এই আকার-পরিবর্তন অনেক পাঠকের মনঃপুত হয়নি। এ-সম্বন্ধে নানা অভিযোগও পত্রিকা-অফিসে এসে পৌঁছোয়। সেই সব অভিযোগের উত্তরে দীনেশরঞ্জন লেখেন—'কল্লোলের আকার পরিবর্তন হওয়াতে অনেক গ্রাহক পত্রে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা এই মামুলী সাইজ পছন্দ করেন না। কল্লোলের আকারের মধ্যে যে বিশেষত্বটুকু ছিল তাহা যেন আর নাই। এখন আর কল্লোলকে দেখিয়াই চেনা যায় না। এরূপ মতামত প্রকাশ করাতে কল্লোলের প্রতি পাঠকবর্গের একটি নিগূঢ় প্রীতির কথাই প্রকাশ পায়। আমরাও

কল্লোলের পূর্বের আকারই পছন্দ করি। কিন্তু যে দুইটি কারণে আকার পরিবর্তন করিতে হইল তাহা আমরা পূর্বেই সবিনয়ে জানাইয়াছি। সুতরাং আশা করি বন্ধুবর্গ আর এ বিষয়ে আমাদের ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না।'[২২]

দীনেশরঞ্জনের বক্তব্যে কিছু যুক্তি ছিলো, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমরা বিশ্বাস করি, গোকুলচন্দ্র বেঁচে থাকলে কল্লোলের আকারের পরিবর্তন ঘটতো না। কারণ তিনি কল্লোলের নিজস্ব চারিত্র্য—সে লিপিগতই হোক আর আকারগতই হোক—তা বাঁচিয়ে রাখার আমৃত্যু পক্ষপাতী ছিলেন।

কল্লোলের যে কয়টি প্রচ্ছদপট বা কভার ডিজাইন দেখেছি তার প্রত্যেকটিতেই এক একটা বিশিষ্ট ভাব চিত্রায়িত। তার প্রথমটি[২৩] পি. ঘোষের আঁকা—একটি নিঃসঙ্গ যুবক সমুদ্রতীরে বসে আছে—অনেকটা দূরে ঢেউয়ের মালার উত্তালতা। সে-যে ভাবুক, উন্মনা, উদাসীন এটা বুঝতে কষ্ট হয় না। সে যেন সংসারের কেউ নয়—একটা কল্পলোকে উধাও তার মন। ছবি নয় তো, যেন একটা কবিতা। এই ছবি বদলে গেছে আবার[২৪]। রঙও পাল্টে গেছে। আগে ছিলো এক-রঙা; এবার থেকে দো-রঙা। প্রতি সংখ্যায় সেই রঙের কম্বিনেশান গেছে বদলে, চিত্রের বিষয়ের পরিবর্তন তার চেয়েও লক্ষণীয়। সমুদ্রের ঢেউ উচ্ছ্বসিত হয়ে এগিয়ে এসেছে তীরবর্তী একটা পুরনো মন্দিরের গায়ে। তরঙ্গাঘাতে ভেঙে পড়েছে অনেকটা—শুধু কোনো মতে দাঁড়িয়ে আছে কাছের মন্দিরের খিলান, ঢেউয়ের সরোষ আক্রমণ চলেছে কিছু দূরের আরও দুটি পোড়ো মন্দিরের গায়ে। যা প্রাচীন, যা অচল, যা স্থিতিশীল তারই প্রতি বিদ্রোহ যেন এখানে রেখায়িত। এর পরে আরেকটা নতুন আইডিয়ার প্রচ্ছদপট[২৫] পাই। এ ছবির শিল্পী 'যতীন'। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গশৃঙ্গের ওপর দাঁড়িয়ে তাণ্ডব নাচন নেচে চলেছেন নটরাজ শিব—অঙ্গে সর্পকুল, এক হাতে আগুন—অন্য হাতে সর্বনাশের ঘণ্টা, মুখে শিঙ্গা। এ ছবি ভাঙনের, ধ্বংসের, সংগ্রামের। চতুর্থ প্রচ্ছদপটে[২৬] আমরা ফিরে যাই কবিতা ও সৌন্দর্যের রাজ্যে। শুভ্র ফেনায়িত বিশাল সমুদ্র, যতদূর চোখ যায় শুধু স্রোতাবর্ত। এপারে দাঁড়িয়ে দুটি তাল গাছ, ওপার নীলদিগন্তে বিলীন—আকাশে উড্ডীয়মান শঙ্খচিলের দল। শেষ ছবিটি হচ্ছে সাগরের একটি ঊর্মি—তার ওপর কল্লোল কথাটি উৎকীর্ণ। এটিই সবচেয়ে নিরাভরণ প্রচ্ছদপট[২৭]।

প্রথমদিকে কল্লোলে কোনো রঙিন ছবি থাকতো না। অথচ প্রতি সংখ্যায় রঙিন ছবি ছিলো সেকালের সাময়িক পত্রের রীতি। এ রীতি-ভঙ্গের প্রসঙ্গে কল্লোলের বক্তব্য[২৮], সব কাগজেই যে ত্রিবর্ণ বা বহুবর্ণ চিত্র থাকে তা দেখে

সম্পাদন বিভাগের রসগ্রহণের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় না। ছবির নিচে যে পরিচয় দেওয়া হয় তার সঙ্গে অনেক সময় ছবির কোনো সম্বন্ধ থাকে না। চিত্রগুলি শিল্পীদের প্রতিভার উৎকৃষ্ট নিদর্শনও নয়। শিল্পকর্মের গুণাগুণ নয়, শিল্পকর্মের সংখ্যার দিকেই কাগজওয়ালাদের বেশী নজর। তার বদলে মনস্বী ব্যক্তি বা উদীয়মান লেখকদের সচিত্র পরিচয় দেওয়ার দিকে কল্লোল মনোযোগ দেয় এবং যাঁদের চেহারা দেখলে, যাঁদের বিষয় জানলে সাহিত্যের ও সাহিত্যানুরাগীদের কল্যাণ হবে তাঁদের ফোটো ছাপার সিদ্ধান্ত নেয়। এর প্রথম নিদর্শন পাই রম্যাঁ রলাঁর স্বাক্ষরযুক্ত ফোটো মুদ্রণে[২৯] তারপর একে একে ন্যুট হামসুন, ম্যাক্সিম্ গর্কি, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র[৩০], জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, গোকুলচন্দ্র নাগ, জেসিন্তো বেনাভান্তে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায় (চৌধুরী), যোয়ান বোয়ার, ইয়োন্ নোগুচি, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সরোজিনী নাইডু, বার্ণার্ড শ, জগদীশচন্দ্র বসু, লিওনিদ্ আন্দ্রিভ্, প্রমথ চৌধুরী, দিলীপকুমার রায়, সুভাষচন্দ্র বসু, অবনীন্দ্রনাথ, দ্যআনুনৎসিয়ো ও মুসোলিনী, ওয়েলস্, শেলী, জেরোম্ কে জেরোম্, টলস্টয়, লালা লাজপত রায়, জলধর সেন, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (ফাল্গুন, ১৩৩৪), মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, অমৃতলাল বসু, আইভান্ বুনিন্, গল্সওয়ার্দী, টমাস মান্, কালিদাস নাগ ইত্যাদির ফোটো-চিত্র বা স্কেচ কল্লোলে আর্ট পেপারে ছাপা হয়। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ১৩৩১ থেকে ১৩৩৬-এর শেষ সংখ্যা পর্যন্ত ফোটো মুদ্রণের কাজ চলতে থাকে। সুতরাং এটা যে কল্লোলের একটা বৈশিষ্ট্য, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অবশ্য রঙিন ছবি না ছাপার সিদ্ধান্তের পরিবর্তন গোকুলচন্দ্রের জীবৎকালেই ঘটে। তিনি ছিলেন আর্ট স্কুলের পাশ-করা ছাত্র, বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকে ছিলেন উদীয়মান শিল্পী। সুতরাং অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত নিম্ন মানের ছবি সম্পর্কে বিতৃষ্ণাবশতঃই তিনি রঙিন ছবি না ছাপার সঙ্কল্প নিয়েছিলেন। অন্যদিকে বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে দুই তিনজনের শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতা দেখে তিনি নিশ্চয়ই চমৎকৃত হয়েছিলেন। ফলে পূর্বসিদ্ধান্তের রদ-বদল ঘটাতে হয়। তাই দেখি গোকুলচন্দ্রের মৃত্যুর মাসেই[৩১] প্রথম মুদ্রিত হয় আর্ট স্কুলে তাঁর সহপাঠী শিল্পী যামিনী রায়ের চিত্রকর্ম ছেলে-কোলে মায়ের[৩২] ছবি। এর কিছুদিন আগে থেকেই গোকুলচন্দ্র গুরুতররূপে অসুস্থ ছিলেন। সুতরাং প্রশ্ন উঠবে, এই রঙিন ছবি ছাপার সিদ্ধান্ত কি গোকুলচন্দ্র না দীনেশরঞ্জন নিয়েছিলেন? যদি প্রথম জন নিয়ে থাকেন তবে এই তাঁর শেষ বন্ধুকৃত্য সম্পাদন। অবশ্য দীনেশ-

রঞ্জনের সঙ্গেও যামিনী রায়ের অন্তরঙ্গতা ছিলো। কল্লোলে এই তরুণ শিল্পীর ছবি—শীতার্ত মা ও ছেলে—মুদ্রিত হয় পৌষ সংখ্যা, ১৩৩২-এ, জপের-ঝুলি-হাতে বৃদ্ধের ছবি শ্রাবণ, ১৩৩৩-এ। সত্যেন্দ্রনাথ বিশীর আঁকা নারীর ছবি আশ্বিন, ১৩৩৩; গোকুলচন্দ্রের অপর সহপাঠী দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর আঁকা পাহাড়িয়া যুবতীর ছবি কার্তিক, ১৩৩৩-এ, 'অতীতের প্রহরী' বৈশাখ, ১৩৩৪-এ, এবং তাঁরই গড়া জগদীশচন্দ্র বসুর মৃন্ময় মূর্তির ফোটো-চিত্র বৈশাখ, ১৩৩৫-এ প্রকাশিত হয়। দীনেশরঞ্জনের আঁকা রঙিন ছবি 'বিষ ও বাঁশী' মুদ্রিত হয় ১৩৩৫-এর কার্তিক সংখ্যায়। সুধাংশু চৌধুরীর 'জীবন ও মৃত্যু' শীর্ষক ছবি (বৈশাখ, ১৩৩৬), ললিতমোহন সেনের 'বীণাবাদিনী' চিত্র (ভাদ্র, ১৩৩৬) এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। তাছাড়া মৃন্ময়-মূর্তি 'পার্সিয়াস্ ও গর্গোন' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫), 'আলো ও ছায়া' (ভাদ্র, ১৩৩৫), 'তাজমহল' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬), 'প্রজ্ঞাপারমিতা, (আশ্বিন, ১৩৩৬), 'দিনের শেষে' (আশ্বিন, ১৩৩৬) এবং 'কবি ফেরদৌসী' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪), 'বিস্ময়' (পৌষ, ১৩৩৫) ও ওমর খৈয়ামের (আষাঢ়, ১৩৩৬) চিত্রও মুদ্রিত হয়। কল্লোলে প্রচারিত চিত্রকলা প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বলবার কথা এই যে, পরবর্তী-কালের বাংলাদেশের গৌরব যামিনী রায় ও দেবীপ্রসাদের শিল্প প্রতিভার বিশেষ সমাদর এখানেই প্রথম হয়েছিলো। সেদিক থেকে একটা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব পত্রিকাটির প্রাপ্য।

কিছু কিছু রঙিন ছবি ও অনেকগুলি ফোটো-চিত্র[৩৩] ছাড়া কল্লোলে আর যা ছাপা হয় তা হচ্ছে ব্যঙ্গচিত্র। দীনেশরঞ্জন প্রসঙ্গে আমরা পরে বলেছি, তিনি ছিলেন এক নতুন পদ্ধতির ব্যঙ্গচিত্রের প্রবর্তক এবং সে চিত্রগুলি পাঠক সমাজে খুবই সমাদৃত হতো। সাদায় কালোয় মুদ্রিত এই ধরনের কিছু ছবি কল্লোলের প্রথম দিকে মুদ্রিত হয়। যেমন 'রাত পোহাল শুন্‌ছি সখি' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০), 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে' (আষাঢ়, ১৩৩০), 'আবার তোরা মানুষ হ' (শ্রাবণ, ১৩৩০), 'আমার দেশ' (ভাদ্র, ১৩৩০), 'বারেক পথ ভোল' (আশ্বিন, ১৩৩০), 'বাজারেতে ধার মেলে না' (কার্তিক, ১৩৩০), 'তুমি যে সুরের আগুন' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩০), 'জীবন' (পৌষ, ১৩৩০), ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া প্রতি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় 'ছবি' শীর্ষক ফিচারে, গল্প-উপন্যাসের নাম-পত্রে ও অন্যান্য স্থলে অলঙ্করণের নিদর্শন আছে। কল্লোলের অগ্রদূত ফোর আর্টস ক্লাবের অনুশীলনের অন্যতম বিষয় ছিলো চিত্রশিল্প এবং কল্লোলের সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক ছিলেন চিত্রশিল্পী। সুতরাং কল্লোলের পৃষ্ঠায় শিল্পচর্চার প্রমাণপত্রগুলি তাঁদের শিল্পকলা-কুতূহলেরই দৃষ্টান্ত।

পাঁচ

কল্লোল পত্রিকার (এবং কল্লোল পাবলিশিং হাউসের) কার্যালয় ১৩৩১ সালের আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত ছিলো দীনেশরঞ্জনের মেজো ভাই এবং কর্পোরেশনের সেক্রেটারী বিভাগের কর্মচারী বিভুরঞ্জন দাশগুপ্তের ১০।২ পটুয়াটোলা লেনের ভাড়াটে বাড়িতে। কলেজ স্ট্রীট থেকে মীর্জাপুর স্ট্রীট (বর্তমান সূর্য সেন স্ট্রীট) ধরে এগিয়ে গিয়ে বাঁ-হাতি একটি গলি—পটুয়োটোলা লেন। তারই ওপর একটি ছোট্ট দোতলা বাড়ি। সেই বাড়ির একতলায় রাস্তার দিকে 'এক মুঠো' ঘরে কল্লোলের আপিস ছিলো। একধারে একখানি নীচু চৌকি—সতরঞ্চি ও চাদর ঢাকা, অপরদিকে একটি ছোট আধা-সেক্রেটারিয়েট টেবিল, খান কয়েক চেয়ার ও একটি আলমারী। আর ছিলো একটি ক্যাম্প চেয়ার। ভেতরের দিকের দরজায় একটা আধ ময়লা ঝুলানো পর্দা।[৩৪] কল্লোল আপিসের আসবাবপত্র বলতে ছিলো এই।

আপিসটি প্রথম পর্যায়ে পটুয়াটোলা লেনে ছিলো বৈশাখ, ১৩৩০ থেকে শ্রাবণ, ১৩৩১ পর্যন্ত। তারপর ভাদ্র, ১৩৩১ থেকে ২৭ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়।[৩৫] কল্লোল পাবলিশিং-এর অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ায় ও 'বিজলী'র সম্পাদনাভার গ্রহণ করার জন্য[৩৬] পত্রিকা ও পাবলিশিং হাউসের কার্যালয় ১৩৩২ সালের মাঘ মাসে (ঐ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) আবার পটুয়াটোলা লেনের বাড়িতেই দীনেশ-রঞ্জন সরিয়ে আনেন। অবশিষ্ট কাল কল্লোলের আপিস এখানেই প্রতিষ্ঠিত ছিলো। আপিসের একমাত্র কর্মচারী ছিলেন মণীন্দ্র চাকী[৩৭] নামে এক কর্ম-পাগল যুবক।

যতদূর জানা গেছে, গোকুলচন্দ্র ডাক খুলতেন এবং লেখা ও চিঠিপত্রাদি পড়তেন। তাঁকে সাহায্য করতেন চাকীমশায়। অনেক সময় কোনো কোনো আড্ডাধারী—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি বহু কাজ করে দিতেন। গোকুলচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর স্থান নেন দীনেশরঞ্জন। আগের মতোই মণীন্দ্রবাবু ও বন্ধুদের সহযোগিতা অব্যাহত ছিলো। তাই গোকুলচন্দ্রের জায়গায় কোনো সহ-সম্পাদক নিযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পাদক অনুভব করেন নি। প্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ দীনেশরঞ্জন ও মণীন্দ্রবাবুই রাখতেন, কখনও কখনও বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে যেতেন। প্রথম কয়েকমাস কল্লোল ছাপা হয়েছিলো যে বন্ধুর প্রেসে, সেটি ছিলো আমহার্স্ট স্ট্রীট ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থলে। এখন সেখানে একটি লোহালক্কড়ের দোকান।[৩৮] তারপর অনেকদিন ছাপা হয় ১১।৪ এ মানিকতলা স্ট্রীটের কোহিনূর প্রেস থেকে। এখন সেখানে দাঁড়িয়ে আছে 'ছায়া' সিনেমা

হল।[৩৯] ৩৩এ মদন মিত্র লেনের বাণী প্রেস,[৪০] ২এ অক্রুর দত্ত লেনের বৃহত্ত লহরী প্রেস,[৪১] ২৯এ রামকান্ত মিস্ত্রী লেনের ক্যালকাটা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,[৪২] বিবি রোজিয়ো লেনের ব্রিটানিয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস[৪৩] ইত্যাদি থেকেও পত্রিকাটি বিভিন্ন সময়ে মুদ্রিত হয়।

প্রথম তিন বছর কল্লোল নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতো, কোনো সংখ্যা প্রকাশের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ পেছিয়ে থাকেন নি। কিন্তু ১৩৩৩ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশে বিলম্বে ঘটে। এ সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ আছে আষাঢ় সংখ্যায়—'গত দুই মাস কল্লোল প্রকাশিত হইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছে। যথেষ্ট কারণ না থাকিলে এরূপ হইত না আশা করি গ্রাহকবর্গ তাহা জানেন। গত তিন বৎসর কল্লোল বেশ নিয়মিতভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে। নানা বিঘ্নে যতটুকু পিছাইয়া পড়িয়াছে আগামী মাস নাগাদ তাহা সারিয়া লইতে পারিব বলিয়া আশা করি'।[৪৪] কিন্তু ব্যক্তিগত অসুস্থতা, নিজস্ব প্রেসের অভাব, বিজলীর সম্পাদনা, সিনেমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ এবং আর্থিক অনটনের জন্য শেষের তিন বছর কল্লোল ঠিক সময়মতো বেরুতো না।[৪৫] এই অনিয়ম ও কার্যকারণগত বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে প্রায় সাত বছরের মাথায় কল্লোল একেবারে অন্তহিত হয়ে যায়।

কল্লোল যতদিন জীবিত ছিলো ততদিন লেখক, গ্রাহক ও কার্যালয়ের পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর তা নির্ভরশীল ছিলো। অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত বড়ো কাগজের মতো সাংগঠনিক আয়োজন ও কার্যকুশলতা কল্লোল কর্তৃপক্ষের ছিলো না বলে এই তিনের সংযোগ ও সমবায় ছিলো পত্রিকাটির পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো ব্যবসায়ের পক্ষে খরিদ্দার লক্ষ্মীর দোসর—তাই সকলেই গ্রাহকদের অনুকুলতা প্রার্থনা করে থাকেন। কিন্তু লেখক ও গ্রাহকদের দাক্ষিণ্য কল্লোলের মরণ-বাঁচনের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত ছিলো। তাই মাঝে মাঝেই, বিশেষ করে বর্ষ-শেষের নিবেদনে কর্তৃপক্ষের সবিনয় ঘোষণা থাকতো—'কল্লোল, বাংলার সকল লেখক লেখিকার ও পাঠক পাঠিকার নিজস্ব পত্রিকা। এর রক্ষণ ও সমৃদ্ধি বর্ধন করার ভার সকলের ওপর'।[৪৬] ষষ্ঠ বর্ষের চৈত্র সংখ্যার শেষে সম্পাদকের বিবৃতি আরও মর্মস্পর্শী—স্বত্বাধিকারী হিসেবে লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁর নেই, এর সমস্ত আয় লেখকবর্গ ও কল্লোলের উপকারার্থে নিয়োজিত। এই সহযোগিতামূলক মনোভাবের ফলে ঢাকা ও ভারতবর্ষের অন্যান্য কয়েকটি সহরে 'কল্লোল ক্লাব' গঠিত হয়—পাঠক ও গ্রাহকগণের সঙ্গে কল্লোলের সম্পর্ক কতটা গভীর হয়ে উঠেছিলো, এতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের মনে হয়, বাংলা সাহিত্যে কল্লোল-যুগ ও কল্লোলগোষ্ঠী সৃষ্টিতে নবীন লেখকবৃন্দের সঙ্গে পাঠক ও গ্রাহকবর্গেরও একটা

ভূমিকা আছে।

এর একটি প্রমাণ পাই কল্লোল অফিসের কাজকর্মে আড্ডাধারী বা লেখকদের সহযোগিতার মধ্যে। প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনীর মুখপত্র সচিত্র মাসিক 'উত্তরা'র প্রথম সংখ্যা (আশ্বিন, ১৩৩২) যখন বারাণসী থেকে মুদ্রিত ও লখ্‌নউ থেকে প্রকাশিত হয় তখন কল্লোলের পক্ষ থেকে তার প্রতিক্রিয়ার কথা নিজের হাতে লেখা একটি চিঠিতে সহ-সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তীকে জানান পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। চিঠিটি[৪৭] হচ্ছে এই—

ভাই সুরেশবাবু,

উত্তর ভারতের প্রবাসী বাঙালীদের মুখপত্র 'উত্তরা' সেদিন কল্লোলের বিনিময়ে এসে আমার হাতে পৌঁছল তখন সাগ্রহে সানন্দে এবং সগৌরবে তাকে মাথায় তুলে নিলেম। হাঁ, কাগজ বার করতে হয় ত এমন কাগজই বার হওয়া উচিত। প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে লেখকের অভাব কোনদিনই নেই, হবেও না। তবে এতদিন তাঁদের নিমন্ত্রিত হবার যথাযোগ্য সুযোগ আসেনি, আজ এসেছে, এ সুযোগ অবহেলিত না হলেই খুশী হব। অতুলপ্রসাদ, কমল-ভ্রাতৃদ্বয়, কবিরাজ, ভট্টাচার্য, রায়, মুখোপাধ্যায় প্রমুখ রথীরা যে প্রতিষ্ঠানের পাণ্ডা তার বৈভব যে কোনদিন হ্রাস হবে এটা অবিশ্বাসের কথা, তার উপর তোমার সহকারিতা যাকে প্রাণশক্তি দেবে—তার সাফল্য সুনিশ্চিত। প্রথম সংখ্যা পড়ে ভারী খুশী হয়েছি। সব কটি লেখাই ভারী সুন্দর। বাঙ্‌লার কোন কাগজই একে প্রবন্ধ সম্পদে এড়িয়ে যেতে পারবে না।

একটি ত্রুটি, বিজ্ঞাপনের হার দেওয়া নেই আর নগদ মূল্য বা বার্ষিক মূল্যের কোন উল্লেখ নেই কেন! সেটা জানা দরকার।

অতুলপ্রসাদের 'কয়েকটি গানে'র বিজ্ঞাপন যতটুকু জায়গা জুড়ে আছে, সেটুকু জমির মাসিক খাজনা কত সত্বর জানাবে।

তোমার পত্র পেলে পরে আরো অনেক কিছু বলবার রইল, আজ ভালোবাসা নিয়েই বিদায় ভাই! ইতি সখ্যগর্বিত।

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

কল্লোলের প্রচার সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ সচেতন থাকতেন। প্রচ্ছদপটে অগ্রিম ঘোষণা এক সময় থাকতো ; যেমন ১৩৩১-এর শ্রাবণ সংখ্যায় পাই—'ভাদ্রের কল্লোলে—কবি নজরুল ইসলামের "পূবের হওয়া" শেষ হইবে। এবং আশ্বিন সংখ্যায় "গলয়

মারুত" প্রকাশিত হইবে'। কিংবা ১৩৩৬ এর বৈশাখ সংখ্যার কল্লোল-বিজ্ঞাপনীতে আছে—'সপ্তম বৎসরের কল্লোল অভিনব রসসমৃদ্ধ/বাঙ্‌লার নবতম সাহিত্যের মুখপত্র/আগামী জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের প্রবন্ধ; শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ; শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও ও শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস; নজরুল ইসলামের গান; শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প; শ্রীযুক্ত জীবনানন্দ দাশ, শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু ও শ্রীযুক্ত অজিতকুমার দত্তের কবিতা ইত্যাদি ইত্যাদি।' 'প্রবাসী', আশ্বিন, ১৩৩১-এ প্রচারিত কল্লোলের বিজ্ঞাপনের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। 'প্রগতি'র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (আষাঢ়, ১৩৩৪) আছে কল্লোলের আর একটি বিজ্ঞাপন—'এবার পঞ্চম বর্ষ আরম্ভ হইল। কবিতা, গল্প, উপন্যাসের বিচিত্রতা, প্রবন্ধের অনাবিল বিন্যাস ও অন্যান্য নানা বিষয়ে চারি বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী সাহিত্যানুরাগী মাত্রকেই সন্তোষ দান করিয়াছে। প্রতি সংখ্যায় জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে কোনও সাহিত্য-সেবক, শিল্পী বা অন্য কোনও বিষয়ের সাধকের সংক্ষিপ্ত জীবন ও চিত্র থাকে। আপনি আজই ইহার গ্রাহক হইয়া দেশীয় সাহিত্যের সাহায্য করুন।'

ছয়

কল্লোলের ইতিবৃত্তে আমরা দুটি স্মরণীয় বিরোধের কথা পাই—এক, মোহিতলাল-নজরুল বিরোধ; দুই, শনিবারের চিঠি-কল্লোল বিরোধ। দ্বিতীয়টিকে বৃহত্তর অর্থে প্রাচীনপন্থী ও নব্যপন্থীদের বিরোধও বলা যেতে পারে। শনিবারের চিঠির (আত্মপ্রকাশ: ২৬শে জুলাই, ১৯২৪) কোনো সীরিয়াস আদর্শ ছিলো না, সাহিত্যের শুচিতা রক্ষার নামে সাহিত্যিকদের, বিশেষ করে তরুণদের, উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বাণ নিক্ষেপ করাই এর লক্ষ্য ছিলো। প্রথম সংখ্যাতেই চিঠি আক্রমণ করে বসলো নজরুলকে, তাঁর নতুন নামকরণ করলো 'গাজী আব্বাস বিটকেল'। কিছুদিন পর সজনীকান্ত দাস বেনামে প্রকাশ করলেন নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার (বিজলী, পৌষ, ১৩২৮) সুন্দর প্যারডি 'ব্যাঙ' (শনিবারের চিঠি, ৪ অক্টোবর, ১৯২৪)। প্যারডিটি পড়ে নজরুল আহত বোধ করলেন, মনে করলেন মোহিতলালই এ কবিতার লেখক। তিনি ক্রোধের জ্বালা নিয়ে মোহিতলালকে লক্ষ্য করে লিখলেন 'সর্বনাশের ঘণ্টা', তা প্রকাশিত হলো ১৩৩১ সালের কার্তিক সংখ্যা কল্লোলে। তিনি বললেন—

হে দ্রোণাচার্য ! আজি এই নব জয়-যাত্রার আগে
দ্বেষ-পঙ্কিল হিয়া হ'তে তব শ্বেত পঙ্কজ মাগে
শিষ্য তোমার ; দাও গুরু দাও তব রূপ-মসী ছানি'
অঞ্জলি ভরি শুধু কুৎসিত কদর্যতার গ্লানি !...
যদি অসতী হয় বাণী মোর, কালের পরশুরাম
কঠোর কুঠারে নাশিবে তাহারে, তুমি কেন বদনাম
কিনিতেছ গুরু ! কেন এত তব হিয়া দগ্‌দগী জ্বালা ?
হোলীর রাজা কে সাজালে তোমারে পরায়ে বিনামা মালা ?
তোমার গোপন দুর্বলতারে, ছি ছি, করে মসীময়
প্রকাশিলে, গুরু, এইখানে তব অতি বড় পরাজয় !...
ঐ শোনো আজ ঘরে ঘরে কত উঠিতেছে হাহাকার,
ভূধর প্রমাণ উদরে তোমার এবার পড়িবে মার !
তোমার আর্টের বাঁশরীর সুরে মুগ্ধ হবে না এরা
প্রয়োজন-বাঁশে তোমার আর্টের আর্টশালা হবে নেড়া !...
আমার মৃত্যু লিখিবে আমার জীবনের ইতিহাস
ততদিন গুরু সকলের সাথে ক'রে নাও পরিহাস !

মোহিতলাল 'ব্যাঙ' লেখেননি, শনিবারের চিঠির দলের সঙ্গে তখনও তাঁর পরিচয় ছিলো সামান্যই। তবু যে নজরুল মোহিতলালকে ভুল বুঝলেন তার কারণটি জানতে পারা যায় 'বিদ্রোহী' কবিতা লেখার ইতিহাস থেকে। মোহিতলালের সঙ্গে নজরুলের সৌহার্দ্যের কালে (১৯২০-২১) যখন প্রথমজন, দ্বিতীয়জনের গুরুর আসন নিয়ে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, মোহিতলাল নজরুলকে পড়ে শুনিয়েছিলেন মানসীতে প্রকাশিত (পৌষ, ১৩২১) তাঁর 'আমি' শীর্ষক গদ্য-প্রস্তাবটি। 'বিদ্রোহী' প্রকাশের পর দেখা গেলো 'আমি'র সঙ্গে 'বিদ্রোহী'র ভাবগত ও বাক্যগঠনগত সাদৃশ্য আছে প্রচুর। কিন্তু শিষ্য গুরুর কাছে প্রকাশ্যে কোনো ঋণ স্বীকার না করায় মোহিতলালের ক্ষোভ ও অভিমান হলো। তিনি আগে থেকে লক্ষ্য করছিলেন, নজরুল যতই স্বয়ংবৃত ও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন ততই গুরুর কাছ থেকে সরে যাচ্ছেন। নজরুল মোহিতলালের এই ক্ষোভ ও অভিমানের কথা জানতেন ; তাই তিনি মনে করলেন—মোহিতলাল সেই ক্ষোভ ও অভিমানের 'গোপন দুর্বলতা' বশতঃই 'বিদ্রোহীর' প্যারডি রচনা করতে এগিয়ে এসেছেন। নজরুল প্রতি-আক্রমণ করে 'সর্বনাশের ঘণ্টা' লিখলেন ;

মোহিতলাল শনিবারের চিঠিতে (৮ই কার্তিক, ১৩৩১) তার জবাব দিলেন 'দ্রোণগুরু' লিখে—

গুরু ভার্গব দিল যা তুহারে!—ওরে মিথ্যার রাজা!
আত্মপূজার ভণ্ড পূজারী! যাত্রার বীর সাজা
ঘুচিবে তোমার,—মহাবীর হওয়া মর্কট-সভাতলে!
দুদিনের এই মুখোশ-মহিমা তিতিবে অশ্রুজলে!
অভিশাপরূপী নিয়তি করিবে নিদারুণ পরিহাস—
চরমক্ষণে মেদিনী করিবে রথের চক্র গ্রাস!

এর পরিণতিতে দুজনের মধ্যে এলো চরম বিচ্ছেদ—যা বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এক ট্র্যাজেডিরই সামিল। তারপর হয়ত একের অন্যের প্রতি অন্তঃসলিলা শ্রদ্ধা বা স্নেহ ছিলো, কিন্তু প্রকাশ্যে উভয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোনো উন্নতি ঘটেনি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কল্লোলের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'সর্বনাশের ঘণ্টা' আজও আমাদের কাছে দুই সাহিত্যরথীর 'গদার বাহন' হয়ে আছে। ১৩৩০ সাল থেকে কল্লোলের সঙ্গে মোহিতলালের যোগাযোগ, তবে কোনো দিনই খুব ঘনিষ্ঠতা ছিলো না। তাই এই ঘটনার পরই তিনি কল্লোল-বিরোধী হয়ে পড়লেন একথা সত্য নয়, কারণ ১৩৩২ সালের কার্তিক সংখ্যার কল্লোলেই প্রকাশিত হয়েছিলো তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'পান্থ'। এর আগে বা পরে পত্রিকাটিতে তিনি আর কিছু লেখেন নি। অবশ্য 'কালি-কলমে'র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিলো ঘনিষ্ঠতর। অন্যদিকে নজরুল ও মোহিতলালের সংঘর্ষ সত্ত্বেও তখনকার মতো কল্লোল ও শনিবারের চিঠিতে রীতিমতো দোস্তি ছিলো বলে সজনীকান্ত আত্মস্মৃতিতে লিখেছেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। জন্মের পর থেকে কল্লোল যেমন কিছু ভক্ত গ্রাহক ও লেখক সংগ্রহ করতে পেরেছিলো তেমনি সৃষ্টি করতে পেরেছিলো কিছু শত্রু ও কড়া সমালোচক। শনিবারের চিঠি কল্লোলের বছর খানেক পরে আত্মপ্রকাশ করেই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সজনীকান্ত দাসের ভাষায়—'উৎকর্ণ হইয়াই ছিলাম, শ্রবণ মাত্র একটু চকিত হইয়াই বুঝিতে পারিলাম, গিরি-প্রপাতেরই কল্লোল—সমুদ্রের নহে। পূর্বগামী অন্য এক নির্ঝরিণী পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ এক স্থানে স্খলিত হইয়া একটা বড় রকমের পতনের ফলে "ফল্‌সের" (falls) সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা সর্বৈব "ফল্‌স্‌" (false) সমুদ্র কল্লোল। আমরাও নাগাল ধরিয়া ফেলিলাম, ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল।'[৪৮] সেই সংঘর্ষের দিনে দেখা গেলো সজনীকান্ত লাল-নীল পেন্সিল নিয়ে কল্লোল, কালি-কলম,

প্রগতি, ধূপছায়া ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প-কবিতা দাগাতে বসে গেলেন—উদ্দেশ্য বিদ্রূপাত্মক কবিতা, নাটক, 'মণিমুক্তা' ও 'সংবাদ-সাহিত্যের' জন্য খোরাক সংগ্রহ করা। তিনি ও শনিবারের চিঠি প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন অশ্লীলতা ও যৌনতত্ব, দুর্নীতি ও পারিবারিক সম্পর্কের অসম্মান, ফর্ম ও স্টাইলের বিশৃঙ্খলা নিয়ে। শনিচক্র কাগজ ও কালিতে রণদামামা চালিয়ে গেলেন কিছুদিন ; তারপর তথাকথিত প্রগতিবাদীদের অনাচার রোধের 'সাধু সংকল্প' নিয়ে ১৩৩৩ সালের ফাল্গুন মাসে সজনীকান্ত সুবিচারের আশায় সালিস মানলেন রবীন্দ্রনাথকে। সেই চিঠিতে তিনি আসামী হিসেবে উল্লেখ করলেন বিশেষ করে কল্লোল ও কালি-কলমকে। তাঁর অভিযোগ ছিলো কবিতা ও গল্প উভয় শ্রেণীর রচনার বিরুদ্ধে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি অন্যান্য রচনার সঙ্গে উল্লেখ করলেন কল্লোলে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হল উতলা' নামক একটি গল্প, যুবনাশ্ব লিখিত কয়েকটি গল্প, বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা' শীর্ষক একটি কবিতা ; কালি-কলমে প্রকাশিত নজরুলের 'মাধবী প্রলাপ' ও 'অনামিকা' নামক দুটি কবিতা। এই চিঠির ফলে কল্লোল ও শনিবারের চিঠির দ্বন্দ্ব চরমে গিয়ে পৌঁছোলো।

রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তের চিঠির উত্তরে জানিয়েছিলেন নিজের অনিচ্ছা, অজুহাত দেখিয়েছিলেন শারীরিক অসুস্থতা ও মানসিক ক্লান্তির। আশা প্রকাশ করেছিলেন, সুসময় যদি আসে তবে তাঁর যা বলবার আছে তা তিনি বলবেন। তবে বিবাদের দুই পক্ষ নিষ্ক্রিয় বসে ছিলেন না, কয়েকজন মধ্যস্থও ছিলেন বোধ হয় সক্রিয়। এর ফলে এক বছর বাদে ১৩৩৪ সালের ৪ঠা চৈত্র শনিবার ও ৭ই চৈত্র মঙ্গলবার জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' ভবনে সংরক্ষণশীল ও নব্যপন্থীদের ঝগড়া মিটিয়ে দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথের অধিনায়কত্বে বসলো দুটো বৈঠক। প্রথম দিন অনুপস্থিত থেকে দ্বিতীয় দিন শনিবারের চিঠি ও সনাতনীদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সজনীকান্ত দাস, নীরদ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, মোহিতলাল মজুমদার, গোপাল হালদার, অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। কল্লোল তথা প্রগতিবাদীদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, রাধারাণী দেবী, দীনেশরঞ্জন দাশ ইত্যাদি। কতকটা নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রশান্ত মহলানবিশ, অপূর্বকুমার চন্দ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ প্রভৃতি। প্রথম দিন রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ (সাহিত্যরূপ, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৫) দিলেন তাতে জোর ছিলো রূপ সৃষ্টির ওপর। তাঁর মতে সাহিত্যের আধুনিকতা বিষয় নিয়ে নয়, নবরূপ নিয়ে। তিনি বললেন, 'পূর্বযুগের সাহিত্যেই হোক, নবযুগের সাহিত্যেই হোক, চিরকালের

প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে ; হে গুণী, কোন্ অপূর্ব রূপটি সকল কালের জন্য সৃষ্টি করলে।' প্রথম দিন কিছু প্রশ্নোত্তর হলো, দ্বিতীয় দিন হলো আলোচনা—তার মধ্যে কথা কাটাকাটি ও হট্টগোলের পরিমাণ কম ছিলো।

কল্লোলগোষ্ঠীর সাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনেকটাই ছিলো বিষয় নিয়ে, যদিও রূপের ক্ষেত্রেও তাঁদের সাহসিক পদক্ষেপ ছিলো না এমন নয়। তাই এ-যুগের সাহিত্যের আধুনিকতাকে বিষয়ের দিক থেকে বিচার করতে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করায় তাঁদের অস্বস্তি হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নের জবাবও তাঁরা দিতে পারেন নি। অন্যদিকে শনিচক্র তথা সনাতনীদের অভিযোগও ছিলো অতি আধুনিক সাহিত্যের অভব্য বিষয় ও লেখকদের মানসিক অসুস্থতা নিয়ে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে তাঁরা খুঁজে পেলেন না সামাজিক ও সাহিত্যিক শুচিতা রক্ষার উপায়। সুতরাং দুই দলই সন্তুষ্ট হলেন না। অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের পেছনে রবীন্দ্রনাথের প্রশ্রয় আছে মনে করে শনিচক্র তাঁকে আক্রমণ করতে কসুর করলেন না। রবীন্দ্রনাথ নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেছিলেন 'বসন্ত' গীতিনাট্য (১৯২৩), প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতি তরুণদের রচনাশক্তির প্রশংসা বিভিন্ন সময়ে করেছিলেন[৪৯] যদিও বিকৃতি, উত্তেজনা ও বে-আব্রুতার তিনি স্পষ্টতঃই বিপক্ষে ছিলেন। অপর-দিকে সাহিত্যধর্ম নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বাদ-বিতণ্ডায় অবতীর্ণ হলেন শরৎচন্দ্র ও নরেশচন্দ্র।[৫০] অতি আধুনিক সাহিত্যিকরা মনে মনে জেহাদ পোষণ করলেও বছর দেড়েক চুপ করে রইলেন, তারপর তাঁদের অন্তরের বিস্ফোরণ ভাষায় রূপ পেলো ১৩৩৬ সালের কার্তিক সংখ্যা কল্লোলে প্রকাশিত অচিন্ত্যকুমারের একটি কবিতায়—

এ মোর অত্যুক্তি নয়, এ মোর যথার্থ অহঙ্কার,
যদি পাই দীর্ঘ আয়ু, হাতে যদি থাকে এ লেখনী,
কা'রেও ডরি না কভু, সুকঠোর হউক সংসার,
বন্ধুর বিচ্ছেদ তুচ্ছ, তুচ্ছতর বন্ধুর সরণি!
পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো,
সম্মুখে থাকুন বসে' পথ রুধি' রবীন্দ্র ঠাকুর,
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
যুগ-সূর্য ম্লান তা'র কাছে। মোর পথ আরো দূর!
গভীর আত্মোপলব্ধি—এ আমার দুর্দান্ত সাহস,

উচ্চকণ্ঠে ঘোষিতেছি নব নর-জন্ম-সম্ভাবনা ;
অক্ষরতুলিকা মোর হস্তে যেন রহে অনলস,
ভবিষ্যৎ বৎসরের শঙ্খ আমি—নবীন প্রেরণা !
শক্তির বিলাস নহে, তপস্যার শক্তি আবিষ্কার,
শুনিয়াছি সীমাশূন্য মহা-কাল-সমুদ্রের ধ্বনি
আপন বক্ষের তলে ; আপনারে তাই নমস্কার।
চক্ষে থাক্ আয়ু-উর্মি, হস্তে থাক্ অক্ষয় লেখনী !

—আবিষ্কার।

কল্লোলের পৃষ্ঠায় অচিন্ত্যকুমারের আত্মাবিষ্কারের এই সদম্ভ ঘোষণা অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের স্ব-পরিচায়ক ম্যানিফেস্টো রচনার সামিল। এতে তাঁদের নতুন বিশ্বামিত্র সেজে নতুন সাহিত্য-জগৎ গড়বার 'দুর্দান্ত সাহস, ও তীব্র আত্ম-প্রত্যয় যেমন ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি ব্যক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ থেকে আরও দূরে চলে যাওয়ার কঠোর সংকল্প। এর আগে লেখার দোষে-গুণে তাঁরা রবীন্দ্রপন্থা বর্জন করতে চাইলেও প্রকাশ্যে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখেই চলেছেন। এই প্রথম প্রকাশ্য বিদ্রোহের একটা দৃষ্টান্ত দেখা গেলো। কল্লোলের রবীন্দ্র-বিরোধিতার সম্পর্কে যে জনশ্রুতি পরবর্তীকালে প্রচারিত হয়েছে তা এই কবিতাটির জন্য।

সাত

কল্লোলের আয়ুষ্কাল প্রায় সাত বছর। তার প্রথম সংখ্যা বার হয় ১৩৩০ সালের বৈশাখে, শেষ সংখ্যার প্রকাশ ১৩৩৬ সালের পৌষে। পত্রিকাটির প্রকাশ ও পরিচালনার পেছনে একদল তরুণের অক্লান্ত উদ্যম ছিলো বটে কিন্তু কোনো সাহিত্যোৎসাহী বিত্তবানের সাহায্য বা সমর্থন ছিলো না।[৫১] কল্লোলের কোলাহলে এমন কি প্রবীণ সমাজে সাড়া জাগলেও তার আর্থিক স্বাচ্ছল্য কোনোদিনই বেশী ছিলো না। প্রতি সংখ্যায় কিছু বিজ্ঞাপন থাকতো, কিন্তু যতোটা জেনেছি তার পুরো টাকা সব সময় আদায় হতো না। বিক্রয়সীমার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতি সংখ্যার কপি ছাপা হতো, তাই তেমন কিছু অবিক্রীত থাকতো না। তার নিশ্চিত প্রমাণ আছে ১৩৩৬ সালের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপনটিতে—'গত বৎসরের / কল্লোল / ১৩৩৫ / সম্পূর্ণ সেট্ / নগদ—৩৲/ ডাকে—৩৷৷০ / ১০/২ পটুয়াটোলা লেন, / কলিকাতা / এবার

কিনিয়া রাখুন। কারণ গত পাঁচ বৎসরের কল্লোল এখন একখানিও নাই।' তৎসত্ত্বেও পত্রিকাটির আর্থিক সামর্থ্য সীমাবদ্ধই ছিলো। দুজন স্বপ্নাভিলাষী তরুণের বিশেষ করে দীনেশরঞ্জনের নিরলস প্রচেষ্টায়, সতীপ্রসাদ সেন প্রমুখ কয়েকজন সহযোগীর আনুকূল্যে এবং সর্বোপরি সম্ভাবনাময় লেখকগোষ্ঠীর অকৃপণ দাক্ষিণ্যেই কাগজটি বছর সাতেক টিকে থাকতে পেরেছিলো।[৫২]

গোকুলচন্দ্রের মৃত্যুশয্যায় কল্লোলকে বাঁচিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দীনেশরঞ্জন।[৫৩] রক্ত দিয়ে গড়া জীবনের একটি আদর্শ বস্তুকে রূপ দিতে ও রক্ষা করতে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। এতে তাঁর নিজের মনোযোগের অন্ত ছিলো না। তা সত্ত্বেও সপ্তম বৎসরে কল্লোলের যে মৃত্যু ঘটলো তার প্রধান কারণ দুটি। দীনেশরঞ্জন নিজেই লিখেছেন—'......এই কয় বৎসরে আমি এত অধিক ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছি যে, আমার পক্ষে আর একমাসও এখন কল্লোল চালান সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছে।...ইহার উপর আমার নিজের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় আরও বিপন্নবোধ করিতেছি'।[৫৪] পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তিনি অত্যন্ত ব্যথা পেয়েছিলেন,।[৫৫] তার জন্য দায়ী করেছিলেন নিজের 'সকল ত্রুটী, সকল অযোগ্যতা ও সকল অক্ষমতা'কে। সেই দুঃখের দিনে তিনি আশা করেছিলেন, ভবিষ্যতে তিনি কল্লোল আবার প্রকাশ করতে পারবেন। কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হয়নি।

কল্লোলের প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তটি খুব সম্ভবত আকস্মিক। শেষ সংখ্যায় প্রকাশিত চতুর্থ রচনা প্রবোধকুমার সান্যালের 'কাজল-লতা'র ভূমিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিলো—'এই গল্পটি আগামী চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রতিমাসে বাহির হইবে।' এতে বোঝা যায় তখন পর্যন্ত পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা সম্পাদকের ছিলো না। কিন্তু আরও তিন ফর্মা অর্থাৎ পঁচিশ পৃষ্ঠার পর অকস্মাৎ পত্রিকাটির মৃত্যুসংবাদ ঘোষিত হলো। স্পষ্টই মনে হয়, পূর্বোক্ত কারণ দুটি ছাড়া অন্য কোনো কারণেও হঠাৎ দীনেশরঞ্জন এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তা না হলে অন্তত বার্ষিক গ্রাহকদের মুখ চেয়ে তিনি কাগজটি চৈত্র মাস পর্যন্ত চালাতেন। কিন্তু তা করতে না পেরে তিনি ন্যায়ত ও ধর্মত তাঁদের কাছে ঋণ-স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ছাপাখানা ও কাগজওয়ালার কাছেও ধার ছিলো, ভবিষ্যতে তা শোধ করার সাধু সংকল্পও তাঁর ছিলো।

শেষ নিবেদনে দীনেশরঞ্জন সকলের কাছে নিজের 'অযোগ্যতা ও অপরাধের' মার্জনা চেয়েছেন, বন্ধুবর্গ ও হিতৈষীদের প্রতি জানিয়েছেন আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তাঁদের সৌজন্যের ঋণ অপরিশোধ্য বলে তিনি বিবেচনা করেছেন। কল্লোলের

মৃত্যুক্ষণে সম্পাদকের শেষ উক্তিটি বিশেষ স্মরণীয়—'যিনি সকল সংগ্রামে, সকল বিপদে, সকল গৌরবে একান্ত নিকটে থাকিয়া সুখদুঃখের বোঝা বহিয়াছেন, সেই অন্তরের দেবতাকে প্রণাম করি।'[৫৬]

কল্লোলের এই বিলয় যে-কোনো কারণেই হোক, বাংলাসাহিত্যের পক্ষে এক অপূরণীয় ক্ষতি। দীর্ঘজীবী হবার সম্ভাবনা নিয়েই পত্রিকাটি যেন আবির্ভূত হয়েছিলো, ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াটিও বাইরের লোকের কাছে তেমন প্রকট ছিলো না, তাই তার স্তব্ধ হয়ে যাওয়াটা অনেকের কাছে হয়েছিলো বেদনাদায়ক ঘটনা। এ-সম্পর্কে কল্লোল-গোষ্ঠির উজ্জ্বল এক জ্যোতিষ্ক বুদ্ধদেব বসু বলেছেন—'কালি-কলম আর প্রগতি দুটিই স্বল্পজীবী হয়েছিলো, কিন্তু কল্লোলের স্রোত যে তার পূর্ণতার সময়েই সহসা থেমে যাবে তা আমরা কেউ কল্পনা করিনি। কল্লোল আর চলবে না এ-খবর যেদিন শুনেছিলাম সেদিন মনে যে আঘাত পেয়েছিলাম, তার রেশ এখন পর্যন্ত মন থেকে একেবারে মিলোয়নি। সেদিন মনে মনে বলেছিলাম দীনেশ-দা মস্ত ভুল করলেন, আজও সেকথা অভিমানে আর্দ্র হয়ে মাঝে মাঝে মনে পড়ে। যদি কল্লোল আজ পর্যন্ত চলে আসতো এবং এ-ক'বছরে সমাগত নবীন লেখকদেরও নিঃসংশয় গ্রহণ করতো তাহলে সেটি হতো বাংলাদেশের একটি প্রধান—এবং সাহিত্যের দিক থেকে প্রধানতম—মাসিকপত্র, আর দীনেশরঞ্জনের নাম প্রসিদ্ধ সম্পাদক হিসেবে হয়তো রামানন্দবাবুর পরেই উল্লিখিত হতে পারতো। একথা মনে না করে পারিনে যে এ গৌরব দীনেশরঞ্জন ইচ্ছে করেই হারালেন—বাংলা সিনেমা[৫৭] প্রথম ক্ষতি করলো কল্লোলের অপমৃত্যুর জন্য অন্তত আংশিক রূপে দায়ী হয়ে। সত্যি বলতে আজ পর্যন্তও আমি কল্লোলের অভাব অনুভব করি, কারণ ঠিক ঐ ধরণের আরেকটি সাহিত্যিক মাসিকপত্র এখনও আমাদের দেশে হলো না—মাঝখানে স্বদেশ ও তারপরে পূর্বাশা উঠেছিলো, দুটির একটিও চললো না। উত্তরা এককালে জাত-লিখিয়েদের লোভনীয় পত্রিকা ছিলো, এখন থেকেও নেই। আমাদের মতো লেখকরা, যারা দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লেখে না, যারা নেহাৎই গল্প, কবিতা ইত্যাদি লেখে, অথচ যথেষ্ট রকম গতানুগতিক ভাবে লেখে না, আমরা আমাদের আপন.মনে করতে পারি এমন একটি পত্রিকাও আজ বাংলাদেশে নেই।'[৫৮]

---

১. 'বঙ্গদর্শন নবজীবন লাভ করিয়াই যুগধর্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।'—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), ভাদ্র সংখ্যা, ১৩০৮।

২. নবপর্যায় বঙ্গদর্শন প্রকাশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেখানে ত্রিপুরার মহারাজার কাছ থেকে আর্থিক প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, সেখানে দীনেশরঞ্জন ও গোকুলচন্দ্রের প্রাথমিক সম্বল ছিলো মা করেকটি টাকা।

৩. কল্লোলের 'ডাকঘর' 'সমাচার' ও 'আলোচনা' বিভাগে সমকালীন দেশ ও জীবন সম্পর্কে আগ্রহের দৃষ্টান্ত আছে।

৪. আলোচনা, কল্লোল, বৈশাখ, ১৩৩০। পৃঃ ২১৩।

৫. আলোচনা, কল্লোল, শ্রাবণ, ১৩৩০। পৃঃ ২৯৪-৯৫।

৬. বিজ্ঞাপন বিভাগ, প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩১।

৭. 'মনোলোক' দ্রষ্টব্য।

৮. একটা নিবেদন, কল্লোল, চৈত্র, ১৩৩১। পৃঃ ১০৭৩।

৯. আলোচনা, কল্লোল, ভাদ্র, ১৩৩০। পৃঃ ৩৭৬ ৭৭।

১০. ডাকঘর, কল্লোল, আষাঢ়, ১৩৩২। পৃঃ ২৭৮।

১১. শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও ভূপতি চৌধুরী এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

১২. প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

১৩. তাঁদের মধ্যে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের নাম প্রথমেই করা যেতে পারে।

১৪. ১৩৩৪-এর কার্তিক সংখ্যায় কোনো কবিতা প্রকাশিত হয়নি।

১৫. ১৩৩১-এর ভাদ্র সংখ্যার প্রচ্ছদপটে অগ্রিম ঘোষণা ছিলো—'আশ্বিনের কল্লোলে বাংলার প্রিয় লেখক-লেখিকার রচিত অনেকগুলি সুলিখিত ছোট গল্প প্রকাশিত হইবে। এই সংখ্যায় কবিতা বা উপন্যাস থাকিবে না।'

১৬. 'গোকুলচন্দ্র'-বিষয়ক অধ্যায়ে নিরুপমা দাশগুপ্তার কাছে লিখিত পত্র দ্রষ্টব্য।

১৭. তাঁর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎকার পুরীর ভিক্টোরীয়া হোটেল—১৯৬১ সালে। সেই সময়ে বিষয়টি আলোচিত হয়।

১৮ আত্মস্মৃতি, সজনীকান্ত দাস, ডি, এম, লাইব্রেরী।

১৯. কল্লোল, প্রচ্ছদপট বৈশাখ, ১৩৩১।

২০. কল্লোল, প্রচ্ছদপট, বৈশাখ ১৩৩৬।

২১. ডাকঘর, কল্লোল, চৈত্র, ১৩৩২। পৃঃ ১১৫৪-৫৫।

২২. ডাকঘর, কল্লোল, আষাঢ়, ১৩৩৩। পৃঃ ১৬২।

২৩. কল্লোল, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১।

২৪. কল্লোল, আশ্বিন, ১৩৩১।

২৫. কল্লোল, বৈশাখ, ১৩৩৫।

২৬. কল্লোল, বৈশাখ, ১৩৩৬।

২৭. কল্লোল, কার্তিক, ১৩৩৬।

২৮. রঙিন ছবি, কল্লোল, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১। পৃঃ ১৬৫-৬৮ এবং ডাকঘর, কল্লোল, চৈত্র, ১৩৩২। পৃঃ ১১৫৩।

২৯. রমাঁ রলাঁ কল্লোল, মাঘ, ১৩৩১। পৃঃ ৮৭৮ ও ৮৭৯-এর মধ্যে।

৩০. এর আগে শরৎচন্দ্রের কোনো সুন্দর ফটো ছিলো না। হালের ছবিও ছিলো না। কল্লোলের ১৩৩২ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মুদ্রিত ছবিটি তুলেছিলেন কল্লোলের নবীন লেখক ভূপতি চৌধুরী।

৩১. আশ্বিন, ১৩৩২।

৩২. শিল্পী পত্রিকাটিতে মুদ্রিত ছবিগুলির কোনো পরিচয় দেননি।

৩৩. আর্ট পেপারে মুদ্রিত ফোটো-চিত্র ছাড়া আরও কিছু প্রতিকৃতি কল্লোলে ছাপা হয়েছে। তবে সে সমস্তই কোনো-না কোনো দেশী বা বিদেশী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনার অঙ্গ হিসেবে। দেশবন্ধুর মরদেহ, শোকযাত্রা, চিতায় সৎকার ইত্যাদি ছবি যত্নসহকারে মুদ্রিত হয়েছিলো।

৩৪. ভূপতি চৌধুরী লিখিত প্রবন্ধ 'কল্লোলের দিন' (দিগন্ত, প্রথম বর্ষ) ও মৌখিক বিবৃতি অনুসারে লিখিত।

৩৫. পটুয়াটোলা লেনে শাখা আপিস ছিলো। কারণ ঐ বৎসরের পৌষ সংখ্যায় কার্যালয় হিসেবে দেখানো হয়েছে পটুয়াটোলা লেনকে, চৈত্র সংখ্যায় কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটকে।

৩৬. দীনেশরঞ্জন সম্পর্কিত অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩৭. তিনি এখন ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট (বর্তমান রফি আহমেদ কিদোয়াই ষ্ট্রীট)-এর কোনো এক কেবিনেট মেকার্সের দোকানে কাজ করেন বলে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছি।

৩৮. পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছি।

৩৯. ভূপতি চৌধুরীর কাছ থেকে জেনেছি।

৪০. কল্লোল, অগ্রহায়ণ, ১৩৩১, পৃ, ৭০২।

৪১. কল্লোল, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫, পৃঃ ১৬২।

৪২. কল্লোল, ভাদ্র, ১৩৩৫, পৃঃ ৩৯৪।

৪৩. কল্লোল, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬, পৃঃ ৪৫২।

৪৪. কল্লোল, আষাঢ়, ১৩৩৩, পৃঃ ১৬৪।

৪৫. 'নিজেদের প্রেস না থাকাতে এ বৎসর কল্লোল কয়েক মাস ধরিয়া অত্যন্ত অনিয়মে বাহির হইতেছে।'—কল্লোল।

৪৬. পরিচয় লিপি, কল্লোল, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০।

৪৭. 'উত্তরা' সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তী মশায়ের সৌজন্যে মূল চিঠিটি দেখতে পেয়েছি।

৪৮. সজনীকান্ত দাস, আত্মস্মৃতি (১ম খণ্ড, অগ্রহায়ণ, ১২৬১), ত্রয়োদশ তরঙ্গ।

৪৯. কল্লোল, বৈশাখ, ১৩৩৬ সংখ্যায় মুদ্রিত অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে' উপন্যাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পত্র দ্রষ্টব্য। বিচিত্রাভবনের বৈঠকে রবীন্দ্রনাথ নবীন সাহিত্যিকদের বলেছিলেন—তাঁদের সঙ্গে তাঁর মতের কোনো পার্থক্য নেই এবং তিনি এটি জানতেন বলেই তাঁদের ডেকে পাঠিয়েছেন। দ্রষ্টব্য . ডাকঘর, কল্লোল, বৈশাখ, ১৩৩৫।

৫০. বিচিত্রা ১৩৩৫, শ্রাবণ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ সংখ্যা।

৫১. 'আপনারা জানেন কোনও ধনীব্যক্তি ইহার সাহায্য করেন না'—গ্রাহক ও অনুগ্রাহক-বর্গের নিকট বিশেষ নিবেদন, কল্লোল, পৌষ সংখ্যা, ১৩৩৬।

৫২. তদেব

৫৩. তদেব

৫৪. তদেব

৫৫. তদেব

৫৬. তদেব

৫৭. দীনেশরঞ্জন-সম্পর্কিত আলোচনায় নিরুপমা দেবীর বিবৃতি উল্লেখ করে দেখিয়েছি যে, কল্লোলকে বাঁচাবার জন্যই দীনেশরঞ্জন সিনেমায় চাকরি নিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিলো কিছু অর্থ-স্বাচ্ছল্যের পর আবার কল্লোল বার করবেন। শেষদিকে সে-স্বাচ্ছল্য তিনি পেয়েছিলেন কিন্তু কল্লোল আর বার করেননি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে সিনেমা বাংলা সাহিত্যের অবশ্যই ক্ষতি করেছে। এই প্রসঙ্গে শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজয় ভট্টাচার্য, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁদের নামও উল্লেখযোগ্য। পরে এঁরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবার ফিরে এসেছেন, কিন্তু পূর্বের ধার নিয়ে নয়। তারাশংকর সিনেমায় ঢুকতে গিয়েও ঢোকেননি—এটা অবশ্যই বাংলাসাহিত্যের পক্ষে শুভপ্রদ হয়েছে।

৫৮. কল্লোল ও দীনেশরঞ্জন দাশ, বুদ্ধদেব বসু, কবিতা, কার্তিক, সংখ্যা, ১৩৪৮।

পরিশিষ্ট—১

কল্লোলের বিশ্বকর্মা ঃ দীনেশরঞ্জন দাশ

দীনেশরঞ্জন দাশ ছিলেন একজন করিৎকর্মা ও উদ্যোগী পুরুষ। তাঁর সোৎসাহ পরিচালনায় ফোর আর্টস ক্লাব যেমন অত্যল্প কালের মধ্যে সাড়া জাগাতে পেরেছিলো, তেমনি তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনায় কল্লোল পত্রিকা বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন যুগ রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলো। সে-যুগ কল্লোল-যুগ নামে সুপরিচিত। অনেকের মতে এই যুগেই চিন্তাগত ও প্রকরণসম্পর্কিত আধুনিকতার বীজ বাংলা-সাহিত্যে প্রথম প্রোথিত হয়েছে। সে দাবী গ্রাহ্য কিনা সেটা স্থানান্তরে বিচার্য। তবে এটা ঠিক, কল্লোল ছিলো একটা স্বয়ংপ্রভ ইনস্টিটিউসান এবং সেদিক থেকে তার ভূমিকা ঐতিহাসিক। এই কল্লোলের মতো একটা সৃজনধর্মী প্রতিষ্ঠানকে বুঝতে হলে তার কলাকর্মশালার বিশ্বকর্মা দীনেশরঞ্জনকে জানতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর জীবন ও কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁর মৃত্যুর পর কিছু সময়োচিত মন্তব্য ও বন্ধুজনোচিত গুণগান ছাড়া আজ পর্যন্ত বিশেষ কিছু বলা হয়নি।

দীনেশরঞ্জনের জন্ম চট্টগ্রামে—২৯শে জুলাই, ১৮৮৮ সালে। তাঁদের আদি নিবাস অবশ্য ঢাকা বিক্রমপুর পরগণায় কুমোরপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম ছিলো রায় কৈলাসচন্দ্র দাশ বাহাদুর। তিনি নববিধান ব্রাহ্মসমাজের[১] অন্তর্ভুক্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। অল্প বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। মাতার নাম ছিলো ইচ্ছাময়ী। তিনি মহৎ ও মার্জিত মনের অধিকারিণী ছিলেন। তিনি কবিতা লিখতেন। তাঁর যে কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিলো, তার নাম ছিলো 'আশা-কুসুম'। গ্রন্থটির নামকরণে কৈলাসচন্দ্রের চট্টগ্রামের নিজস্ব বাসগৃহ—'আশা-কুটীরের' প্রভাব আছে। অল্পবয়সে পিতৃহারা সন্তানেরা মায়ের কাছেই পেয়েছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা ও রুচি।[২] যে সমস্ত মায়ের সন্তানদের সঙ্গে সম্পর্ক সূতিকাগৃহ বা বাল্যকাল পর্যন্ত ইচ্ছাময়ী তাঁদের একজন ছিলেন না।[৩] তিনি ছিলেন দীনেশরঞ্জনদের সংগঠনশীল চরিত্র ও বর্ধিষ্ণু মনের আজীবন ধাত্রী।

শৈশবে মৃতদের সংখ্যা বাদ দিলে কৈলাসচন্দ্রের ছিলো চার পুত্র ও তিন কন্যা। মনোরঞ্জন, বিভুরঞ্জন, দীনেশরঞ্জন ও প্রিয়রঞ্জন এই চার পুত্র। চারুবালা, তনুবালা এবং নীরুবালা বা নিরুপমা এই তিন কন্যা। দীনেশরঞ্জন ছিলেন

পিতার তৃতীয় পুত্র ও চতুর্থ সন্তান। তাঁরা প্রায় সকলেই চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

এঁদের মধ্যে মনোরঞ্জন কল্লোলের নিয়মিত গ্রাহক ও প্রাপক ছিলেন। তাঁর দ্বারা সংরক্ষিত ও সুবিন্যস্ত কল্লোলের সংখ্যাগুলিই বর্তমান আলোচনায় ব্যবহৃত হয়েছে।[৪] এঁর মেয়ে মণিকা দেবীই কল্লোলের গোরাবাবু অর্থাৎ সতীপ্রসাদ সেনের স্ত্রী। বিভুরঞ্জনের পটুয়াটোলা লেনের বাড়িতে কল্লোলের অফিস ছিলো। এঁর স্ত্রী কমলা দাশ কল্লোলের তরুণ লেখকগোষ্ঠীর কাছে মাতৃসমা ছিলেন। ইনি প্রায় প্রতিদিন তাঁদের ক্ষুধার অন্ন—অন্তত রুটি তরকারী যোগাতেন[৫] মেজ বোন তরুবালার সঙ্গেও দীনেশরঞ্জনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিলো—তাঁর ১নং নিউ রোডের বিরাট বাড়িতে প্রতি বছর ২৯শে জুলাই দীনেশরঞ্জনের জন্মোৎসব ঘরোয়াভাবে পালিত হতো—তাতে তাঁর কর্মজগতের বন্ধুরা—সায়গল, শচীন দেববর্মণ, পঙ্কজ মল্লিক ইত্যাদি আসতেন।[৬] প্রিয়রঞ্জনও[৭] ছিলেন দীনেশরঞ্জনের প্রিয়। তবে সবচেয়ে ছোট বোন নীরুবালা ওরফে নিরুপমাই ছিলেন মেজদার খুব ঘনিষ্ঠ। কারণ অন্যান্য ভাইবোনদের মধ্যে তাঁর সাহিত্য-চেতনাই অগ্রজের কাছে কিছুটা স্বীকৃতি পেয়েছিলো। সুতরাং মনে হয় দীনেশরঞ্জনের পরিজন-প্রতিবেশ তাঁর সাহিত্য চর্চা ও শিল্পানুশীলনের পক্ষে অনুকূলই ছিলো।

কৈলাসচন্দ্রের অকালমৃত্যুর পর দাশ-পরিবার চট্টগ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে আসে এবং সেখানেই মোটামুটিভাবে বাস করতে থাকে।

দীনেশরঞ্জন চট্টগ্রামের স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করেন। তারপর ভর্তি হন ঢাকা কলেজে। কিন্তু সেখানে তাঁর পড়াশুনো বেশি দূর এগোয়নি। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি কলেজ ছেড়ে দেন। সুতরাং তাঁর আনুষ্ঠানিক বা ছাপমারা বিদ্যার্জন ঐ এণ্ট্রান্স পাশ পর্যন্তই। তিনি আর্ট স্কুলে কিছুদিনের জন্যে ভর্তি হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেখানে বিশেষ কিছু শেখেননি। তিনি যে ভালো ছবি ও কার্টুন আঁকতে পারতেন সে শুধু সহজাত বা স্বোপার্জিত বিদ্যার গুণেই।

আজীবন অবিবাহিত ছিলেন দীনেশরঞ্জন। এই কৌমার্যব্রত পালনের একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। কোলকাতার এক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের পরিবারে তাঁর যাতায়াত ছিলো। শিক্ষাবিদের একটি ছোট মেয়ে ছিলো। সে তখনও ফ্রক পরতো। ক্রমশ সেই মেয়েটির সঙ্গে দীনেশরঞ্জনের অন্তরঙ্গতা হয়। কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিতে দীনেশ প্রথম শ্রেণীর পাত্র ছিলেন না। তাই মেয়েটির বাবা-মা বিয়েতে আপত্তি তোলেন এবং মেয়েকে বিলেতে পাঠিয়ে দেন। পরে দীনেশ-রঞ্জনের এক বন্ধুকেই মেয়েটি বিয়ে করে, কিন্তু দীনেশরঞ্জন বিয়ের কথা আর

জীবনে ভাবেননি।

নিরবচ্ছিন্ন কর্মজীবন যাপন করা দীনেশরঞ্জনের স্বভাব ছিলো না। তিনি, পূর্বেও বলেছি, প্রথম চাকুরী করেন মেট্রোপলিটন কলেজের ক্রীড়াবিদ-অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়ের স্পোর্টস্ গুডস-এর দোকান এস. রায় এণ্ড কোং-এর[৮] সেলসম্যানরূপে। সেখানে এককালে চাকুরী করতেন সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থীও। দোকানটিতে কিছুকাল কাজ করার পর তিনি চলে যান লিণ্ডসে ষ্ট্রিটের এক ওষুধের দোকানে।[৯] সেখানে তিনি খদ্দেরের সঙ্গে এমন সুন্দর ব্যবহার করতেন যে, সবাই তাঁকে একজন অতি সজ্জন বলে চিনে নিতেন। তিনি অনেক সময় ডাক্তারের মতো ওষুধ নির্বাচনে ক্রেতাদের সাহায্য করতেন। কিন্তু সেখানেও তিনি বেশি দিন টিকে থাকতে পারেননি। তখন কার্টুন আঁকা ও অল্পসল্প লেখাই ছিলো তাঁর জীবিকা।[১০]

কল্লোল প্রকাশের পর তিনি তা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। গোকুলচন্দ্র যতদিন জীবিত ও সুস্থ ছিলেন ততদিন তিনি পত্রিকাটির 'সৃষ্টির' দিক দেখতেন আর 'কর্মের' দিক দেখতেন দীনেশরঞ্জন। বিজ্ঞাপন সংগ্রহ, টাকার আদায়, ছাপাখানার কাজ দেখাশুনা করা, বিক্রি ও প্রচারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি নানা বিচিত্র কাজের ভার তিনিই গ্রহণ করতেন। তদুপরি 'আলোচনা', 'ডাকঘর' ইত্যাদি বিভাগে লেখা,[১১] কার্টুন আঁকা, কবিতা ও গল্প রচনা করায় তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিলো না। কল্লোল পত্রিকার মালিকানা থেকে যে সামান্য আয় হতো তাতে ভালোভাবে গ্রাসাচ্ছাদন হওয়ার কথা নয় যদি মেজদা বিভুরঞ্জনের দাক্ষিণ্য না থাকতো। এমনিতর অবস্থায় তিনি আরেক দুঃসাহসিক কাজ করে বসলেন—১৩৩১ সালের বৈশাখে স্থাপন করলেন, কল্লোল পাবলিশিং হাউস।[১২] বৈশাখ থেকে শ্রাবণ পর্যন্ত (১৩৩১) পাবলিশিং হাউসের কার্যালয় ছিলো কল্লোল পত্রিকা অফিসে ১০।২ পটুয়াটোলা লেনে, তারপর ভাদ্র (১৩৩১) থেকে স্থানান্তরিত হয় ২৭, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটে[১৩] আবার পটুয়াটোলা লেনে ফিরে আসে ১৩৩২ সালে ফাল্গুনে।[১৪] এই প্রকাশক সংস্থা থেকে প্রথম বার হয় সুবোধ রায়ের 'নাটমন্দির'[১৫]—তিনটি একাঙ্ক নাটিকার সংকলন। শৈলজানন্দের 'রাঙা শাড়ী' প্রকাশের যে আকাঙ্ক্ষা দীনেশরঞ্জনের ছিলো তা-ও ফলবতী হয়। প্রথম দিকে ফোর আর্টস ক্লাব প্রকাশিত কয়েকখানি বই-এর এজেন্সি ছিলো, ক্রমে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রবাসী কার্যালয়, এম. সি সরকার এণ্ড সন্স, ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, আর্য পাবলিশিং হাউস প্রভৃতি পুস্তকালয়ের গ্রন্থগুলি বিক্রির এজেণ্ট হিসাবে কাজ করার অধিকারও কোম্পানিটি লাভ করেছিলো। পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত ও বিক্রেয় বই-

গুলির একটি বিজ্ঞাপন[১৬] উদ্ধৃত করছি—

কল্লোল পাবলিশিং

প্রকাশক ও পুস্তকের এজেণ্ট

২৭নং কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রবীন্দ্র-জন্মতিথি—রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা হইতে শ্রীসুনীতি দেবী সঙ্কলিত। বাংলা ভাষায় প্রথম জন্মতিথি পুস্তক। মূল্য আড়াই টাকা।

শিবনাথ—শ্রীসুনীতি দেবী প্রণীত। সাধু শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন-লিপি। ছেলে-মেয়েদের উপযোগী করিয়া লেখা। মূল্য আট আনা।

শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায় প্রণীত—হাসি—উপন্যাস (বাঁধাই পাঁচসিকা), লক্ষ্মী—উপন্যাস (বাঁধাই) বার আনা।

ঝড়ের দোলা—শ্রীসুনীতি দেবী, শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ, শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু, শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ এই চারজন সুলেখকের চারিটি গল্প মূল্য বার আনা।

উতঙ্ক—দীনেশরঞ্জন দাশ প্রণীত—পৌরাণিক গল্প। হইতে বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদের অভিনয়ের ও পাঠের উপযোগী করিয়া লেখা কাব্যগ্রন্থ। মূল্য আট আনা।

শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ প্রণীত—রূপ-রেখা—(রূপক সমষ্টি) মূল্য এক টাকা।

শ্রীউমা গুপ্ত প্রণীত—ঘুমের আগে—ছেলেমেয়েদের গল্প ও ছড়ার বই, মূল্য: ছয় আনা।

মিলনের পথে—শ্রীললিতকুমার দে প্রণীত। মূল্য: চার আনা।

মায়াপুরী—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু লিখিত গল্পের বই। মূল্য: দেড় টাকা।

কাজী নজরুল ইসলামের—বিষের বাঁশী—বিদ্রোহী কবির নূতন কবিতা পুস্তক। মূল্য: এক টাকা ছয় আনা।

শ্রীসনৎকুমার সেনের—অর্ধাঙ্গিনী (উপন্যাস) দাম: এক টাকা। প্রতিমা (উপন্যাস)—দাম: এক টাকা—লাভের কপাল—নাটিকা, 'অনাবিল হাস্যরসে' ভরা দাম: আট আনা। বাণিজ্যে বাঙ্গালীর স্থান—(ব্যবসায় সম্বন্ধে কথা) দাম: আট আনা।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস—বাংলার মেয়ে—এক টাকা বার আনা (কাপড়ে বাঁধাই)।

রাঙা শাড়ী—দেড় টাকা (কাপড়ে বাঁধাই)।

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের—কমলের দুঃখ, এক টাকা বার আনা।

শ্রীহেমন্তকুমার সরকারের—বন্দীর ডায়েরী—এক টাকা।

বিপ্লবের পঞ্চ ঋষি—চার আনা।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের—মরীচিকা (নূতন সুরের কবিতা)—খদ্দরে বাঁধাই। এক টাকা।

ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র গুহরায় প্রণীত—প্রজাশক্তি (উপন্যাস)—এক টাকা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—উড়ো চিঠি—দেড় টাকা।

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত—দ্বীপান্তরের কথা (২য় সংস্করণ) মূল্য : এক টাকা। মিলনের পথে—এক টাকা।

শ্রীউল্লাসকর দত্তের—কারাজীবনী (২য় সংস্করণ)—মূল্য এক টাকা।

কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদারের—হেঁয়ালী—এক টাকা, পঞ্চকমালা—এক টাকা, কথানিবন্ধ—এক টাকা, গীতগোবিন্দ—এক টাকা, থেরীগাথা—এক টাকা, তপস্যার ফল (গল্প)—আট আনা।

কিন্তু দীনেশরঞ্জনের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থালয়টি ভাল চলে নি। এর কুফল ভোগ করতে হয়েছিলো কল্লোল পত্রিকাকে—কারণ দোকানের ক্ষতির ভাগ নিতে হয়েছিল। কোনো রকমে বছর দুই চলবার পর বইয়ের দোকানটি ২৭, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট থেকে উঠে যায়,[১৭] অবিক্রীত বইগুলি চালাবার দায়িত্ব দেওয়া হয় পত্রিকা অফিসের উপর। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, কল্লোল পাবলিশিং কল্লোলের নতুন লেখক-গোষ্ঠীর সাহসিক সৃষ্টির ফলভোগী হয় নি।[১৮]

দীনেশরঞ্জনের জীবিকা-নির্বাহের একটা উপায় ছিলো ছবি (প্রচ্ছদপট) ও কার্টুন আঁকা, একথা আগে বলছি। এ বিষয়ে তিনি বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন তার কারণ, সে-সময়ে কার্টুনিস্ট বলতে বিশেষ কেউ ছিলেন না। চঞ্চল মুখোপাধ্যায় নামে একজনের ও দীনেশরঞ্জনের আঁকা কার্টুনই পত্র-পত্রিকায় বেশি বার হতো। আর প্রচ্ছদশিল্পে তাঁর দক্ষতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নজরুল ইসলামের 'বিষের বাঁশী' (১৩৩১) এবং জগদীশচন্দ্র গুপ্তের 'বিনোদিনী'র (১৩৩৪) প্রথম সংস্করণের অঙ্গসজ্জায়। তাঁর আঁকা ছবি বা কার্টুনে প্রায়শঃই D. R. স্বাক্ষর থাকতো। বিভিন্ন ডিজাইন আঁকার কাজও তিনি যে নিতেন তা নিচের বিজ্ঞাপন থেকে বোঝা যায়—

পুস্তক বা পত্রিকার
কভার, হেডপিস্ বা অন্যান্য ডিজাইন
আমাদের দিয়া করাইবেন,
চিত্রশিল্পী ডি আর দাশ দ্বারা পরিচালিত

প্রেস আর্ট কোম্পানী
১০।২ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় কল্লোলের ১৩৩৫ সালের শ্রাবণ সংখ্যায়। এই জাতীয় বিজ্ঞাপন আমরা কল্লোলের দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩১ থেকে দেখতে পাই। এই সময়ে পত্রিকা ও তাঁর সম্পাদকের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তখন দীনেশরঞ্জনের প্রায় না-খেতে-পাবার মতো অবস্থা, ঋণজালে তিনি জর্জরিত। এর ফলে কল্লোলের শেষ বছরে তিনি সিনেমা লাইনের দিকে পা বাড়ান। তিনি ১৯২৯ সালে রবীন্দ্রজামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাই ও গোকুলচন্দ্র নাগের সহপাঠি ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বৃটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মসের সঙ্গে সিনারিও লেখক ও পরিচালক হিসাবে জড়িত হয়ে পড়েন।

এই সময় থেকে তাঁর মন যে চলচ্চিত্রমুখী হয়েছিলো এবং তার বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে তিনি যে চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন তার প্রমাণ আছে 'ডি-আর' নামে 'চলচ্চিত্র' শীর্ষক চারটি আলোচনায়।[১৯] নির্বাকযুগের অভিনেতাদের মূকাভিনয়, ক্যামেরার ফোকাসের সীমাবদ্ধতা, স্টেজ ও চলচ্চিত্রের অভিনয়কলার পার্থক্য, আলোকসম্পাতের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা ও রাত্রিতে ছবি তোলার অসুবিধা,[২০] রূপসজ্জা ও পরিচালনা, ক্লোজ-আপ, মিডল ও লং সট, আণ্ডার ও ওভার অ্যাকটিং, চলচ্চিত্র ব্যবসায়, শিক্ষিত নারী-পুরুষের সিনেমায় যোগদানের প্রয়োজনীয়তা, স্টুডিয়োর পরিবেশ ও অভিনেত্রীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, সিনারিও লেখায় শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ সাহিত্যিকদের আত্মনিয়োগ ইত্যাদি বহু বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। তাঁর সমস্ত বক্তব্যের মধ্যেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছাপ আছে—'কোন ইংরাজী বই থেকে পড়ে না লিখে আমার অভিজ্ঞতায় এ দেশের সুবিধা-অসুবিধা থেকে যতটুকু আহরণ করতে পেরেছি, তাই আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করবার আমার ইচ্ছা।'[২১] সিনেমা জগতের সঙ্গে তিনি এই যে যুক্ত হলেন তা আমৃত্যু অক্ষুণ্ণ ছিলো।

কল্লোলের শেষ বৎসরে নানা কাজে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে এবং তিনি দীর্ঘদিনের জন্য কলকাতার বাইরে চলে যান। স্বাস্থ্য কিছুটা ভালো হওয়ার পর তিনি ফিরে এসে নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেন বটে কিন্তু পূর্বের স্বাস্থ্য আর ফিরে পান নি। ১৯৪১ সালে 'প্রতিশ্রুতি' চিত্রে নিজের ভূমিকার কাজ শেষ করার পরই ডিউডেনাল আলসার রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন এবং মাসাধিককাল রোগভোগের পর তিনি তাঁর বড়ো দিদি চারুবালা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১, নিউ রোড অলিপুরস্থ বাসভবনে ১২ই মে সোমবার বেলা ৩টা ৩৫ মিনিটে পরলোকগমন করেন।

মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে যাঁরা বাসভবনে অথবা শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন : নিউ থিয়েটার্সের ম্যানেজিং ডিরেকটর বীরেন্দ্রনাথ সরকার, রাইচাঁদ বড়াল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদরঞ্জন রায়, পাহাড়ী সান্যাল, যতীন মিত্র, সস্ত্রীক খাঁ সাহেব, আমিনুল হক, সস্ত্রীক ডঃ এ. করিম, লেঃ কঃ ডি. দাশ, সস্ত্রীক এস. কে. সেন, ডাঃ সত্য সেন, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, এস ব্যানার্জি, রামচন্দ্র নাগ, এন. সি. সিং, এস. বি. রায় প্রভৃতি।

দীনেশরঞ্জনের আত্মশ্রাদ্ধের নিম্নোক্ত বর্ণনা নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র 'ধর্মতত্ত্বে' (১৬ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৪৮ সাল) প্রকাশিত হয়েছিলো গত ২৫শে মে, ১নং নিউ রোডে, চট্টগ্রামের 'আশা কুটিরের' সুসন্তান স্বর্গীয় দীনেশরঞ্জন দাশগুপ্তের পবিত্র আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকন্যাগণ কর্তৃক সুন্দরভাবে যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। ময়ুরভঞ্জের মাননীয় মহারানী সুচারু দেবী উপাসনা করেন, ভাই অক্ষয়কুমার লোধ পাঠ ও শেষ প্রার্থনা করেন। কনিষ্ঠ ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত সুকুমার দাশগুপ্ত পরলোকগত আত্মার প্রতি স্বকীয় ভক্তি ও প্রীতির অঞ্জলি দান করিয়া তাঁহার পত্নী কর্তৃক লিখিত সংক্ষিপ্ত সুন্দর জীবনী পাঠ করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান সুকুমার দাশগুপ্ত প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন শ্রীমতী বাণী বসু সঙ্গীতে নেতৃত্ব করেন। উপাসনার প্রারম্ভে ও শেষে শ্রীযুক্ত মানিক লাল দের জ্যেষ্ঠপুত্র সুমধুর কীর্তন করেন'।

দীনেশরঞ্জনের অকালমৃত্যুর সংবাদ সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ আজাদ, যুগান্তর, আনন্দবাজার, অলকা, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, কৃষক, Hindusthan Standard, দৈনিক মাতৃভূমি, সচিত্র ভারত, Dipali, Advance, Amrita Bazar, বাতায়ন, কর্পোরেশনের কথা প্রভৃতি সব উল্লেখযোগ্য কাগজে বার হয়। কোনো কোনো কাগজে বিশেষ প্রবন্ধ বা সম্পাদকীয় মন্তব্য আত্মপ্রকাশ করে। নিচে তার কিছু নমুনা উদ্ধৃত করছি—

> কল্লোল সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশের মৃত্যু সংবাদে আমরা আত্মীয়-বিয়োগ বেদনা অনুভব করিতেছি। দীনেশরঞ্জনের সমস্ত জীবন সাহিত্য ও কলালক্ষীর সেবায় উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। তাঁহার সম্পাদিত কল্লোল পত্র একদা বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার রচনা বাংলা সাহিত্যে সমাদৃত হইয়াছে। সর্বশেষে সাহিত্যক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যখন তিনি চিত্রাভিনয় ও চিত্রপরিচালনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তখন সে ক্ষেত্রেও তিনি

যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন। চিত্রাঙ্কনেও তাঁহার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। সমস্ত জীবন তিনি তাহারই সাধনা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সন্তপ্ত আত্মীয় স্বজনের শোকে গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

—সম্পাদকীয়, আনন্দবাজার (৫-৫-৪১)

অধুনালুপ্ত কল্লোল নামক মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ মহাশয়ের মৃত্যুতে আধুনিক লেখক সমাজ ও সাহিত্যোৎসাহী মাত্রই মর্মাহত হইবেন। আঠারো বৎসর পুর্বে কয়েকজন অজ্ঞাতনামা লেখকের সাহায্যে কল্লোল প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্রমে উক্ত মাসিক পত্রের মারফৎ নবলেখক সম্প্রদায়ের নূতন সুরের রচনা প্রকাশ করিয়া তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে তিনি যে আন্দোলন তুলিয়াছিলেন তাহা পাঠক সাধারণ মাত্রই স্মরণ করিবেন। সেদিনকার তরুণ লেখকদল—যাঁহারা আজ লব্ধপ্রতিষ্ঠ আধুনিক সাহিত্যিক তাঁহাদের প্রতি স্নেহে, বন্ধুতায়, সেবায় দীনেশরঞ্জন যে আন্তরিক হৃদয়বত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অসামান্য। দীনেশরঞ্জন নিজে ভূঁই-চাঁপা, দীপক প্রভৃতি গল্প-পুস্তক রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

—সম্পাদকীয়, যুগান্তর।

শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ যেসব লেখক আধুনিক সাহিত্যকে নূতনতর প্রকাশভঙ্গি ও চিন্তা দ্বারা সমৃদ্ধ করে তুলেছেন, দীনেশবাবু তাঁর সম্পাদিত অধুনালুপ্ত মাসিক পত্রিকা 'কল্লোল'-এ এঁদের বহু সমাদরে স্থান দিয়ে পাঠক সমাজের সহিত এঁদের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। দীনেশবাবুর একান্ত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় বাংলা সাহিত্যের এই নবযুগের স্রষ্টারা তাঁদের দীপ্তিকে অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রখরতর করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। দীনেশবাবু শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না—তিনি সাহিত্যিকদের বন্ধুও ছিলেন।

—সম্পাদকীয়, কৃষক।

স্বর্গত দীনেশরঞ্জন.দাশ যখন অধুনালুপ্ত কল্লোল নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তিনি তাঁর কাগজটিতে লিখবার নূতন ধারা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। এমন কোন কোন নূতন লেখককে তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন যাঁরা এখন খ্যাতনামা হয়েছেন। কল্লোল সম্বন্ধে একথা খুব কম লোকই জানেন যে, প্রসিদ্ধ ফরাসী মনীষী র‍্যোঁম্যা রলাঁর ভগ্নী শ্রীমতী মাদলীন রলাঁ কল্লোল পড়তেন। দীনেশবাবু মিষ্ট প্রকৃতির

বন্ধুবৎসল লোক ছিলেন। কল্লোল বন্ধ হয়ে যাবার পর তিনি একটি সিনেমার পরিচালক হয়েছিলেন এবং এই কাজে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

—বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী (শ্রাবণ, ১৩৪৮)

Mr.Das started his career as a journalist and a literateur and was the founder and associate editor of the now defunctperiodical 'Kallol'. which had made a distinct mark on modern Bengali literature. He toak up the motion picture career under the banner of 'British Dominion Films' in the year 1930 and was responsible for the direction of their initial silent venture, 'Flames of Flesh', in which he also interpreted a prominent role.This picture played a very important part in the growth and development of the future film industry of Bengal. He joined New Theatres Ltd. in the year 1936 as a director, his first work there being the picturization of 'Bijoya', adapted from Sarat Chandra's immortal fiction, 'Datta'. Subsequently he directed a number of Tamil pictures and some Bengali two-reelers there. His last directorial works were 'Alo-Chhaya' in Bengali and 'Andhi' in Hindi. He also displayed much acting ability while working as a director, and made some successful appearnces in a number of a New Theatres productions. His last piece of successful acting so far is conveyed in the current N. T. release 'Parichaya'. He is to be seen for the last time in Hem Chandra's next N. T. picture 'Pratisruti' now under production.

—Amrita Bazar

Mr. Das was a connoisseur of art and was a writer of repute. He was the founder-editor of the 'Kallol', the well known Bengali monthly magazine, now defunct. He was the founder of the 'Four Arts Club', a pioneer literary association. 'Matir Nesha', a Bengali novel was published

by him many years ago. 'Rater Basa' and 'Dipak' appeared in the 'Kallol'. A drama 'Utanka' written for boys received wide appreciation and was successfully staged by boys in various parts of the province.

He was a cartoonist of no mean order and the cartoons drawn by him were published in many newspapers and magazines and were highly appreciated by the public. He was a pioneer in this field as well.

Mr. Das was a well-known figure in the Indian cinema industry. He began his career as a director of the British Dominion Film Corporation. He first appeared as an artiste in the 'Flames of Flesh'. At the time of death he was on the staff of the New Theatres Ltd, as a director. Amongst pictures directed by him for the New Theatres, mention might be made of 'Bijoya', 'Alo-Chaya', 'Abaseshe'...... He also directed some Tamil pictures. He appeared in a leading role in 'Parichay' now showing at Chitra.

—Hindusthan Standard

The bigger public however came to know of Dinesh Ranjan when he started his much-praised and much-maligned monthly magazine, 'Kallol', which laid the real foundation of a modern movement in Bengal's fictional literature. Many of today's reputed fiction-writers started their literary career in 'Kallol', which was also edited by Dinesh Ranjan. Besides his literary activities Das soon came to be well-known as a clever cartoonist and his political drawings created at one time quite a flutter in interested quarters.

But his leanings for the dramatic arts drove him to join the British Dominion Film Co. in 1929, and its first picture 'Flames of Flesh' was directed by D. R. Das, who also played its male lead. It may be noted in this connection

that this film first introduced to the public two names. who are celebrities today in their own right. They are Debaki Kumar Bose, who played a romantic role in the picture in addition to authoring its story, and Sabita Devi, who appeared as the heroine's companion.

—Dipali

স্বজনপ্রিয়, বন্ধুবৎসল ও সাহিত্যসেবী দীনেশরঞ্জন রোগশয্যায় মৃত্যুকে ভয় করেন নি।[২২] তাই মৃত্যুও তাঁর স্মৃতিকে ম্লান করে দিতে পারেনি। তিনি আত্মীয়পরিজন, বন্ধুমণ্ডলী ও গুণগ্রাহীদের স্মৃতিচারণায় আজও আমাদের মধ্যে বেঁচে আছেন, তাঁর ঐকান্তিক সাহিত্য-ব্রত উদ্‌যাপন তাঁকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক অধ্যায়ে অমর করে রেখেছে। পরবর্তীকালে তাঁর প্রতি প্রদত্ত স্মৃতি-তর্পণের কিছু উদাহরণ তাই সঞ্চয় করে রাখছি :

'বাহিরে সৌন্দর্য বিধাতা তোমাকে যথেষ্ট দিয়াছিলেন, অন্তরের সৌন্দর্যেও তুমি পরিপূর্ণ ছিলে। তরুণ বয়স হইতেই তুমি বাণীর সাধনা করিয়া আসিয়াছ। তখন তুমি ছিলে তরুণ লেখক, আর আমরা তোমার মুগ্ধ শ্রোতা। শৈশবে তোমার কত নাটক অভিনয় করিয়াছি, তোমার লেখা কবিতা এখনও আমার কণ্ঠস্থ আছে। ...১৮ বৎসর পূর্বে কয়েকজন তরুণ লেখকের সাহায্যে কল্লোল নামক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করিয়া, বাংলার সাহিত্যে যে নূতন সুরের রচনা করিয়াছিলে, তাহার রেশ এখনও আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইতেছে। সৃষ্টিতে যেমন আনন্দ আছে, ব্যথাও আছে তাহার চেয়ে অনেক বেশী। অনেক বিরুদ্ধতার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া, অনেক শক্তি ক্ষয় করিয়া, তুমি বন্ধু গোকুলচন্দ্রের সাহায্যে কল্লোলকে দাঁড় করাইয়াছিলে। এই সময় হইতে তোমাদের দুই বন্ধুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। আজ তোমরা দুজনেই পরলোকে, কল্লোলও অধুনালুপ্ত, কিন্তু সেদিনের সেই তরুণ লেখকগণ আজ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, এ কি তোমার কম গৌরবের কথা! তাঁহাদের প্রতি স্নেহে বন্ধুতায় সেবায় যে প্রাণের পরিচয় দিয়াছিলে তাহা অসামান্য। তাঁহারা অনেকেই তোমার মুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। সাহিত্যিক বন্ধুগণ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত আজ তাঁহাদের পত্রিকাগুলিতে তোমার ছবি, তোমার জীবনী নিপুণ তুলিতে আঁকিয়া দশের কাছে, দেশের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছেন।... ব্যঙ্গ চিত্রাঙ্কনেও তুমি দক্ষ শিল্পী ছিলে : সে যুগে কত পত্রিকায়

তোমার এই চিত্রগুলি সমাদর লাভ করিয়াছে। তোমার কর্মজীবন সকলেরই সুপরিচিত।'২৩

—নিরুপমা দেবী।

'দীনেশরঞ্জনকে সংক্ষেপে আমরা D. R. বলতাম। সত্যি সত্যি তিনি dear ছিলেন। শুধু শোভনদর্শন ছিলেন না, ছিলেন শোভনহৃদয়। শুধু সুজন ছিলেন না, ছিলেন স্বজন, আপনার লোক।

গোকুল আর দীনেশ—এই দুই বন্ধুর সাধনা বর্তমান বাংলাসাহিত্যের প্রেরক ছিল একথা কিছুতেই ভোলবার নয়।···কালক্রমে অনেক লেখক ম্লান হয়ে পড়লেও তাঁরা কখনো ম্লান হবেন না। আর কারু কথা বলতে পারি না, কিন্তু আমি নিজে যেটুকু লিখতে পেরেছি তার পিছনে গোকুল আর দীনেশের প্রযত্ন ছিল। এত বড় অতিমানুষ যেন না হই যে এটুকু কৃতজ্ঞতা জানাতে কুণ্ঠিত হব।

কিন্তু সাহিত্যের চেয়েও দীনেশের হৃদয় ছিল অনেক বড়, অনেক বড় ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। কী আকর্ষণে আমরা এতগুলি প্রাণী ছোট একটা কুঠরীতে এসে দিনের পর দিন সমবেত হতাম ভাবতে এখনো আশ্চর্য লাগে। দীনেশের ঘর ছিল ছোট, কিন্তু হৃদয়ে স্থানাভাব ছিল না। সেদিন যে আমরা সমবেত হতাম নিশ্চয় শুধু তা রুটি-তরকারির লোভে নয়, সমবেত হতাম এমন একটি ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে যা সাহিত্যিক হয়েও স্বার্থপর নয়, যা পর-প্রশংসায় ক্লিষ্ট না হয়ে বরং গৌরবান্বিত বোধ করে, যা দুঃখে দৈন্যে আঘাতে অপমানে কখনো আদর্শভ্রষ্ট হয় না। স্বর্গের স্বপ্ন যে না দেখেছে সে আর্টিস্ট নয়—এই স্বপ্ন সেদিন দেখেছিলেন দীনেশ—দেখিয়েছিলেন আমাদেরকে।···

আজ মন থাকলেও দল থাকলেও সেই দলপতি পাব না, যে সকলের অগ্রণী হয়েও সকলের পিছনে। যার তত বিনয় তত স্নেহ তত স্বার্থবোধ-শূন্যতা।···কল্লোলকে তিনি ব্যবসার চোখে দেখেননি, দেখেননি লোভীর চোখে; তিনি দেখেছেন তা স্রষ্টার চোখে, পূজারীর চোখে, নিজের চিত্তের আনন্দের প্রতীকের মত। তাই সেদিনের সোনায় কোন খাদ মেশেনি, সেদিনের সাধনায় ছিল না এতটুকু মেকি।···দীনেশ কখনো বিচলিত হননি তাঁর পথ থেকে, তাঁর তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান থেকে, তলোয়ারকে তিনি কখনো তাই ক্ষুরে নামিয়ে নিয়ে আসেননি। তিনি যে কত বড় প্রাণবান ছিলেন, কত বড় আত্মপ্রত্যয়ী যোদ্ধা তা সেদিনকার কল্লোলের প্রতি পৃষ্ঠায় লেখা আছে।

কিন্তু সাহিত্যিক দীনেশের চেয়ে মানুষ দীনেশই দীনেশরঞ্জনের বড় প্রকাশ। আমরা জীবনের নানা অবস্থায় নানারকম বন্ধু পাই······কিন্তু দলের গতি পেরিয়ে অন্তরের এমন অঙ্গ হয়ে ওঠা বন্ধু দীনেশের মত কম পাওয়া যায় সংসারে। সাহিত্যিক অনেক দেখেছি কিন্তু এত বড় বন্ধুবৎসল দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সবচেয়ে যেটা দেখে মুগ্ধ হয়েছি তাঁর চরিত্রে যেটা তাঁর সহজ অন্তর্দৃষ্টিতে, কার কোথায় কী ঠেকছে বা লাগছে সেটা একচক্ষে বুঝে নেয়ায়। নিজের অভাব সত্ত্বেও তা গোপন করে কত অভাবগ্রস্তকে যে তিনি সাহায্য করেছেন তা বলা যায় না। বন্ধুর দুঃখ বা বৈফল্য নিজের দুঃখ বা বৈফল্য বলে দেখেছেন। প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে, তার ভার লাঘব করতে।

আমার জীবনের যে কটি বছর দীনেশরঞ্জনের সাহচর্য ও কল্লোলের পরিচর্যায় কেটেছে তা আমি আমার জীবনের একটি গৌরবময় অধ্যায় বলে মনে করি এবং যদি এখনো সাহিত্যরচনা থেকে বিরত না হয়ে থাকি তার পেছনে দীনেশরঞ্জনেরই স্নেহ ও প্রেরণা দীপ্যমান আছে।

—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত[২৪]

অল্প বয়স থেকে দীনেশরঞ্জন সাহিত্য-সাধনা করেছেন। তিনি সেকালের নানা পত্র-পত্রিকায় লিখতেন। তিনি ছিলেন কল্লোলের প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক[২৫] ছোট গল্পকার, ঔপন্যাসিক, কবি ও প্রবন্ধ-লেখক। কল্লোলের পরিচালনা ও সম্পাদনা করে, তার প্রতিসংখ্যায় কিছু-না-কিছু লেখার খোরাক জুগিয়ে তাঁর হাতে সময় থাকবার কথা নয়। তবু দেখতে পাই, কল্লোলের তৃতীয় বর্ষে তিনি বিজলীর ষষ্ঠ বর্ষের সম্পাদনাভার গ্রহণ করেছেন। ১৩৩২-এর ফাল্গুন সংখ্যা কল্লোলের 'ডাকঘর' বিভাগে দীনেশরঞ্জন লিখছেন—'কল্লোলের এই কাজের সঙ্গে সুপরিচিত সাপ্তাহিক পত্রিকা বিজলীর সম্পাদনাকার্যও আমি নিয়েছি। বিজলী ও কল্লোল দুইটি ভিন্ন পত্রিকা। একটির সঙ্গে অন্যটির কোনও সম্বন্ধ নাই। বিজলী পরিচালনা করে, কল্লোলের পরিচর্যা করা আমার পক্ষে আরও সুবিধা হবে, এও বিজলীর সম্পাদনাভার গ্রহণ করার একটি কারণ।···বিজলীর ষষ্ঠ বর্ষ আরম্ভ হোল, ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহে নূতন বৎসরের প্রথম সংখ্যা বের হবে স্থির হয়েছে।' এর আগে ১৩৩১-এর ভাদ্র সংখ্যা কল্লোলে তিনি বিজলী[২৬] সম্পর্কে লিখেছিলেন—'আশা করা যায় বাঙালী পাঠকবর্গ বাজে ছবির ও বাজারে লেখার সাপ্তাহিকগুলি হাট-বাজারের জন্য রাখিয়া এই উন্নত রুচির ও সুলিখিত পত্রিকাখানি পড়িবেন। নব-

পর্যায়ের বিজলীকে আমরা সাদরে সম্ভাষণ করিতেছি। ইহার প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনার মতই ইহা অবস্থার দুর্গমতার ভিতর দিয়া আপনার সামর্থ্যে পথনির্দেশ করিয়া চলুক।'

দীনেশরঞ্জনের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রচনার তালিকা

(১) **উতঙ্ক**—রূপক-নাট্য। প্রথম প্রকাশ : ১৯২১ (১৩২৭)। প্রকাশক : ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত, ৩৩।১এ, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০। 'পরিচয়ে' লেখক বলেছেন—'কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতা নীতি-বিদ্যালয়ের উৎসবের দিনে অভিনয়ের জন্য একখানা বই লিখিয়া দিতে অনুরুদ্ধ হই।...উতঙ্ক নীতি-বিদ্যালয়ে অভিনীত হইবার পর বিদ্যাসাগর স্কুলের ছেলেরা আরেকবার অভিনয় করেন। তাহার পর এতদিনে আজ বন্ধুর (গোকুলচন্দ্র?) আগ্রহ ও উৎসাহে 'উতঙ্ক' ছাপিয়া বাহির হইল। ......এ নাটকে মেয়েদের ভূমিকা গ্রহণ করিবার মত কোনও অংশ নাই। অনেক চিন্তা করিয়া এটুকু আমাকে বজায় রাখিতে হইয়াছে।'

(২) **মাটির নেশা**—গল্প-সংগ্রহ। প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৩২। প্রকাশক : বরদা এজেন্সী, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচসিকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫০। এই সংগ্রহে ছয়টি ছোটগল্প আছে—পার্বতী, কমল-মধু, রামগতি, গাঁয়ের মাটি, সরাইখানা, পাষাণপুরী। গ্রন্থটি পথিকবন্ধু শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগকে উৎসর্গ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—'এই ধরার মাটিকে ভালবাসিয়া, জীবনের সুখ-দুঃখের ভিতর প্রসন্নচিত্তে এই মাটির ভুবনকে স্বীকার করিয়া যাহারা মৃত্যুর পূর্বে শত মরণকে জয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের নামে এই মাটির নেশা তোমাকে অর্পণ করিলাম।'

(৩) **ভুঁই চাঁপা**—গল্প-সংগ্রহ। প্রথম প্রকাশ : ১৯২৫ (শ্রাবণ, ১৩৩২) প্রকাশক : শ্রীশিশিরকুমার নিয়োগী এম-এ, বি-এল, বরদা এজেন্সী. কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচসিকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৬। এই সংগ্রহে সাতটি গল্প আছে—চম্পা, বকুল, মুক্তা-ভস্ম, তারপর, রূপ, বেনামী-জিনিস, বালুবেলা। উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছেন—'বাসিফুল, মনে হয়, কঠিন মাটির বুক চিরে যে ভুঁই-চাঁপা ফুটে ওঠে, অমৃতলোক হতে এ যেন তাদেরই চোখের-চাওয়া; ভুঁই-চাঁপা তাই তোমার নামে অর্পণ করলাম। সংশয়ের শুষ্কতা হতে এই অমরত্ব, মানুষের জীবনে জন্ম-লাভ করুক।'

অপ্রকাশিত উপন্যাস

(১) **দীপক**—এটি কল্লোলের বৈশাখ সংখ্যা, ১৩৩৪ থেকে চৈত্র, ১৩৩৫ পর্যন্ত প্রকাশিত—কার্তিক, ১৩৩৪ সংখ্যা বাদে। প্রচলিত ধারণা, দীপক অসম্পূর্ণ উপন্যাস। কিন্তু তা ঠিক নয়। ১৩৩৫ সালের চৈত্র-কিস্তির পর যথারীতি 'সমাপ্তি' কথাটি আছে।

(২) **রাতের বাসা**—এটি কল্লোলের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৩৬ থেকে পৌষ, ১৩৩৬ পর্যন্ত প্রকাশিত; মাঝে আশ্বিনের কিস্তি বাদ গেছে। ঐ পৌষেই কল্লোল অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়নি, পৌষ কিস্তির শেষে 'ক্রমশ' কথাটি আছে। সুতরাং রাতের বাসা স্পষ্টতঃই অসম্পূর্ণ রচনা।

কল্লোল ছাড়া অন্যান্য সাময়িক পত্রে প্রকাশিত দীনেশরঞ্জনের রচনা

(১) রামগতি—ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩৩০।

(২) পার্বতী—ভারতী, ফাল্গুন, ১৩৩০।

(৩) সংস্কার[২৭]—চিত্রপল্লী, পৃ ৪৬১-৬৫।

(৪) নগরকীর্তন[২৮]—নাগরিক, পৃ ৩৯-৪৩।

১. 'এই আশা কুটিরে (কৈলাসচন্দ্রের বাসগৃহ) একটি উপাসনাগৃহ ছিল এবং প্রতিদিন তথায় পিতামাতা বন্ধুবান্ধব লইয়া ভগবানের চরণতলে বসিতেন। নিজের সন্তান ছাড়া তাঁহারা বহু সন্তানকে ধর্মসন্তান বলিয়া মানুষ করিয়াছিলেন।' —সেজদার জীবনী, নিরুপমা দেবী। এই হস্তলিখিত জীবনীটি আমাদের সংগ্রহে আছে। ২৫শে মে, ১৯৪১ দীনেশরঞ্জনের শ্রাদ্ধবাসরে এটি পঠিত হয়েছিলো, এটি মুদ্রিত হয় নব-বিধান ব্রাহ্ম সমাজের মুখ-পত্র 'ধর্মতত্ত্বের' ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ সংখ্যায়।

২. 'আমাদের পিতৃদেব অতি শৈশবেই আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যান। জননী ইচ্ছাময়ী দেবী অতি ধার্মিকা ও মহিমময়ী রমণী ছিলেন। এত বড় বিপদেও তিনি ধৈর্য হারান নাই, ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখিয়া এতগুলি সন্তানকে পালন করিয়াছেন। তিনি সকল প্রকার সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ছিলেন, কখনও কোন ভাল কাজে আমাদের বাধা দেন নাই।' তদেব, পৃঃ ৩।

৩. ১৬ বছর বয়সে দীনেশরঞ্জন চট্টগ্রাম কালীবাড়িতে কলেরা রোগীর সেবা করতে যান। অনেকে মারা গেলেও একজনকে তিনি বাঁচাতে পেরেছিলেম। তাতে ইচ্ছাময়ী অসাধারণ তৃপ্তি পেয়েছিলেন। দীনেশরঞ্জন খুবই মাতৃভক্ত ছিলেন। কেশবচন্দ্রের বাড়িতে 'নব-বৃন্দাবন' নাটকের অভিনয়ের দিন অসুস্থ জননীর কাছে থাকতে তিনি চেয়েছিলেন। কিন্তু মাতৃ আদেশে তিনি কর্তব্যকর্ম স্থিরভাবে করে এসেছিলেন।'—পূর্বোক্ত রচনায় প্রাপ্ত তথ্য।

৪. তাঁর কন্যা মণিকা সেনের সংগৃহীত বেশ কিছু সংখ্যা অবশ্য বর্তমান আলোচনায় ব্যবহৃত কল্লোলের সেটের মধ্যে আছে। কল্লোল যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন মনোরঞ্জন থাকতেন ঢাকায়।

৫. এ সম্পর্কে 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে। নিরুপমা দেবী আমাদের জানিয়েছেন, 'না-খেতে পাওয়া একদল ছোকরা সাহিত্যিক কল্লোলকে ঘিরে থাকতো। সকলেই প্রায় ছাত্র। কারও এক পয়সা উপার্জন নেই। অনেকেই অভুক্ত আসতেন। মেজো বৌদি তাদের রোজ রুটি-তরকারী পাঠিয়ে দিতেন।' পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও ভূপতি চৌধুরীর কাছেও এ-ধরণের কথা শুনেছি।

৬. সেই সব ঘরোয়া জন্মোৎসবে কল্লোল-গোষ্ঠীর বন্ধুরাও সাধারণত নিমন্ত্রিত হতেন। অবশ্য তখন কল্লোল ছিলো না।

৭. 'রোগশয্যায় অল্প কয়েকদিনের জন্য বিদেশে কর্মরত তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কাছে পাইয়া আমাদের বলিয়াছিলে, আমি জানি, আমার অসুখের খবর পাইলে, ভাই আমার না আসিয়া থাকিতে পারিবে না। কোন বাধাই সে মানিবে না। দেখিলে আমার কেমন ভাই?' —সেজদার জীবনী (হস্তলিখিত) নিরুপমা দেবী, পৃঃ ১২।

৮. ঠিকানা—১১।১ এসপ্লানেড ইস্ট, কলিকাতা।

৯. কারো কারো মতে, সেই ওষুধের দোকানের তিনি অংশীদারও ছিলেন।

১০. দীনেশরঞ্জন ক্লাইড ফ্যান কোম্পানীতে কিছুদিন কাজ করেছিলেন, একথা আমাদের জানিয়েছেন ভূপতি চৌধুরী। বোধহয় এস রায় এণ্ড কোং-তে কাজ করার আগে।

১১. পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, ভূপতি চৌধুরী ও সতীপ্রসাদ সেনের কাছ থেকে জানা গেছে।

১২. কল্লোলের ঐ সংখ্যার বিজ্ঞা ন দ্রষ্টব্য।

১৩. কল্লোলের বৈশাখ, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যার বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

১৪. কল্লোল পাবলিশিং হাউসও ১০।২ পটুয়াটোলা লেনেই স্থানান্তরিত হয়েছে।—ডাকঘর, কল্লোল, ফাল্গুন সংখ্যা, ১৩৩২।

১৫ 'কল্লোল-যুগ' (৪র্থ সং), পৃঃ ৪৬ ও ৪৭।

১৬. কল্লোল ভাদ্র, ১৩৩১ বিজ্ঞাপনবিভাগ দ্রষ্টব্য। প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩১-৩৩ সালে বিজ্ঞাপন আছে।

১৭. বিজলীর সম্পাদন-ভার গ্রহণও এই স্থানান্তরের অন্যতম কারণ (বিজলীর অফিস ছিলো ১৪।এ শরৎ ঘোষ স্ট্রীট, ইণ্টালী) দুটি কার্যালয় কাছাকাছি থাকলে কাজের সুবিধা হবে মনে করে কল্লোল পত্রিকা ও পাবলিশিং-এর কার্যালয় পটুয়াটোলা লেনে সরিয়ে আনা হয়।

১৮. সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে (৪র্থ খণ্ড, ১৯৫৮) লিখেছেন—'কল্লোল পত্রিকার মাহাত্ম্যের এক ভাগীদার আছেন। তিনি ডি. এম. লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গোপালদাস মজুমদার। কাজী নজরুল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় অধিকাংশ 'কল্লোল-গোষ্ঠীর' রচনা পুস্তকাকারে ইনিই প্রথম ছাপাইয়া ছিলেন। তাহা না হইলে ইহাদের মধ্যে অনেককেই সাহিত্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতে হইত।' আমার মনে হয় এ প্রসঙ্গে বরদা এজেন্সী, আর. এইচ. শ্রীমানী এণ্ড সন্স, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানও স্মরণীয়।

১৯. প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিলো ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের কল্লোল পত্রিকার আষাঢ়, শ্রাবণ অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায়।

২০. ফোটোগ্রাফিং-এ বিশেষজ্ঞ ধীরেন্দ্রনাথের অধীনে কাজ করার জন্য এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের সুযোগ তাঁর হয়েছিলো।

২১. কল্লোল, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬।

২২. মেজবোন তরুবালা, ছোটবোন নিরুপমা, ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূ প্রতিমা মাতৃহীনা ভ্রাতুষ্পুত্রী মণিকা রোগের অসহ্য যন্ত্রণার দিনে তাঁর অক্লান্ত সেবা করেছিলেন। তবু তাঁর কষ্টের তেমন উপশম হয়নি। সেই মৃত্যুযন্ত্রণার দিনেও দীনেশরঞ্জন কখনও বলেননি, 'ভগবান, আমাকে বাঁচাও।' তখন তিনি নিত্য স্মরণ করতেন পরলোকগতা জননীকে, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুজনকে, জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ কুমুদিনী দেবীকে, কেশবচন্দ্রের কন্যা 'বড়দিদি মহারাণী সুচারুদেবীকে।— সেজদার জীবনী, নিরুপমা দেবী।

২৩. তদেব পৃঃ ৮-৯।

২৪. দীনেশরঞ্জনের জন্মবাসরে প্রদত্ত লিখিত ভাষণ। লেখকের স্বহস্ত-লিখিত এই নোটটি মণিকা সেনের কাছ থেকে পাওয়া গেছে।

২৫. 'এই কল্লোল পত্রিকার-সম্পাদনা ভার আমার উপরে ন্যস্ত। আমার অক্ষমতা একে যতখানি ক্ষুণ্ণ করেছে তার জন্য আমি দায়ী। যা' পারিনি তা' নিশ্চয়ই আমার ক্ষমতার বাইরে, আর এই তিন বৎসর সমস্ত ব্যাঘাতকে অতিক্রম করে যে শক্তিবলে কল্লোলের পরিচর্যা করতে পেরেছি, তার জন্যও আজ প্রসন্নমনে সকলের কাছে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।' —দীনেশরঞ্জন দাশ, 'ডাকঘর', কল্লোল ফাল্গুন, ১৩৩২।

২৬. সম্পাদক—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সহ সম্পাদক—সুবোধ রায়।

২৭. পারিবারিক সূত্র থেকে যে কাটিং পেয়েছি, তাতে সাল তারিখ নেই। পত্রিকাগুলি লাইব্রেরীতে দুষ্প্রাপ্য।

পরিশিষ্ট—২

কল্লোলের প্রাণ-পুরুষ ঃ গোকুলচন্দ্র নাগ

একত্রিশ বৎসর বয়সে গোকুলচন্দ্র নাগের অকালমৃত্যু বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এক অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি ছিলেন কল্লোল-যুগের অন্যতম অধিনায়ক, নতুন সাহিত্যমন্ত্রের উদ্‌গাতা ও আধুনিক উপন্যাসের দিশারী। তাঁর বিদ্রোহ সাহিত্যের রণাঙ্গণে—কল্লোলের কলহংসদের নিয়ে তিনি আমৃত্যু লড়েছেন—সমাজের ও চিন্তার স্থবিরতার বিরুদ্ধে, পথিক মানুষের আধুনিকতম রূপের সপক্ষে।[১] নতুন ও স্বাধীন মানুষকে স্বভাবের পাদপ্রদীপের তলায় তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন—সত্যভাষণের ব্রহ্মাস্ত্র-পরা তাঁর যুদ্ধ-সাজ নিয়তির বিধানে স্বল্পকালীন হলেও রক্তবীজের মতোই অনুগামীদের মধ্যে রেখে গিয়েছিলেন নিরবচ্ছিন্ন প্রাণ-প্রবাহ। তাই পুরনোদের থেকে সরে-আসা সেই মানুষটি অনাগতদের জন্য যে আকাশ-প্রদীপ জ্বালিয়ে গেছেন ইতিহাসের নিহিতার্থে তা আজও সজীব শক্তি।

গোকুলচন্দ্রের জন্ম ২৮শে জুন, ১৮৯৪ (১৩০১) সালে। তাঁর পিতার নাম ছিলো মতিলাল নাগ এবং মাতার নাম কমলা নাগ। নাগদের পৈতৃক নিবাস অক্রূর দত্ত লেন, কলিকাতা। গোকুলচন্দ্রেরা তিন ভাই ও দুই বোন—বিভাবতী (মিত্র), কালিদাস, গোকুলচন্দ্র, প্রভাবতী (মিত্র) ও রামচন্দ্র।

অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন ডঃ কালিদাস নাগ, গোকুলচন্দ্র ও অন্যান্য ভাই-বোনেরা মামা বিজয় বসুর[২] কাছে মানুষ হন। নাগ ও বসু উভয় পরিবারই গোঁড়া ব্রাহ্ম ছিলেন। মাতুলগৃহে গোকুলচন্দ্রেরা একটা ব্রাহ্মসমাজসুলভ-নৈতিক পরিবেশ, কড়া শাসন ও পরনির্ভরতার মধ্য দিয়ে লালিত-পালিত হন। তবে ছোটবেলা থেকে ভাইবোনদের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক বিরাজমান ছিলো। প্রত্যক্ষদর্শী দীনেশরঞ্জন লিখেছেন—'পিতৃমাতৃহীন এই ভায়ে ভায়ে 'জীবনের সুখ-দুঃখের ভিতর এক অপূর্ব বন্ধুত্বের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। গোকুল তাহার দাদা কালিদাসবাবুকে যেমন শ্রদ্ধা করিত তেমনি গভীর ভালবাসায় তাঁহাকে নীরবে পূজা করিত। বিলাত বাসকালে তাহার দাদার জন্য তাহাকে কতবার বিশেষ চিন্তাকুল দেখিয়াছি। গোকুলের বড় ভগ্নী বিধবা।

গোকুল তাহার দিদি ও তাঁহার সন্তানদের সাধ্যমত সেবা করিত। গোকুলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ রামচন্দ্র মাদ্রাজে চাকরী করে।......গোকুলের ছোট বোন গোকুলের বড় আদরের ছিল। এই বয়সেও দেখিয়াছি দুই ভাই-বোনে ঠিক ছোটবেলার মত ছোট-খাট ঝগড়া করিয়াছে। তাহার বড় দিদি বলিতেন,—তোরা কি বড় হবি না! দুই ভাই-বোনে তখন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসিত।'[৩]

গোকুলচন্দ্র সাউথ সাবার্বন স্কুলের ছাত্র ছিলেন। স্কুলের ছাত্র অবস্থাতেই তাঁর বাবা-মা মারা যান। সেখানে কল্লোলের সতীপ্রসাদ সেন (গোরাবাবু) তাঁর সহাধ্যায়ী ছিলেন। থার্ড ক্লাসে তিনি প্রমোশন পাননি। তার কারণ, তিনি লেখাপড়ায় ভালো ছিলেন না এবং তাঁর শরীর দুর্বল ও অসুস্থ ছিলো। সেই সময় গোকুল প্রমোশন না পেয়ে হেডমাস্টার মশায়ের বকুনি খেয়ে স্কুলের পড়া ছেড়ে দেন।[৪] এরপর ঘাটশীলার গিধ্‌নিতে কিছুদিন পড়াশুনা করেন। তাঁর সাধারণ শিক্ষা ঐ পর্যন্ত।

স্কুল জীবনেই গোকুলচন্দ্র ছবি আঁকতেন। কিছুদিন পরে তিনি সরকারী আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। সেকালে ঐ স্কুলের পরিবেশকে 'বখাটে ছেলের আড্ডা' বলে মনে করা হতো। ওখানেই যামিনী রায়, অতুল বসু ও ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে গোকুলচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা। ওঁরা চারজন সতীর্থ ছিলেন। ওঁর মামা বিজয় বসু এই আর্ট স্কুলে পড়াশুনা সম্পর্কে তেমন আশান্বিত ছিলেন না। পছন্দও করতেন না। শেষ পর্যন্ত গোকুলচন্দ্র ওখানে ফাইনাল পরীক্ষা পাশ করেন এবং কিছু কিছু ছবি এঁকে দিন চালাতে শুরু করেন। আর্ট স্কুলে তিনি তিন বছর অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মিঃ পার্সি ব্রাউন ও যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং সকলের প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হন; কারণ সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় অপেক্ষা চিত্রকলায় তাঁর অনুরাগ বাল্যকাল থেকে অধিকতর ছিলো।[৫]

আর্ট স্কুলের পড়া শেষ করে গোকুলচন্দ্র কিছুদিন (১৯১৮—১৯) ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ওয়েষ্টার্ণ সার্কেলে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে কাজ করেন। তখন তিনি ভারতবর্ষের বহুস্থান ও অবজ্ঞাত অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন।[৬] কিন্তু শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ায় সে চাকুরী তিনি ছেড়ে দেন।

এর পরে আমরা গোকুলচন্দ্রকে দেখতে পাই, নিউ মার্কেটে তাঁর মামা বিজয় বসুর প্রতিষ্ঠিত ফুলের দোকান 'এস, বোস'-এর অন্যতম পরিচালকরূপে। বিজয়বাবুর ভাই ছিলেন সুরেন বসু। তিনি কাজকর্ম কিছু করতেন না।

প্রধানতঃ ঐ ভাইয়ের জন্যই বিজয়বাবু ফুলের দোকানটি করেছিলেন। ফুল আসতো ঘাটশিলার কাছে গিধ্‌নিতে তাঁর বড়ো বাগান থেকে। দোকানে সকালে বসতেন সুরেনবাবু, বিকেলে গোকুলচন্দ্র। এই ব্যবসাদারির তথাকথিত নোংরামির মধ্যে থেকেও গোকুল কখনও তাঁর শিল্পী-মনের মার্জিত ও কোমল অনুভূতি হারিয়ে ফেলেননি। দীনেশরঞ্জনের ভাষায়—'ফুল বেচা যাহার কাজ, ফুল বেচিয়া যাহাকে পয়সা উপার্জন করিতে হইবে, তাহার পণ্যদ্রব্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। সে ফুল ছুঁইত অত্যন্ত সংকোচে, ফুলকে ফুলের মত করিয়াই স্পর্শ করিত। দোকানের মালিরা শাকের আঁটির মত ফুলের গোছা লইয়া টানাটানি করিত, গোকুল তাহা দেখিয়া আচমকা শিহরিয়া উঠিত। দোকান উজাড় করিয়া অনেক সময় ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে ফুল দিয়া ফেলিত। তাহাদের মুখের হাসি দেখিয়া গোকুল কত আরাম পাইত। ...সস্তায় ফুল বিক্রি করিলে মালিরা অনেক সময় বলিয়াছে, বাবু আপনি দোকানে থাকিলে দোকান চলিবে না। গোকুল তাহাদের হাসিয়া উত্তর করিত, ফুল বেচে পয়সা নিস এই ঢের, ফুল কি মানুষ বেচতে পারে। এই ছোট কথাটিতেই তার পরিচয় পাওয়া যাইত'।[৭] কল্লোলের কালেও ফুলের দোকানটি ছিলো[৮] এবং অসুস্থ না হওয়া পর্যন্ত গোকুলচন্দ্র তা দেখাশুনো করতেন।

এই ফুলের দোকানেই, পূর্বে বলেছি, শিল্পী-সাহিত্যিকদের একটা আড্ডা গড়ে উঠেছিলো। এই আড্ডার প্রাণ-পুরুষও ছিলেন গোকুলচন্দ্র।

প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের চাকুরি ছেড়ে দেওয়ার পর কলিকাতায় ফিরে এসে তিনি কিছুদিন ছবি আঁকায় মন দেন। তেল রঙে পোর্ট্রেট আঁকাই তখন তাঁর পেশা ছিলো। সুদূর পূণা ও বোম্বে থেকেও তাঁর কাছে তৈলচিত্রের অর্ডার আসতো। অবশ্য তাঁর অনুরাগ বেশি ছিলো ল্যাণ্ডস্কেপ অঙ্কনে।[৯]

তারপর আসে ফোর আর্টস ক্লাব প্রতিষ্ঠায় গোকুলচন্দ্রের ভূমিকার কথা। তাঁর ফুলের দোকানেই প্রথমে ক্রেতারূপে, তারপর বন্ধুরূপে আসতে থাকেন দীনেশরঞ্জন। এবং সেই ফুলের দোকানেই শিল্পকলার চতুরঙ্গ সাধনার স্বপ্ন স্বল্পকালের জন্য হলেও দানা বেঁধে ওঠে। তাঁর উদ্যোগ ও অনুকূলতাতেই ক্লাবের প্রথম জমায়েতটি হয়েছিলো চিড়িয়াখানার প্রাঙ্গনে। ক্লাব পরিচালনায়, বিশেষ করে তার সাহিত্য ও শিল্পকলা বিভাগ পরিচালনায় তাঁর চিন্তা ও পরিকল্পনার আভাস পাই নিরুপমা দাশগুপ্তার কাছে তাঁর লেখা প্রথম প্রবন্ধে উদ্ধৃত চিঠিটির মধ্যে। গোকুলচন্দ্রের স্বপ্ন-বলাকা ডানা মেলেছিলো চতুষ্কলা সমিতির মুক্ত-

আকাশে।

সাহিত্য ও চিত্রকলার প্রতি গোকুলচন্দ্রের অনুরাগ আবাল্য। তিনি কবিতা লিখতেন, কিন্তু তাঁর ঝোঁক বেশি ছিলো ছোট রোমান্টিক গল্প বা কথিকা জাতীয় রচনার দিকে। 'তাতে অর্থের চাইতে ইঙ্গিত থাকতো বেশি, যার মানে, দাঁড়ি-কমার চেয়ে ফুটকিই অধিকতর।' ১৯১৯ সালে তাঁর এইরকম একটি লেখা সহপাঠী সতীপ্রসাদ সেন দিয়ে আসেন প্রবাসীর সহ-সম্পাদক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এবং সেটি ছাপা হয়। ঐ বছর তাঁর আরও কয়েকটি লেখা আত্মপ্রকাশ করে পত্রিকাটিতে—যেমন 'শিশির' (আষাঢ়, ১৩২৬), বাতায়ন (মাঘ, ১৩২৬), দুই সন্ধ্যা (চৈত্র, ১৩২৬)। তিনি সেকালে ভারতী, নব্যভারত, ভারতবর্ষ পত্রিকাতেও লিখতে শুরু করেন। গোকুলচন্দ্রের আমৃত্যু সেই লেখার রেওয়াজ অব্যাহত রেখেছিলেন, যদিও বেশি লেখেননি।

শুধু সাহিত্য নয়, চিত্রকলাও নয়—সঙ্গীত, বিশেষ করে যন্ত্রসঙ্গীতেও তাঁর আকর্ষণ ছিলো প্রখর। পারদর্শিতাও কম নয়। তিনি বেহালা বাজাতেন, গান গাইতে পারতেন। 'কণ্ঠস্বর খুব সুন্দর না হইলেও তাহার গানে এমন একটা গম্ভীর সুর ধ্বনিয়া উঠিত যে, তাহাতে শ্রোতার মনকে একান্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। গোকুল যখন-বেহালা বাজাইত তখন ও অত্যন্ত মনোযোগের সহিত বাজাইত। বাজাইতে বাজাইতে গায়কের মুখের দিকে মুগ্ধ চোখে চাহিয়া থাকিত।'[১০]

ফোর আর্টস ক্লাবের জীবৎকালে গোকুলচন্দ্র কিছুদিনের জন্য চিত্রাভিনয় ও নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। সে সময় অহীন্দ্র চৌধুরী, প্রফুল্ল ঘোষ কানাইলাল দাশ ইত্যাদির উদ্যোগে Photo Play Syndicate of India নামে এক বায়স্কোপ কোম্পানী গড়ে ওঠে। এই কোম্পানী একটিমাত্র নির্বাক-চিত্র নির্মাণ করে—'সোল অফ এ স্লেভ' বা 'বাঁদীর প্রাণ'। উদ্‌যোক্তাদের অনুরোধে লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের 'গ্র্যাণ্ড অপেরা হাউসের' মালিক ডুকাস সাহেবের ফিল্ম ব্যবসায়ের ম্যানেজার হেম মুখার্জী এর মুখ্য পরিচালক ও অহীন্দ্র চৌধুরী অন্যতম পরিচালক হন। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের তক্ষশীলার প্রণয়-কাহিনী নিয়ে ছবিটি তৈরি হয়। নায়ক ধর্মপালের ভূমিকায় অভিনয় করেন অহীন্দ্র চৌধুরী, তাঁর জনৈক সহচর 'রাহুসেনের' ভূমিকায় গোকুলচন্দ্র। এই সহচরের ছোট ভূমিকাটি ছিলো তাঁর স্বভাব-বিরোধী, তাই তিনি অভিনয় করতে প্রথমে দ্বিধা করেছিলেন। কিন্তু বন্ধুদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত রাজী হন এবং ছোট ভূমিকাতেও নিজের অভিনয় দক্ষতার প্রমাণ রাখতে সমর্থ হন।[১১] তাছাড়া, সিণ্ডিকেট ও ছবির ড্রাফট্‌সম্যান

আর্টিস্ট হিসাবে[১২] যে ঐকান্তিকতা ও পরিশ্রম তিনি করেছিলেন তার মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী।[১৩] এ ছাড়া চলচ্চিত্রে তিনি আর কাজ বা অভিনয় করেননি। তবে নাট্যাভিনয়ে তিনি কখনও কখনও অংশগ্রহণ করতেন তার প্রমাণ আছে নিরুপমা দাশগুপ্তার কাছে লিখিত এই চিঠিতে[১৪]

Zoo Garden
Alipore, Calcutta
16.5.22

নিরুদি,

আপনার চিঠি পেয়েছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দিচ্ছি এই জন্য যে—প্রত্যাশা করিনি। চিঠির উত্তর না দেওয়াটা আপনার কাছে যেমন স্বাভাবিক, আপনার কাছ থেকে চিঠি না পাওয়াটাও আমার কাছে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। এখন যদি এ থেকে একটু খুশী হয়ে উঠি তাহলে জানবেন সে খুশীটা অস্বাভাবিক।

কিছুদিন পূর্বে Mrs. Sarkar-এর ঠিকানায় আপনাকে একটা রূপরেখা পাঠিয়েছি। Mrs. Sarkar-দেরও। কিন্তু প্রায় দু সপ্তা হতে চল্ল জানতে পারিনি সেগুলো আপনারা পেয়েছেন কিনা।

আমার শরীরটার ওপর একজন ডাক্তারের ডাক্তারী চলছে ইচ্ছে আছে তাঁর ডাক্তারীতেই চলব। আর, তাঁর মত বড় ডাক্তার আছে বলে আমার মনে হয় না। আমার খুব বিশ্বাস আছে তিনি আমায় সারিয়ে তুলবেন। 4th June দীনেশের একটা one act dramaতে একজন 'স্থবির' নামছেন। তাঁকে দেখতে আসবেন? কিন্তু তাহলে আপনার স্বর্গ হতে পতন হবে। কাজ নেই—কি বলেন? ওখানে থেকেও আপনার এই ধূলোকাদামাখা জায়গাটা মনে আছে? বলেন কি! ভুলে যান—ভুলে যান।

একেই বলে—স্বর্গে গিয়েও ঢেঁকির নিস্তার নেই।

নমস্কার নিন—G.C.

এই চিঠিতে স্থবিরের ভূমিকায় যাঁর অভিনয় করার কথা আছে তিনি হচ্ছেন গোকুলচন্দ্র। অসুস্থ অবস্থা—তবু অভিনয় করতে দ্বিধা নেই।

কল্লোল সম্পাদনা ও পরিচালনায় গোকুলচন্দ্রের নিষ্ঠা ও পরিশ্রম সগৌরব ইতিহাসের বিষয়। নামে তিনি পত্রিকাটির সহ-সম্পাদক ছিলেন; কিন্তু সজনীকান্ত দাসের মতে তিনি ছিলেন 'আসল কর্ণধার'[১৫]। ওই দুর্মুখ ও বিরোধী মানুষটিও গোকুলচন্দ্রের প্রশংসা করেছেন। কল্লোল-গোষ্ঠীর এক

নায়কের মুখে শুনেছি[১৬] প্রত্যেকটি লেখা মনোযোগ দিয়া পড়া, কাটছাঁট যোগ-বিয়োগ করে প্রকাশের উপযোগী করে তোলা, ভালো লেখা অন্যকে দিয়ে পড়ানো, ডাক-যোগে পাওয়া প্রতিটি লেখার লেখক লেখিকাদের সঙ্গে পত্রালাপ করা, উপযুক্ত লোককে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া, প্রতি সংখ্যার রূপসজ্জা ও রচনাসূচী নির্ধারণ করা—ফুলের দোকানে চাকুরী ও অসুস্থতা সত্ত্বেও পত্রিকা-সম্পাদকের বিচিত্র দায়িত্ব পালনে তাঁর আগ্রহের অভাব কখনও দেখা যায়নি। তিনিও প্রয়োজনমত প্রুফ দেখেছেন, প্রেসে গেছেন, দপ্তরীর কাজও করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, নিজে লিখে এবং অন্যকে লেখায় উৎসাহ যুগিয়ে তিনি সৃষ্টির একটা নতুন আসর বানাবার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। অবশ্য, কল্লোলের প্রকাশের পর যে আড়াই বছর তিনি বেঁচে ছিলেন, তার বৃত্তসীমার মধ্যেই তাঁর সম্পাদকীয় কৃতিত্ব নিহিত। তাঁর মৃত্যুর পর দীনেশরঞ্জন গোষ্ঠীর আর কাউকে সহ-সম্পাদক নিযুক্ত করেননি, নিজেই দু'জনের দায়িত্ব বহন করেছেন। কিন্তু গোকুলচন্দ্রের জীবৎকালে কল্লোলের সম্পাদনার ব্যাপারে সহযোগী বন্ধুর উপর নির্ভর করে দীনেশরঞ্জন নিশ্চিন্ত ছিলেন।

কল্লোলের গোকুলচন্দ্রকে জানার ব্যাপারে তার বন্ধুদের স্মৃতিচারণা উল্লেখযোগ্য—

'কল্লোলে' বড় ভালবাসতে—
যত কিছু বুজরুকি অনাচার
দিত বুঝি বুকে তব ব্যথা ভার ;
তাই ব্যথী রেখে গেলে হুঙ্কার
'কল্লোল'-পাতে পাতে বেদনার।
ব্যথা ছিল তাই এত হাস্তে। —জগৎবন্ধু মিত্র।[১৭]

'ছোট্ট দোতলা বাড়ী। তার এক তলার বৈঠকখানায় কল্লোলের আপিস। ...গোকুলবাবু একটি ক্যাম্প চেয়ারে বসে শূন্য প্রেক্ষণে বসে আছেন। রাস্তার দিকে দরজা খোলা ; সেই দরজার সামনে আসতেই গোকুলবাবুর আহ্বান কানে এল। বিনা দ্বিধায় প্রবেশ করলাম।...কল্লোল আফিসে এসে ঠিক নিয়মিত সময়ে বসতেন। কাজ ছিল ডাকে আসা লেখাগুলো পড়া। সাহিত্য রুচিবোধ ছিল তাঁর প্রখর। ১৩৩০ সনে বৈশাখ মাসে প্রথম সংখ্যা কল্লোল বার হল তাঁর সাহিত্য ও রুচিবোধের আদর্শ নিয়ে। কাগজটির আকার ছোট, ছাপা সাজান পরিষ্কার। তখনকার প্রচলিত মাসিক পত্রিকাগুলি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। লেখক অধিকাংশই নতুন।...

লেখার জোরে কল্লোলের প্রতিষ্ঠা হবে এই ছিল এঁদের কামনা। গোকুলবাবুর বন্ধুদের ভিতর অনেকেই তাঁকে উৎসাহ দিতেন।'

—ভূপতি চৌধুরী।[১৮]

'গল্পসর্বস্ব সিকিমূল্যের মাসিকী হিসেবে জীবন আরম্ভ—ক'রে 'কল্লোল' যে ক্রমে নতুন লেখকদের মুখপাত্র হয়ে উঠলো তার পেছনে ছিলো গোকুল নাগের প্রেরণা, যিনি তাঁর হ্রস্ব জীবনের শেষ বছরগুলিতে 'কল্লোলের' অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। গোকুল নাগকে আমি কখনও দেখিনি, তবে তাঁর রচনা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম, আর নানা বিষয়ে তাঁর গুণপনার কথা বন্ধুদের মুখে শুনেছি। কল্লোলের গল্পসাহিত্যে বার বার বর্ণিত যক্ষ্মামুমূর্ষু তরুণ শিল্পী যে একান্তই অবাস্তব নয়, জীবনে সত্যই যে ও রকম ঘটে, যেন নেহাৎই ও কথা প্রমাণ করবার জন্যে গোকুল নাগের মৃত্যু। —বুদ্ধদেব বসু।[১৯]

'কল্লোল' তখনও বের হয় নি। নজরুল তখন মুজাফার আহম্মদের কাছে বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রীটের দোতলায়। পবিত্র আর আমি যাচ্ছি নজরুলের আড্ডায়। পথে গোকুল নাগের সঙ্গে দেখা। গোকুলের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। পবিত্র বললে, আর-একজনকে দেখাই চল্। গেলাম পটুয়াটোলায়। দেখলাম দীনেশ দাশকে। গোকুল আর দীনেশ। দুই শিল্পী-বন্ধু তখন কল্লোল বের করার স্বপ্ন দেখছে।

—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।[২০]

সে কল-কল্লোল

সে হাসি-হিল্লোল,নাই চিত্ত-উতরোল।
আজ সেই প্রাণ-ঠাসা এক মুঠো ঘরে
শূন্যের শূন্যতা বাজে, বুক নাহি ভরে।…
হে নবীন, অফুরন্ত তব প্রাণধারা
হয়ত এ মরুপথে হয়নিক হারা,
হয়ত আবার তুমি নব-পরিচয়ে
দেবে ধরা, হবে ধন্য তব দান লয়ে
কথা সরস্বতী।…
তুমি শিল্পী তুমি কবি দেখিয়াছে তারা
তারা পান করে নাই তব প্রাণ-ধারা।

'পথিকে' দেখেছে তারা দেখেনি 'গোকুলে',

ডুবেনিক—সুখী তারা—আজো তারা কূলে।

—নজরুল ইসলাম।[২১]

'তারিখটা আমার ডায়রিতে লেখা আছে—৮ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩১ সাল। সন্ধে বেলা সুবোধের সঙ্গে চললাম নিউ মার্কেটের দিকে। সেখানে কি? সেখানে গোকুল নাগের ফুলের দোকান আছে। সুবোধের হাত থেকে আমার খাতাটা সে ব্যগ্র উৎসাহে কেড়ে নিল। একটিও পৃষ্ঠা না উলটিয়ে কাগজে মুড়ে রেখে দিল সন্তর্পণে। যেন নীরব নিভৃতে অনেক যত্ন-সহকারে পড়তে হবে এমনি ভাব। হাটের মাঝে পড়বার জিনিস তারা নয়। অনেক সদ্‌ব্যবহার ও অনেক সদ্‌বিবেচনা পাবার তারা যোগ্য। লেখক নতুন হোক তবু সে মর্যাদার অধিকারি।...বুঝলাম কত বড় শিল্পী মন গোকুলের।

—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।[২২]

'...যাকে ভালো লাগল, তিনি অদ্ভুত কাজের লোক, নানান অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। আর্টস্কুলের পাশ করা শিল্পী, তার উপরে কৃতী ফটোগ্রাফার।...ভদ্রলোকের নাম গোকুল নাগ। রোগা রোগা নাতিদীর্ঘ চেহারা, মাথায় লম্বা রুক্ষ চুল। সেদিন অবশ্য প্যাণ্ট কোট পরেই এসেছিলেন, কিন্তু পরে যখন আসতেন ধুতি পাঞ্জাবিই পরতেন, আর চোখে থাকতো ফিতেওয়ালা পাশ্‌নে চশমা। মিষ্টভাষী, রুচিশীল ব্যক্তি; মুখে চোখে বুদ্ধিমত্তার ছাপও সুস্পষ্ট। তদানীন্তন কল্লোল পত্রিকার সঙ্গে গোকুলবাবুর নাম বিশেষভাবে বিজড়িত। কিন্তু যখনকার কথা বলছি, 'কল্লোল' তখনও বার হয় নি। তবে এঁর লেখক-জীবন শুরু হয়ে গেছে।'

—মহীন্দ্র চৌধুরী।[২৩]

কল্লোলের নতুন লেখক গোষ্ঠীর কাছে গোকুলচন্দ্র যে মূর্ত প্রেরণা ও সজীব উৎসাহস্থল ছিলেন, এই সব বিবৃতিতে তা স্পষ্ট। তাঁর স্বপ্ন ও সাধনা ছিলো: একটি নব্যলেখক সম্প্রদায় গড়বেন, যাঁদের হাতে থাকবে সতেজ কলম, বুকে অনবদ্য সাহস, চোখে যৌবনের উদ্দামতা; থাকবে নতুন ভাষায় নতুন কিছু বলবার কথা। বেঁচে থাকলে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সম্ভাবনা বাড়িয়ে ও সমৃদ্ধি ঘটিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু তার অকালমৃত্যু আমাদের সাহিত্যের ক্ষতি করে গেছে অনেক।

গোকুলচন্দ্র লেখক হিসেবে কল্লোলের পৃষ্ঠায় যা রেখে গেছেন তার মূল্যায়ন স্থানান্তরে করেছি। এইখানে শুধু এইটুকু বলে রাখি, পত্রিকাটিতে প্রথম প্রকাশিত তাঁর 'পথিক' উপন্যাস আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধ ইতিহাসের 'পথিকৃৎ' এর

সম্মান পেয়েছে।[২৪] কল্লোলকে তিনি ভালবাসতেন তার প্রমাণ তিনি মৃত্যুশয্যায় দিয়ে গেছেন। তিনি পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রতিশ্রুতি দীনেশরঞ্জনের কাছে চেয়েছিলেন।[২৫]

মানুষ গোকুলচন্দ্র ছিলেন যেন একটা প্রচণ্ড হেঁয়ালি। তাঁকে ঠিকমতো বুঝে ওঠা সহজসাধ্য ছিলো না। তাঁর জীবনের ছন্দটি ছিলো কতকটা গদ্যকবিতার মতো—নানা মাপের উপকরণে বিশৃঙ্খলা। আনুষ্ঠানিক লেখাপড়ায় তাঁর মন ছিলো না, কিন্তু দেশ বিদেশের সাহিত্যরসের জন্য ছিলো আকণ্ঠ পিপাসা। চিত্রবিদ্যা অর্জন করলেন, শীলমোহর-করা অনুষ্ঠান-পত্র পেলেন, কিন্তু একসময় ছবি আঁকা ছেড়ে দিলেন। কল্লোলের কালে বলতেন—'আমি আর ছবি আঁকব না, এবার থেকে লিখব। আমার মনে হচ্ছে, ভাষার ভেতর দিয়ে ছবি আঁকাই আমার ভাল হবে।[২৬] তাঁর চেহারায় অগ্রজ কালিদাসের মতো জৌলুস ছিলো না। তাঁর ছিলো বেহালা-বাজিয়ের মতো লম্বা চুল, চোখে সেকেলে চশমা, শরীর বেশ দুর্বল, স্বাস্থ্য বরাবর খারাপ। সব সময় মুখে থাকত সিগারেট, কথা বলতেন কম। দূর থেকে দেখলে কেমন যেন দাম্ভিক বলে মনে হতো। কিংবা নিরাসক্ত উদাসীন। সেই ঔদাসীন্য কতকটা নিস্তেজ শরীর আর স্বপ্নাভিলাষের দান। কিন্তু কাছে গেলে পাওয়া যেতো একটা উত্তপ্ত সান্নিধ্য, কণ্ঠস্বরে অন্তরঙ্গতা।[২৭] কিন্তু সেই পর্যাপ্ত হৃদয়বত্তার পাশেই থাকতো তাঁর অন্তরের নির্ভীকতা ও সাহসিক জীবন ভাবনা। বন্ধুজনেরা বলেছেন, সব মিলিয়ে গোকুলচন্দ্র ছিলেন একটি আশ্চর্য মানুষ।

১৯২৩ সাল থেকে তাঁর স্বাস্থ্য ভালো ছিলো না—মাঝে মাঝে অল্প জ্বর হতো। কিন্তু একটানা জ্বর শুরু হয় ১লা জানুয়ারী, ১৯২৫ থেকে। ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ও যক্ষ্মারোগ নিরাময়ের জন্য তাঁকে শেষ পর্যন্ত দার্জিলিং-এ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৫ সকালের দিকে তাঁর মৃত্যু ঘটে।[২৮] সে মৃত্যু শুধু একটি জীবনের নয়, এক উদ্দাম যৌবনের।

গোকুলচন্দ্রের জীবৎকালে ও মরণোত্তর কালে তাঁর লেখা নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে :

(১) **ঝড়ের দোলা**—গল্প চতুষ্টয় সংগ্রহ। প্রথম প্রকাশ ১৯২২। Published by Four Arts Club 88 B Hazra Road, Calcutta. মূল্য উল্লেখ নাই। চারটি গল্পের মধ্যে 'মাধুরী' গল্পের লেখক গোকুলচন্দ্র।

(২) **রাজকন্যা**—প্রথম প্রকাশ : ১৯২২। টেনিসনের 'দি প্রিন্সেস' কাব্য অবলম্বনে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত। বইটি আমি দেখিনি।

(৩) **রূপরেখা**—কথিকা জাতীয় রচনা। প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ, ১৩২৯ (১৯২২)। প্রকাশক এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, ৯০।২ এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৫। বন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। এই সংগ্রহে নয়টি রচনা আছে—মালিনী, শিশির, বাতায়ন, জলছবি, মা, আলো ও ছায়া, দুই সন্ধ্যা, পূজারিণী, অনন্ত, আশা। 'পরিচয়ে' লেখক বলেছেন—'আমার এই লেখাগুলি প্রবাসী, ভারতবর্ষ, নব্য ভারত প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আকারে ছোট হলেও এগুলি ছোট গল্প নয়, কারণ প্লট বা ছক্ বজায় রেখে চলবার প্রয়াস এতে নাই। শুধু রেখার সাহায্যে জীবনের কান্নাহাসি এবং বিশেষ করে অভাব ও অতৃপ্তির ছবিটুকু প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি। শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ, শ্রীসতীপ্রসাদ সেন, শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী ও শ্রীপ্রভাতকুমার দে মহাশয়ের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। তাঁদের সাহায্য না পেলে আমার একলার ক্ষমতায় বই ছাপাবার মত বিরক্তিকর কাজ সুসম্পন্ন হত না। আর যাঁরা আমাকে চিরদিন উৎসাহ দিয়ে এসেছেন, তীব্রভাবে সমালোচনা করে এসেছেন আমার লেখার, তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আজ আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যদি কিছু এমন লিখে থাকি যা প্রাণে লাগে, তৃপ্তি দেয়, তা তাঁদের সাহায্যেই পেয়েছি একথা আমার চিরদিন মনে থাকবে।'

(৪) **সোনার ফুল**—বড়ো গল্প। প্রথম প্রকাশ : ১লা মাঘ, ১৩২৯ (১৯২২); এটি লেখকের নিবেদনের তারিখ। প্রকাশক : শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ, আলিপুর জু বাগান, কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান—শিশির পাব্লিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য দেওয়া নেই। পুস্তকের আকার—৬″ × ৩·৫″ পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮৫। 'নিবেদনে' লেখক বলেছেন—'সোনার ফুল বঙ্গবাণী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সমস্ত গল্পটি নয়। শেষে ক'এক অধ্যায় বর্জিত হয়েছিল। কারণ তাতে যা লেখা আছে তা মাসিক পত্রে ছাপাবার উপযুক্ত নয় এবং অনেকে বলেছেন যে ওভাবে লেখা অন্যায়, ওতে "নীতির কোন আভাস নেই", বরং "কুরুচির" প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। ওতে সমাজের বিশেষ ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু আমার যতদূর বিশ্বাস লেখার ভিতর দিয়ে সমাজকে টলান যায় না। সমাজের একটা আশ্চর্য গুণ—তার সব সয়। তার প্রমাণ, যাদের কাহিনী অবলম্বন করে এই লেখা, তাদের নিয়েই একান্ত নির্বিকারভাবে সমাজ দিন কাটাচ্ছে।..."সৎ সাহিত্যের স্রষ্টিকর্ত্তারা উপদেশের মন্ত্রে মানব শিশুদের দীক্ষিত করছেন, আর আশ্চর্য শক্তির প্রভাবে তাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি

হয়ে চলেছে!—যা পায় তাই খায়।”…ঐ ক্ষুধার হুতাশনে আহুতি দেবার জন্যে সবচেয়ে দরকারী হয়ে উঠেছে শিশির-সিক্ত ফুলের মত কোমল ও নির্মল নারী! ওকে নিয়ে তারা যা খুশি তাই করতে পারে, এবং নারী যদি বলির পশুর মত ঐ হুতাশনে আপনাকে উৎসর্গ না করে, ইহকালে তাদের যে দশা, পরকালে তার চেয়ে সহস্রগুণ ভীষণ অবস্থার ছবি দেখান হয়। কিন্তু এ নিয়ে কারও কোন প্রশ্ন করবার অধিকার নাই। প্রশ্ন উঠলেই সমাজের যাঁরা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তাঁরা চোখ রাঙিয়ে বলবেন—“চুপ”। যারা ওতে ভয় পায় না, এবং নিজের হাতে প্রতিকার করতে যায় তারা “ব্যভিচারী”—সমাজে তাদের স্থান নাই। আমাদের চারিপাশে যে সোনার ফুলগুলি এই নরমেধ যজ্ঞের আগুনে শুখিয়ে উঠছে তাদের করুণ স্মৃতির উদ্দেশে “সোনার ফুল” উৎসর্গ করলাম। সমাজে ঠাঁই না হলেও জগতের যিনি স্রষ্টা, তাঁর পায়ে তাদের ঠাঁই আছেই।'

(৫) **পরীস্থান**—মেটারলিঙ্কের ‘ব্লু বার্ড’ নামক নাটকের গল্পাংশ নিয়ে ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ—১৯২৪। প্রকাশক লেখক স্বয়ং। প্রাপ্তিস্থান—কল্লোল পাবলিশিং হাউস, ১০।২ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা। বহু একবর্ণ চিত্র পরিশোভিত ও প্রবাসী কর্তৃক প্রশংশিত। মূল্য বারো আনা। কল্লোল, মাঘ, ১৩৩০-এ প্রকাশ আসন্ন বলে প্রথম বিজ্ঞাপিত।

(৬) **পথিক**—উপন্যাস। কল্লোল প্রকাশের আগেই এর প্রাথমিক খসড়া তৈরী হয়েছিলো। পত্রিকাটির প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ, ১৩৩০) থেকে দ্বিতীয় বর্ষ ৭ম সংখ্যা (কার্তিক, ১৩৩১, জ্যৈষ্ঠ ও আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৩১ বাদে) পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ, ১৯২৫। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য—৩৷৷০। অসুস্থ অবস্থায় লেখক এর প্রুফ দেখেন। নতুন সংস্করণ ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৬৩। টাইপ—পাইকা, পৃঃ ৪৬৪। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড। ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলি-৭ মূল্য—৬৷৷০।

(৭) **মায়া মুকুল**—গল্প সংগ্রহ। তিনখণ্ডে মোট উনিশটি গল্প আছে। লেখকের জীবৎকালে যন্ত্রস্থ ও প্রকাশের অপেক্ষায় ছিলো। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৯২৭। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা বারো আনা।

১. 'দেখলাম গোকুলবাবু শুধু কাজের লোকই নন, ভাবের লোকও বটেন। হৃদয়ধর্মী পুরুষ; হিসেব কষা মন নয়।'—অহীন্দ্র চৌধুরী, নিজেরে হারায়ে খুঁজি [প্রথম পর্ব : ১৮৮৪ শকাব্দ], ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং কর্তৃক প্রকাশিত। পৃ. ২০১।

২. এঁর পরিচয় প্রথম অধ্যায়ের পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

৩. দীনেশরঞ্জন দাশ, 'গোকুলচন্দ্র নাগ', কল্লোল, অগ্রহায়ণ, ১৩৩২।

৪. সতীপ্রসাদ সেনের কাছে শুনেছি।

৫. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৩২।

৬. তদেব। এবং কল্লোল, অগ্রহায়ণ, ১৩৩২।

৭. দীনেশরঞ্জন দাশ, 'গোকুলচন্দ্র নাগ' কল্লোল, অগ্রহায়ণ, ১৩৩২। এ প্রসঙ্গে ভূপতি চৌধুরীর বিবৃতে কম দামে ফুল বেচার ঘটনা স্মরণীয় (দ্রঃ 'কল্লোলের দিন', দিগন্ত, প্রথম বর্ষ) 'কল্লোলের যুগে' (চতুর্থ প্রকাশ, পৃঃ ৩) অচিন্ত্যকুমারের মন্তব্য উল্লেখ্য—'যে দোকান দিয়ে বসেছে সে ব্যবসা করতে বসেনি এমন কথা কে বিশ্বাস করতে পারত? কিন্তু সেদিন একান্তে তার কাছে এসে অনুভব করলাম, চার পাশের এই রাশীভূত ফুলের মাঝখানে তার হৃদয়ও একটি ফুল। আর সেই ফুলটিও সে অকাতরে বিনামূল্যে যে কারুর হাতে দিয়ে দিতে প্রস্তুত।'

৮. দোকানটির একটি বিজ্ঞাপন কল্লোলের ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩৩১) দ্রষ্টব্য।

৯. দীনেশরঞ্জন দাশ, 'গোকুলচন্দ্র নাগ' কল্লোল, অগ্রহায়ণ, ১৩৩২।

১০. তদেব।

১১. কালীশ মুখোপাধ্যায়, দ্রঃ বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস (?), বিধান সংগ্রহ শালার পক্ষে অসিত চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ৬৮ এবং 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' (প্রথম পর্ব, ১৮৮৪ শকাব্দ), অহীন্দ্র চৌধুরী, ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত পৃঃ ২০০-০১, ২৪০, ২৫৮, ২৬২, ২৬৫, ২৬৭, ২৭০।

১২. অহীন্দ্র চৌধুরী 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' গ্রন্থে লিখেছেন—কাগজে বিজ্ঞাপনের উত্তরে গোকুলচন্দ্র ড্রাফ্‌ট্‌সম্যান আর্টিস্টের পদের জন্য ইণ্টারভিউ দিয়েছিলেন এবং নির্বাচিত হয়েছিলেন (মাইনে পেতেন চল্লিশ টাকা)। কিন্তু সতীপ্রসাদ সেন আমাদের জানিয়েছেন, তাঁদের বাড়ীর কাছেই কাঁসারি পাড়ায় ছিলো অহীন্দ্র চৌধুরীর বাড়ী। তাঁরা পরস্পরের পরিচিত। অহীন্দ্র চৌধুরীরা কয়েকজন মিলে যখন একটি ছবি তোলার আয়োজন করেন তখন সেন মশাইকে চৌধুরী মশাই একজন আর্টিস্ট যোগাড় করে দিতে বল্লেন। সতীপ্রসাদ তখন গোকুলচন্দ্রকে অহীন্দ্র চৌধুরীর কাছে নিয়ে যান।

১৩. দীনেশরঞ্জনও লিখেছেন—'এই ছবি তোলার জন্য গোকুলকে বিপুল পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। সমস্ত Studio setting ও Art Direction গোকুলকেই চালনা ও design করিতে হয়।'—কল্লোল, অগ্রহায়ণ, ১৩৩২।

১৪. মূল চিঠিটা আমার কাছে আছে।

১৫. সজনীকান্ত দাস, 'আত্মস্মৃতি' (১ম খণ্ড), ত্রয়োদশ তরঙ্গ [প্রথম সং ১৩৬১]

১৬. ভূপতি চৌধুরী, 'কল্লোলের দিন', [দিগন্ত, প্রথম বর্ষ]। তাঁর মৌখিক বিবৃতিও অনুরূপ।

১৭. 'ঝরবে না আঁখিজল' (কবিতা), কল্লোল, অগ্রহায়ণ, ১৩৩২।

১৮. ভূপতি চৌধুরী 'কল্লোলের দিন' [দিগন্ত, প্রথম বর্ষ]।

১৯. কবিতা, কার্তিক সংখ্যা, ১৩৪৮।

২০. পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় জয়ন্তী (সপ্ততিতম জন্মদিবস উপলক্ষে), মহাজাতি সদন ১৯৬২, পৃ, ৩৯।

২১. দীনেশরঞ্জন দাশ, গোকুল নাগ, কল্লোল, অগ্রহায়ণ ১৩৩২।

২২. 'কল্লোল যুগ', চতুর্থ প্রকাশ, পৃ, ৩।

২৩. নিজেরে হারায় খুঁজি (প্রথম পর্ব, ১৮৮৫ শকাব্দ) পৃ, ২৩০।

২৪. সুকুমার সেন ; বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৫৮), পৃ, ২৯৪।

২৫. 'এই অসুখে পড়িয়াও তাহাব কল্লোলের ভাবনা।'—দীনেশরঞ্জন দাশ, কল্লোল, অগ্রহায়ণ, ১৩৩২।

২৬. তদেব।

২৭. নিজের আদর্শ ও নিজে যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছেন তাহা নিজ জীবনে প্রকাশ করিতে ও প্রতিষ্ঠিত করিতে গোকুল একদিনের জন্যও কুণ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। সেজন্য যাহা দুর্ভোগ সহিতে হইয়াছে তাহা অকাতরে সহ্য করিয়াছে। কোনদিন তাহা লইয়া আক্রোশ দেখায় নাই বা দুঃখ প্রকাশ করে নাই। চুপ করিয়া থাকাটা যেন স্বভাবেরই মূল। অনেক সময় তাহার আত্মীয় স্বজনরাও তাহাকে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না বা ভুল বুঝিতেন।' —তদেব।

২৮. 'উনি যে এভাবে হঠাৎ চলে যাবেন, এ আমাদের ধারনারও অতীত ছিল। যখন খবরটা পেলাম, তখন চোখে জল আসেনি, কিন্তু মনে হচ্ছিল সব যেন ফাঁকা হয়ে গেছে মুহূর্তে। ওঁদের কল্লোলের গ্রাহক করে দিয়েছিল আমাকে, সে কল্লোল আজও আছে আমার কাছে। তাতে পড়তাম তাঁর ধারাবাহিক রচনা—'পথিক'। বেশ লাগত। বড় বেদনাদায়ক ওঁর এই আকস্মিক নীরব প্রস্থানটুকু।—অহীন্দ্র চৌধুরী, 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' [প্রথম পর্ব ১৮৮৪ শকাব্দ পৃ, ৩৪৭]।

তৃতীয় অধ্যায়

কল্লোলের কলহংস : আড্ডায় ও সাহিত্যের আসরে

বাঙালীর মজ্জাগত ধাত আড্ডা দেওয়া—সে আড্ডা গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ, জমিদারের বৈঠকখানা, পাড়ার ক্লাবঘর কিংবা এ-কালের কফি হাউস যেখানেই হোক না কেন। এর একটা অবসর বিনোদনের দিক যেমন আছে, তেমনি আছে সাংস্কৃতিক দিক। কবি অজয় ভট্টাচার্য বলতেন, ফরাসী বিপ্লব হয়েছিলো মদের দোকান থেকে, আমরা বাংলাদেশে বিপ্লব আনবো চায়ের আড্ডা থেকে। এর ভালো-মন্দ ফল বর্তায় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে। বাংলা দেশের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্ত তাই আড্ডার বিবরণ বাদ দিয়ে লেখা হতে পারে না।

অন্য কথা ছেড়ে সাহিত্যের কথাই ধরা যাক্। বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি ও সমৃদ্ধির আধুনিক বৃত্তান্তের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে অনেকগুলি আড্ডার কথা। এবং সে-আড্ডাগুলির জন্মসূত্র মুখ্যতঃ কোনো-না কোনো পত্র-পত্রিকা। কোনো কোনোটির সঙ্গে বৃহৎ ব্যক্তিত্বও জড়িত। বঙ্গদর্শন প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যাপক ছিলো, কিন্তু বঙ্কিমের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সেই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট ছিলো না ; সেই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে পরিমাণ সময় দেওয়া প্রয়োজন তাঁর মত একজন সরকারী কর্মচারীর পক্ষে তা দেওয়া সম্ভবও ছিলো না। তাই উৎসাহী লেখকদের নিয়ে একটা গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠায় তিনি মন দিয়েছিলেন। বহরমপুরে থাকা-কালে এ বিষয়ে তাঁর সুবিধা হয়েছিলো। নবীন সাহিত্যসেবীদের অনেকে তখন কর্মব্যপদেশে বহরমপুরে ছিলেন। বঙ্কিমের নেতৃত্বে প্রথম সাহিত্যালোচনার সূত্রপাত সেখানেই। এর পর তিনি যেখানে গিয়েছেন, সর্বত্রই তাঁর বাসায় সাহিত্য-চক্র গড়ে উঠেছে। কাঁটালপাড়া, চুঁচুড়া, হুগলী, হাবড়া, কলুটোলায় থাকা-কালে প্রখ্যাত লেখকেরা সাহিত্যসভাতে একত্র হতেন। আলোচনাচক্রে কাব্য-নাটক দর্শন-ইতিহাস-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হত। এ ভাবে আলোচনার মাধ্যমে এবং লেখকগণ পরস্পর পরিচিত হওয়ার দরুণ তাঁদের চিন্তায় একটা ঐক্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ হয়েছিলো।[১] বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শনের (১৮৭২) সেই সাহিত্যিক আড্ডায় নানা সময়ে যাঁরা যাতায়াত করতেন তাঁরা হচ্ছেন রামদাস

সেন, চন্দ্রনাথ বসু, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি।

ভারতী দীর্ঘজীবী ছিলো এবং নানা জন তার সম্পাদনা করেছেন। সুতরাং পত্রিকাটির সঙ্গে একটিমাত্র আড্ডা কখনও জড়িত ছিলো না। প্রথম দিকে তার পরিচালনা ও সম্পাদনা যখন ঠাকুর পরিবারের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে ছিলো (অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলে) তখন ভারতীর ভিটায়[২] সম্পাদক ও তাঁর ভাই-বোন-আত্মীয়-পরিজনেরা মিলে একটা সাহিত্যের আসর জমিয়েছিলেন। কিন্তু যাকে বলে সাহিত্যিক আড্ডা, যেখানে সম্ভাবনাময় লেখকদের গল্পগুজব ও আলাপ-আলোচনায় নতুন মত ও পথের দ্বার খুলে যেতে পারে, তা তখন দেখা দেয় নি। বাইরের লোকদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিলো নিতান্তই ক্ষীণ। সরলা দেবীর সম্পাদনা-কালে প্রভাতকুমার ও আরও কারও কারও যাতায়াতে কার্যালয় অনেক সময় সরগরম থাকলেও ঠিক সাহিত্যিক আড্ডা গড়ে ওঠেনি। তবে সেই প্রত্যাশিত রসের ভিয়েন জমে উঠেছিলো সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের আমলে (১৩২২-১৩৩০)—২২ নং সুকিয়া স্ট্রীটে (বর্তমানে কৈলাস বোস স্ট্রীট) কান্তিক প্রেসের তিন তলায়। সেই ভিয়েনটি সুখ্যাত হয়েছে 'মণিলালের আসর' বা 'ভারতীর আড্ডা' নামে। সেই আড্ডার মধুচক্রে যাঁরা রসের যোগান দিতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, গিরিজাকুমার বসু, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি অনেক কবি-লেখকই।[৩] আড্ডার মধ্যমণি মণিলালের একটা সংবেদনশীল হৃদয়বত্তা ও সামাজিক আভিজাত্য থাকলেও (তিনি ঠাকুর পরিবারের অবনীন্দ্রনাথের জামাতা ছিলেন) উচ্চতর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী তিনি ছিলেন না। তাই আড্ডাধারীদের মাথা ছিলো সমান উঁচু, তাঁদের ওজন ছিলো প্রায় এক, তাঁদের বাজার দরেরও তেমন পার্থক্য ছিলো না। তাঁরা ছিলেন সমানধর্মা বন্ধুগোষ্ঠী, পারস্পরিক আলোচনা ও সহযোগিতায় তাঁদের সাহিত্যিক রসের রসায়ন ও সৃজন ঘটতো। মণিলালের আসর ছিলো তাই একদল লেখকের আসর—কোনো বিশেষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক রসচক্র নয়।

এর সমসাময়িক কালের আরেকটি সাহিত্যিক আড্ডা হচ্ছে সবুজপত্রীদের মজলিস—সবুজ সভা। 'মানসী' (১৩১৫) বা 'মানসী' ও 'মর্মবাণী'র' (১৩২২) কার্যালয় অথবা জমিদার জগদিন্দ্রনাথের মতো সভাশোভন ব্যক্তিত্বে কিছু লোককে

টেনেছিলো বটে, তাদের আশে পাশে লেখকদের আনাগোনা ছিলো বটে, তবু তার আড্ডার বিশেষ কোনো সাহিত্যিক তাৎপর্য ছিলো না। অনেক আগেকার 'প্রবাসী'র (১৩০৮) কিছু সহ-সম্পাদক ও লেখক কাজের ফাঁকে ফাঁকে কিছু আড্ডা জমাতেন বটে, কিন্তু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো সীরিয়াস ও কর্মিষ্ঠ সম্পাদকের ছত্রচ্ছায়াতলে বসে সাহিত্যিক মধুচক্র রচনা করার মতো স্বাধীনতা ছিলো না। বরং প্রবাসী গোষ্ঠীর আড্ডা যোগানন্দ-হেমন্ত-অশোকের 'ত্রিচক্রযানে' চড়ে পরবর্তীকালে শনিবারের চিঠির দপ্তরে গিয়ে কিছুটা সোরগোল তুলেছিলো। 'ভারতবর্ষ' (১৩২০) ও 'মাসিক বসুমতী'র (১৩২৯) কর্তৃপক্ষ ব্যবসা ও প্রচার যতটা বুঝতেন, আড্ডায় সাহিত্যিক মনের কণ্ডুয়নের তাৎপর্য ততটা বুঝতেন না। তাই তাঁদের ভেতরে বাইরে কোনো আড্ডার সাক্ষাৎ মেলে না। 'জাহ্নবী' (১৩১১), 'উপাসনা' (১৩৩১ পর্যায়), 'যমুনা' (দ্বিতীয় প্রচার, ১৩১৯-২৯), নারায়ণ (১৩২১) ইত্যাদির আড্ডা ছিলো বিশেষত্বহীন। কিন্তু সবুজপত্রের সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী একজন মজলিশী মানুষ[৪] ছিলেন—কমল হীরে বিদ্যা আর তার দ্যুতি কালচারের সম্বল নিয়ে তাঁর 'কমলালয়ে' একটা সাহিত্য-মজলিশও গড়ে উঠেছিলো। সেই আড্ডার কথা ভাবতে গেলেই একটা ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ড্রয়িং রুম—টেবিলের ওপর ইতস্তত বই ছড়ানো, দেয়ালে দেয়ালে আলমারি ভর্তি বই সাজানো। ওপরে রঙিন শেডের নিচে বিজলী আলো জ্বলছে। সোফা কৌচে আসর জম-জমাট। চায়ের কাপে ঝড় উঠেছে—শ্রোতা সুনির্বাচিত, বক্তা—প্রমথ চৌধুরী। বক্তব্যের মধ্যে বুদ্ধি ও মননের কসরত আছে, সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্ক আছে, তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ দিয়ে অতর্কিত আঘাতের চেষ্টা আছে। শ্রোতারা নির্বাক বটে, কিন্তু তাঁদের সম্ভাব্য যুক্তি নিয়ে 'লকড়ি' খেলতে বক্তা কুণ্ঠিত নন। কিংবা বিচিত্র ধরনের মানুষের বাক্ বিতণ্ডায় আসরটি মুখর, কিন্তু সব চেয়ে তীক্ষ্ণ প্রমথ চৌধুরীর গলা। সবুজ সভায় সকলেরই আপন মত ব্যক্ত করার ও তর্কে বিতর্কে যোগ দেওয়ার অবাধ সুযোগ ছিলো; তবে সমস্ত বক্তব্যেরই লক্ষ্য থাকতেন প্রমথ চৌধুরী। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি সব কিছুরই আলোচনা সেখানে হতো। আলোচনার লক্ষ্য ছিলো —এসব বস্তু যাতে মনকে পুষ্টি ও স্ফূর্তি দেয়, তারা বোঝা না হয়ে ওঠে। মজলিশ স্বীকার করে নিয়েছিলো, বিনা বিচারে কোনো কিছু মানা হবে না। বুদ্ধিতে যা বাধে তাকে অগ্রাহ্য করতে হবে, তার সমর্থনে যত বড়ো নামই থাক না কেন। আলোচনার ধরনটা ছিল হাল্কা, বিষয়বস্তু হাল্কা নয়। এই মজলিশের যজ্ঞেশ্বর ছিলেন প্রমথ চৌধুরী স্বয়ং, আর উত্তরসাধক ছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ

মুখোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চৌধুরী, সতীশচন্দ্র ঘটক, হারীতকৃষ্ণ দেব, বরদাচরণ গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় মজলিশটি বসতো—তবে অন্যান্য দিনেও কেউ কেউ এসে জমায়েত হতেন। কিঞ্চিৎ জলযোগের পর কখনও সাহিত্যালোচনা, কখনও সঙ্গীত চর্চা হতো। সত্যেন্দ্রনাথ বসু এস্রাজ বাজাতেন; দিলীপ রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ ও বীরবলের বাড়ির মেয়েরা গানে বা গানের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন।[৫]

বিভিন্ন পত্রিকা-কেন্দ্রিক আড্ডার এই বিবরণ[৬] এই সত্যই নির্দেশ করছে যে, বাংলা দেশে সাহিত্যিক আড্ডার একটা ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে। সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করেই যেন কল্লোলও একটা আড্ডা গড়ে তুলেছিলো। সে আড্ডা বসতো পত্রিকা আপিস (পটুয়াটোলা লেন) ও পাবলিশিং হাউসের কার্যালয়ে (কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট)। সেই আড্ডার প্রধান বিশেষত্ব ছিলো তার চারিত্র্যে। মণিলালের আসরের মতো এ-আসরেরও মধ্যমণি হিসাবে কোনো উচ্চতর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব বা অর্থবান সাহিত্যপৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। তবে মণিলালের একটা সামাজিক আভিজাত্য ও আড্ডাধারীদের মধ্যে অনেকের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা কম বেশি ছিলো। তাই তাঁদের আলোচনার মধ্যেও থাকতো একটা বয়স্কমন্যতা ও অভিজ্ঞতার ছাপ। কিন্তু কল্লোলের আড্ডায় যাঁদের নিয়মিত বা সাময়িক যাতায়াত ছিলো তাঁদের প্রায় সকলেই ছিলো ছাত্র বা ছাত্রোপম। কেউ বি. এ. বা এম. এ পড়তো, কেউ বা পড়তো ল' বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে—কেউ বা হয়ত পড়া ছেড়ে দিয়ে কিংবা অল্প বয়সে বিয়ে করে 'সংসারে' প্রবেশ করেছিলো, কিন্তু বয়সের দিক থেকে দীনেশরঞ্জন দাস ও মুরলীধর বসুকে বাদ দিলে সবাই ছিলো অতি তরুণ। আর সে-কারণেই কল্লোলের আড্ডা ছিলো লাগামহীন তারুণ্যের কলকোলাহলে সদামুখর।

আড্ডাধারীদের অনেকের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা ছিলো না, ছিলো শুধু সাহিত্য-প্রীতি। কেউ হয়ত নামকরা পত্রিকাগুলিতে মাসের পর মাস লেখা পাঠিয়ে দু' একটা ছাপা হওয়ার আশায় ছিলো, কেউ একেবারে নিরাশ হয়ে মনমরা অবস্থায় দিন কাটাতো, আবার কেউ বা হাতে লেখা কাগজ ও স্কুল কলেজের ম্যাগাজিনের গণ্ডি পেরিয়ে ভীরু পায়ে সবেমাত্র বৃহত্তর সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের মুখ দেখেছে। কিন্তু প্রায় সকলের কলম দ্রুত চলছে, গল্প কবিতার খাতা ভরে উঠেছে। এমন সময় কল্লোলের ডাক ও অবারিত আমন্ত্রণ তাঁদের কানে পৌঁছে দিয়েছিলো একটা নিজস্ব পানসত্রের অস্তিত্ব। আবার এমন দু' একজন ছিলেন যাঁরা সাহিত্যিক হওয়ার স্বপ্ন

দেখতেন না—দেখতেন সাহিত্যের পাণ্ডাগিরি করার স্বপ্ন। কারো কারো লোভ ছিলো একটা জমাট আড্ডার রসে, তাঁরা কথা বলতেন কম শুনতেন বেশি। সব মিলিয়ে কল্লোলের আসর ছিলো ভরপুর, কোনো কোনো দিন আড্ডা ঘর ছাপিয়ে বারান্দা ও রাস্তায় এসে ছড়িয়ে পড়তো।

আড্ডা বেশির ভাগ বসতো বিকেলের দিকে। তখন অনেকেই আসতেন।[৭] রাত আটটা ন'টা পর্যন্ত আড্ডা চলতো। পকেটে পয়সা হয়তো নেই হেঁটে বাড়ি ফিরতে হবে' তবু কল্লোল আপিসে হাজিরা দেওয়া চাই। বিকেলের দিকে খিদেয় পেট জ্বলছে, পকেটে বিশেষ কিছু নেই, ভরসা বড়জোড় এক কাপ চা এবং বাড়ির ভেতর থেকে আসা বিভূরঞ্জন দাসগুপ্তের স্ত্রী কমলা বৌদির রুটির তরকারির থালা। কখনও কখনও আপিসের কাছেই ফেভারিট কেবিনে ডবল হাফ চায়ের কাপ নিয়ে জোর আড্ডা জমানো—মালিক নতুনদার ঠোঁটের হাসিতে সম্মতির লক্ষণ। প্রায়ই একটা সিগারেট পালাক্রমে দুই বা তিনজন খেতেন এবং তাও জোগাতেন অপেক্ষাকৃত সচ্ছল জলধর সেনের ছেলে অজিতকুমার সেন।[৯] কোনো দিক থেকেই আরামের কোনো প্রতিশ্রুতি ছিলো না, তবু আসরটির আকর্ষণ ছিলো দুর্নিবার। আড্ডাধারী হরিহর চন্দ্র লিখেছেন—'এক অখ্যাত অবজ্ঞাত পল্লীর মধ্যে সর্বপ্রকারের বাহ্য আড়ম্বর এবং সর্ব প্রকারের আকর্ষণশূন্য সেই গৃহকোণটির পরিচয় দশের দুই পটুয়োটোলা লেন। এই গৃহের একতলায় বসিবার জন্য ছোট একখানি ঘর আছে।...শিল্পী দীনেশরঞ্জনের হাতে সেই ঘরখানির "নিমেষে নিমেষে নিতুই নব" রূপ দেখিয়াছি। শুধু তাহাই নহে, তাঁর আকর্ষণ প্রাণে প্রাণে বোধ করিয়াছি, স্বেচ্ছায় ও পরমানন্দে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই অপ্রশস্ত ঘরে আমাদের জীবনের সর্বোত্তম দিনগুলির অধিকাংশ কি করিয়া কাটিয়া গিয়াছে, তার কোনও হিসাব নিকাশ নাই[১০]।'

কল্লোল সম্পাদনার কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে আড্ডা দিতেন এবং গল্পগুজব করতেন দীনেশরঞ্জন ও গোকুলচন্দ্র। কাজ ফাঁকি দিয়ে আসর জমানো তাঁদের লক্ষ্য ছিলো না। দীনেশরঞ্জন দিতেন উত্তপ্ত বন্ধুত্বের সান্নিধ্য; গোকুলচন্দ্র নিরাসক্ত বা আত্মলীন ভাবুকতার স্পর্শ—তিনি কথা বলতেন কম। আড্ডাধারীদের সকলে কল্লোলের জন্ম থেকেই যে আসরে ধরা দিয়েছেন তা নয়, তাঁরা এসেছেন নানা পর্যায়ে। সাত বছরের কালপরিধিতে তাঁদের নামের মালা রচিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন—অচিন্ত্যকুমার, পবিত্রকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ভূপতি চৌধুরী, শৈলজানন্দ, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, মুরলীধর, অজিত সেন, সতীপ্রসাদ সেন (গোরাবাবু), সুবোধ দাশগুপ্ত, হরিহর চন্দ্র, নির্মল সিংহ, সোমনাথ সাহা. নজরুল ইসলাম,

প্রবোধকুমার সান্যাল, সুবোধ রায়, হেমেন্দ্রলাল রায়, বুদ্ধদেব বসু[১১], অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়,[১১] সুরেশ চক্রবর্তী,[১১] অমলেন্দু বসু,[১১] বিষ্ণু দে, সুকুমার ভাদুড়ী, বিজয় সেনগুপ্ত, মণীশ ঘটক, সনৎ সেন, ভবানী মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়-চৌধুরী, হেমচন্দ্র বাগচী, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হেম বাগচী, পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, সুরেশ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন দাস, শিবরাম চক্রবর্তী ইত্যাদি। এঁরা অবশ্য সকলে নিয়মিত বা সমান দরের আড্ডাধারী ছিলেন না। মোহিতলাল মাঝে মাঝে আড্ডায় আসতেন একথা আমাকে একদিন জানিয়েছিলেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়[১২]; ভূপতি চৌধুরী সে কথা লিখেছেন। তারাশঙ্করও কয়েকবার এসেছিলেন। অতুল বসু, যামিনী রায়, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রমুখ শিল্পীরাও মাঝে মাঝে আসতেন।

এই উল্লেখযোগ্য আড্ডার মনোজ্ঞ ও অন্তরঙ্গ বিবরণ দিয়েছেন অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত। সে-বিবরণ উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য এবং রসিক পাঠকের কাছে সুপরিচিত। অপেক্ষাকৃত কম প্রচারিত একটি স্মৃতি-চিত্রে কয়েকজন সম্পর্কে যে বর্ণনা আছে, তা উদ্ধৃত করছি—'একটা দিনও লেখেন নি কিন্তু কল্লোলের আপিসে এসে নিয়মিত ভাবে গল্প গুজব করে গেছেন এমন সব বন্ধুর মধ্যে সকলের আগে মনে পড়ে দুটী লোকের কথা—একজন অজিতকুমার সেন,[১৩] অন্য জন সতীপ্রসাদ সেন, গোরাবাবু বলে তাঁকে সকলে জানে। অজিতবাবু...মধ্যে মধ্যে দু' একটা কথা বলতেন। আর গোরাবাবু ছিম্‌ছাম মানুষটী, কলকাতার হালচালের খবর সব তাঁর নখদর্পণে, বিশেষ করে রঙ্গমঞ্চের—শিশির ভাদুড়ী থেকে সুরু করে অহীন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি সকল অভিনেতাদের নতুন ব্যবস্থার কথা, কোন থিয়েটারে কি বই হচ্ছে, কে কি রকম অভিনয় কচ্ছে সব খবর! কল্লোলের আসরের আর সব নিয়মিত বন্ধুদের মধ্যে ছিল—হরিহর চন্দ্র, নির্মল সিংহ ও সোমনাথ সাহা। হরিহর চন্দ্র বেশ ফর্সা, লম্বা চেহারা, লেখবার একটু আধটু সখও ছিল। কাজের মানুষের ভাব। এসে কিছুটা থেকে চলে যেতেন। আড্ডা দেবার যে অনিচ্ছা ছিল তা নয় কিন্তু যা কাজের ভিড়! চন্দ্র মশাই ব্যস্ত হয়ে বার হচ্ছেন, দরজার কাছে লাগল সোমনাথ সাহার কিংবা নির্মলবাবুর সঙ্গে ঠোকাঠুকি। নির্মলবাবুর কাজ অধ্যাপনা কিন্তু অধ্যাপকসুলভ আড়ষ্ট বৃদ্ধতা তাঁর স্বভাবের বাইরে।

সোমনাথবাবু হৃষ্টপুষ্ট দোহারা মানুষটা। চালচলনে শান্ত সমাহিত ভাব। থেমে থেমে কথা বলেন; হয়তো একটু তোতলামির ভাব কাটিয়ে নেবার জন্য।...আড্ডায় আসরে কোণ পেলে সামনে বসতে মোটেই রাজী নন।

…কাজী (নজরুল) মুক্তি পাবার পরে পবিত্রবাবুই বোধ হয় তাঁকে কল্লোল আপিসে নিয়ে আসেন। তারপর কতদিন যে কাজী বসে আসর জমিয়েছে তা আর বলা যায় না। গানে, গল্পে, উচ্চহাস্যে, প্রাণরসে উচ্ছল কবি মানুষটা। —"দে গরুর গা ধুইয়ে", বলে হাঁক ছেড়ে কাজী কল্লোল আপিসের দরজায় এসে হানা দিত। ঘরে ঢুকেই চৌকিতে বসে বার করত এক ঝুলি—আরশী, চিরুণী, স্নো ইত্যাদিতে ঠাসা। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া অসংযত চুলগুলিকে চিরুণীর সাহায্যে সুবিন্যস্ত করে,মুখে স্নো লাগিয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে সুরু করত আড্ডা। সকল কাজকর্ম বন্ধ—শোন কাজীর গান, গল্প ও হল্লা। কাজী চলে গেলে আবার সব চুপচাপ। ঝড়ের পর স্তব্ধতা।…

'সুকুমার ভাদুড়ী যেদিন কল্লোল আপিসে এলেন সেদিনের কথা বেশ মনে আছে। আড্ডা তখনো জমে ওঠেনি—এমন সময় একটি ফর্সা চেহারার যুবক কল্লোল আপিসের দরজায় এসে উপস্থিত। নিজের নাম বলতেই গোকুলবাবু তাকে সাদরে আহ্বান করলেন। ভারী লাজুক প্রকৃতির মানুষ, মুখে চোখে সবসময়ে একটা ক্লান্তির স্ফূর্তিহীন ছায়া।…সুবোধবাবু মধ্যে মধ্যে আসতেন—তখন তিনি থাকতেন নৈহাটিতে। খানিকটা গল্পগুজব, বিশেষ করে রাজনীতির খানিকটা ধুলো উড়োতেন।…

'কল্লোলের ছোট ঘরটিতে এক এক করে নতুন লেখকদের আনাগোনা বেড়ে গেল। এই দলে উদয় হলেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। হাতে একগাদা বই, কণ্ঠে মন্দাক্রান্তা ছন্দে কশ্চিৎ কান্তার গুরু-বিরহ বেদনার ধ্বনি।…বিজয়বাবু সুকুমারের বন্ধু; মধ্যে মধ্যে কল্লোলে আসতেন। লেখার বেশ হাত ছিল। যে দিন আসতেন গল্প গুজবে সকলকে হাসিয়ে অস্থির করে তুলতেন।…ক'দিন বাদে তিনি এসে হাজির—সাইকেলে চড়ে। বুকে চাদর বাঁধা, কর্মঠ রোগা শরীর, মুখে একটা সহজ সপ্রতিভ ভাব। দু দণ্ডেই আলাপ জমে গেল—গল্পের নামে লেখকেরও নামকরণ হয়ে গেল—দা গোঁসাই। অথচ তাঁর আসল নাম সুরেশ মুখোপাধ্যায়।…

'(মণীশ ঘটক বা যুবনাশ্ব) লম্বায় ছ ফুট, পাতলা চেহারা, মুখের মধ্যে নাকটি প্রবল—গল্পে-গুজবে সকলকে মশগুল করে রাখার ক্ষমতা রাখে। কথায় পূর্ববঙ্গীয় টান ইচ্ছা করেই প্রকাশ করার চেষ্টা।… বুদ্ধদেববাবুর কথা মনে হলেই সঙ্গে সঙ্গে অজিতকুমারের কথা মনে আসে। তখন সাধারণত এঁদের দুজনকে এক সঙ্গে দেখা যেত।…হুমায়ূন কবির ও জীবনানন্দ দাশগুপ্ত কল্লোল আপিসে আসা যাওয়া করতেন কিনা মনে নেই।…এঁদের কথা বলতে গিয়ে আর একজনের কথা মনে

এল—তিনি কবি মোহিতলাল মজুমদার। ভারী চমৎকার কবিতা আবৃত্তি করতেন—বিশেষ করে দেবেন সেনের কবিতা। মধ্যে মধ্যে কল্লোলের আসরে এসে দেখা দিতেন।··· নতুন উল্লেখযোগ্য নবাগত জগদীশ গুপ্ত। এঁকে সশরীরে কোনো দিন কল্লোল আপিসে আসতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।···

'···বিভূতিবাবু (মুখোপাধ্যায়) মফস্বল থেকে লেখা পাঠাতেন, কোনোদিন কল্লোল আপিসে এসেছিলেন কিনা জানি না।···তারাশঙ্করবাবু ও সরোজবাবু (রায় চৌধুরী) মধ্যে মধ্যে কল্লোলে এসে আড্ডা দিতেন। কথা যখন বলতেন অল্পসল্প, তার ভেতর ভারী চমৎকার একটা শ্লেষ থাকত।···(প্রবোধকুমার সান্যাল) এতদিন ডাকঘরের অন্তরালেই বাস করতেন। এতদিনে করলেন আত্মপ্রকাশ।···

'বিরূপ সমালোচনার জন্যই হোক আর সাহিত্য ব্যবসায়ে জ্ঞানের অভাবের জন্যই হ'ক কল্লোল প্রকাশে অনেক বাধা ঘটতে লাগল। নতুন লেখকদের ভেতর আগে গোষ্ঠীভাব দেখা যেত, তা যেন কেমন মন্দীভূত হয়ে গেল। স্পষ্ট কিছু বোঝা যায় না। তবে আড্ডাও আর জমত না'।[১৪]

কল্লোলের আড্ডার এই বিবরণ একথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আড্ডাটি ছিলো একদল তরুণের[১৫] যৌবনের পানসত্র, নতুন লেখকের মুখর প্রাণের রসভাণ্ডার। সেই সরাইখানায় নিত্য যাওয়া আসার মধ্য দিয়ে তাঁদের সাহিত্যপ্রীতি বেড়েছিলো, ছন্নছাড়া সাহিত্যিক জীবন একটা আশ্রয়ে এসে পৌঁছে ছিলো। বিচিত্র আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের ভেতর দিয়ে সেই সাহিত্যযশঃপ্রার্থীদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ধী ও রুচি ভাঙা-গড়ার সুযোগ পেয়েছিলো এবং একটা সাযুজ্য-সূত্রে গড়ে তুলতে পেরেছিলো গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়ার আবহাওয়া। যাঁদের লেখক হওয়ার বাসনা ছিল না, তাঁদেরও কেউ কেউ লেখার প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন; সম্ভাবনাময় লেখকদের সৃজনক্ষমতা আরও জোরালো ও মননক্রিয়া আরও ধারালো হয়ে উঠেছিলো। সবচেয়ে বড় কথা, আড্ডার বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কল্লোলের নিজস্ব স্কুলের আদর্শ প্রচারের যোগ্যতা আড্ডাধারীরা অর্জন করতে পেরেছিলেন। আর আড্ডাধারী লেখকরা পরবর্তী কালে স্ব-মহিমায় যে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন, তার ভাব-উৎস ছিলো কল্লোলের আসর।

দুই

কল্লোলগোষ্ঠী বলতে একদল তরুণ লেখকগোষ্ঠী বোঝায় এবং সেই তরুণ লেখকগোষ্ঠীর সাহসিক সৃষ্টি কর্মের ফলে বাংলা সাহিত্যের কল্লোল-পর্বের জন্ম। কিন্তু পত্রিকাটির

রচনাসূচী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, একদল প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠিত লেখকের রচনায়ও তার অনেক সংখ্যা সমৃদ্ধ হয়েছে। এঁরা কল্লোলের আসরে আড্ডা দিয়েছেন বলে শোনা যায় নি, তবে সম্পাদকীয় দপ্তরের অনুরোধে লেখা দিয়ে তরুণদের উৎসাহিত করেছেন। এটা হয়ত কোনো কোনো বলদর্পী তরুণ লেখকের মনঃপূত হয় নি, কারণ নতুন যুগের নতুন ভাবনার মুখপত্র রূপেই তাঁরা কল্লোলকে দেখতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া সম্পাদকদ্বয়ও নতুন লেখকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর এতটা নির্ভর করেছিলেন যে, কল্লোলে প্রবীণদের রচনা তরুণদের চোখে বিসদৃশ বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। তবু যে পত্রিকাটিতে মাঝে মাঝে প্রতিষ্ঠাবান্ প্রবীণদের রচনা বেরিয়েছে তার কারণ বোধ হয় তিনটি—এক, কোনো কোনো অগ্রজ লেখকের প্রতি কল্লোলকর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা : দুই পত্রিকাটির মূল্য ও আভিজাত্য বৃদ্ধির ইচ্ছা ; তিন, জনমনোরঞ্জন। এর ভালোর দিক হচ্ছে, প্রবীণ সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব নতুন লেখকদের সংযম সংহতির আদর্শ দেখাতে পেরেছে—নতুন লেখকরাও তাঁদের সজীব প্রাণের স্পর্শে প্রবীণকে নব্যচিন্তা ও সৃজনকর্মে উদ্বুদ্ধ করার মতো সান্নিধ্য পেয়েছে। আর মন্দের দিকে দেখতে পাই, এর ফলে কল্লোল তার নিজস্ব চারিত্র্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে হারিয়েছে।

কল্লোলের প্রবীণ লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে। তিনি অবশ্য চিরনবীন। বাংলা দেশে যখনই কোনো নতুন পত্রিকা বেরিয়েছে তখনই কবিগুরু তাতে কিছু-না-কিছু লেখা দিয়েছেন। কল্লোলও তাঁর অকৃপণ কলমের দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হয় নি। পত্রিকাটিতে রবীন্দ্রনাথের মোট নয়টি কবিতা বেরোয়, তাদের মধ্যে কোনোটি নতুন রচনা, কোনো কোনোটি পুরনো লেখার পুনর্মুদ্রণ। কল্লোলের কর্তৃপক্ষ তাঁর কবিতাগুলিকে সংশ্লিষ্ট সংখ্যাগুলির শিরোভূষণ রূপে ব্যবহার করেছেন, অশেষ শ্রদ্ধা নিয়েই যে তাঁরা সেগুলি ছেপেছেন তার প্রমাণও আছে। ১৩৩১-এর বৈশাখ সংখ্যায় প্রথম রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'শেষ অর্ঘ্য'[১৬] ছাপা হয়, পরিচয়-লিপিতে সম্পাদক বলেন—'এবারকার সংখ্যায় ধ্যানী কবি রবীন্দ্রনাথ "শেষ অর্ঘ্যে" বিদায়ের গান গাহিয়া যাত্রা করিয়াছেন, আমরা প্রার্থনা করি বিশ্বকবি ও তাঁহার সংযাত্রীগণ এই দেশ পর্যটন মহিমান্বিত করিয়া ফিরিয়া আসুন।' ১৩৩৩-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় কবিগুরু রচিত 'কবির কামনা।'[১৭] এটি সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—'এবারকার প্রথম কবিতাটি কবি তাঁহার জন্মতিথিতে লিখিয়াছেন। কল্লোলের প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহ। অনুমতি চাহিবামাত্রই কল্লোলে প্রকাশ করিতে সম্মতি দিয়াছেন। এই কবিতাটিতে মনের যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে,

জন্মতিথির উৎসবেও কবি তাঁহার মনের সেই কথাই বলিয়াছেন।' কল্লোলের পরিচালকগণ কল্লোলের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের রচনার মূল্য কতখানি মনে করতেন তার আভাস পাওয়া যায় নীচের এই ঘোষণায়[১৮]—'বৈশাখে (১৩৩২) রবীন্দ্রনাথের কবিতা, রবীন্দ্রনাথের চিঠি, বীরবলের রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধ।' সুতরাং রবীন্দ্রনাথ কল্লোলগোষ্ঠীর কেউ না হলেও তাঁদের কাছে বহু সম্মানিত নিশ্চয় ছিলেন। তবে অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথও এই লেখকগোষ্ঠীকে সাহস দিতেন, অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে কল্লোলের শুভকামনা করতেন (ডাকঘর, কল্লোল, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩)। কল্লোলে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রচনার শিল্প-গৌরব তাঁর নিজেরই প্রাপ্য, কল্লোলের নয়।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০) আর একজন বর্ষীয়ান্ লেখক। ১২৯০ সাল থেকে গার্হস্থ্যরসাশ্রিত রোমান্টিক উপন্যাস ও গল্প রচনায় মনোনিবেশ করে তিনি বাংলা কথা-সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছিলেন। তাঁর গল্প-গ্রন্থ সংগ্রহ (১৮৯২) তাঁকে এমন কি রবীন্দ্রনাথের অগ্রবর্তী[১৯] গল্প-লেখক রূপে' চিহ্নিত করে দিয়েছে। তিনি কল্লোলের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩৩০) 'পুঁটেরাম' নামে গল্প লেখেন। নগেন্দ্রনাথ সম্পর্কে সতীপ্রসাদ সেনের দাদামশাই ছিলেন এবং তিনিই কল্লোলের জন্য গল্পটি প্রায় জোর করে সংগ্রহ করে আনেন। মনে রাখা প্রয়োজন, কল্লোল গল্প-মাসিক রূপেই প্রচারিত হয়েছিলো এবং সেদিক থেকে প্রাচীনতম গল্প-লেখকের 'পুঁটেরাম' প্রকাশের একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। নগেন্দ্রনাথ ছিলেন পুরানো মতবাদের লোক, কিন্তু দুঃসাহসিক পুঁটেরামের সঙ্গে বিবাহিতা তরুণী চাঁপার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার কাহিনী কল্লোলের বিদ্রোহী সুরের সঙ্গে বেমানান হয় নি। এ প্রসঙ্গে এও স্মরণীয় যে, এর অনেক কাল পূর্বে তাঁর 'তমস্বিনী' (১৯০০) উপন্যাসে যৌন বাস্তবতার প্রকাশ দেখা গিয়েছিলো। এ-জাতীয় অসামাজিক প্রণয়-কাহিনী নবীন লেখকেরাও লিখেছেন।

কল্লোলের আরেকজন প্রবীণ লেখক হচ্ছেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২)। তিনি নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মতো রবীন্দ্রনাথের সমবয়স্ক। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবিতা' প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ (১২৯৬) সালে, গদ্য রচনার নিদর্শন প্রথম পাওয়া যায় 'কথানিবন্ধ' (১৯০৫)। 'তপস্যার ফল' শীর্ষক গল্পগ্রন্থও অনেক পূর্বে—১৯১২ সালে আত্ম-প্রকাশ করে। তবে অন্যান্য প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠিত লেখকের চেয়ে তাঁর সম্পর্ক কল্লোলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর ছিলো। তার প্রথম ও প্রধান কারণ, তিনি ছিলেন ফোর আর্টস ক্লাবের নেত্রী ও কল্লোলের লেখিকা সুনীতি দেবীর পিতা। তাছাড়া তিনি ছিলেন দীনেশরঞ্জন দাশের অতিপরিচিত, উভয়েই ছিলেন নব বিধান ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। তাঁর অনেকগুলি গ্রন্থ কল্লোল

পাবলিশিং হাউস থেকে পুণঃপ্রচারিত হয়েছিলো। এই সব কারণে অন্ধ হওয়া সত্বেও তিনি কল্লোলের জন্য লিখেছেন এবং সে-সব লেখা সহজেই পাওয়া গেছে।

কল্লোলের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে ষষ্ঠ বর্ষ পর্যন্ত বিজয়চন্দ্র লিখে গেছেন, সপ্তমবর্ষে না লিখলেও যোগ অক্ষুন্ন ছিলো বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল থেকে শুনেছি। কল্লোলে প্রকাশিত তাঁর দশটি রচনার গুণাগুণ আমরা বিচার করবো না, কারণ তাতে পত্রিকাটির ঐতিহাসিক চারিত্র্য অনুধাবনে কোনো সুবিধা হবে না। শুধু এইটুকু বলা যথেষ্ট হবে যে, তাঁর মন ধর্মপ্রবণ[20] হওয়া সত্বেও যুগানুগ রস পিপাসা ও চলিষ্ণুতা হারিয়ে ফেলেনি। কল্লোলের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত রচনাটিতে তাঁর একটি উক্তি রীতিমতো চাঞ্চল্যকর—'মানি বটে প্রকৃতির লীলা চলিয়াছে ধীরতায় ও অটলতায়, কিন্তু স্বীকার করি প্রকৃতির কাজে কোনো তাড়া নাই, আর সে একটা বড় রকমের সিদ্ধি গড়িয়া দিতে প্রতিশ্রুত হয় না। আমরা কিন্তু দেরী সহিতে পারি না; বিধাতার আইনের উপরে আত্মদম্ভের আইন চালাইয়া নূতন নূতন বিশ্বামিত্র সাজিয়া তাড়াতাড়ি নূতন সৃষ্টি করিতে চাই; প্রকৃতির প্রাণের সূতায় প্রাণ গাঁথিয়া আমরা অলসকর্মা বা অকর্মা হইতে চাই না—চাই বিশ্বকর্মা বা বিশ্বকর্মাকে ছাড়াইয়া বাইশকর্মা হইতে। যে সকল ব্যক্তি কোলাহলে না ডুবিয়া বিজ্ঞতার কথা বলে, আমরা তাহাদের ফন্দি ধরিয়া ফেলিয়াছি, তাহারা আমাদের আলস্য বাঁচাইয়া তুলিতে চায়।' অতি প্রবীণ লেখকের মুখে এ যেন অতি-নতুন কল্লোলের প্রাণের কথা!

প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) সম্পাদিত সবুজপত্রের ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রায় শেষ হয়ে যাওয়ার পর—নবম বর্ষের পর—কল্লোলের আত্মপ্রকাশ।[21] কল্লোল চলাকালে কয়েক বৎসর ব্যবধানে দশম বর্ষের (আশ্বিন, ১৩৩৩ থেকে শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৩৪ পর্যন্ত) সবুজপত্রের বারোটি সংখ্যা[22] মাত্র বেরিয়েছিলো। সুতরাং কল্লোলকে সবুজপত্রের উত্তরসাধক বলা যেতে পারে। প্রমথ চৌধুরী নিজে ছিলেন সমস্ত কিছু সবুজ ও সজীবের উৎসাহস্থল; সবুজপত্রের কণ্ঠে ছিলো 'ওঁ প্রাণায় স্বাহা' মন্ত্রোচ্চারণ, কপালে ছিলো যৌবনের রাজটীকা। সুতরাং যৌবনধর্মী নবীন লেখকদের মুখপত্র কল্লোলের প্রতি তাঁর একটা সস্নেহ দৃষ্টি থাকার কথা—যদিও তাঁর শক্তিধর যৌবন-পূজা ও বিচারপ্রবণ মননশীলতার সঙ্গে কল্লোলগোষ্ঠীর যৌবনাবেগ ও উচ্ছ্বসিত হৃদয়ানুভূতির পার্থক্য ছিলো অনেক। অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন—'মাঝে মাঝে সকালবেলা কেউ-কেউ যেতাম আমরা তাঁর বাড়ীতে, মে-ফেয়ারে। কল্লোলের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্নপ্রশয় ছিলেন বলেই যখনই যেতাম সম্বর্ধিত হতাম। প্রতিভাভাসিত মুখ স্নেহে সুকোমল হয়ে উঠতো। বলতেন, প্রবাহই হচ্ছে

পবিত্রতা—স্রোত মানেই শক্তি। গোড়ায় আবিলতা তো থাকবেই, স্রোত যদি থাকে তবে নিশ্চয়ই একদিন খুঁজে পাবে নিজের গভীরতা'।[২৩] এই স্নেহানুকূল্যবশতঃই মাঝে মাঝে কল্লোলে লেখা দিয়েছেন। আর এই মনস্বী লেখকের প্রতি কল্লোল গোষ্ঠীর শ্রদ্ধার প্রমাণ আছে পত্রিকার ১৩৩৩-এর ফাল্গুন সংখ্যায় প্রমথ চৌধুরীর ফোটোগ্রাফ ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত রচিত 'বীরবল' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশের মধ্যে।[২৪]

কবিরূপে প্রিয়ংবদা দেবী (১৮৭১—১৯২৫) রবি-চক্রের অন্তর্ভুক্ত। ঠাকুর পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত ভারতীর পৃষ্ঠায় প্রিয়ংবদার প্রথম কবিতা আত্মপ্রকাশ করেছিলো এবং পত্রিকাটির মৃত্যু পর্যন্ত তার সঙ্গে প্রিয়ংবদার সাহিত্যিক যোগ ছিলো। তবে বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) থেকে শুরু করে সমকালের অন্যান্য সব পত্রিকার তিনি প্রায় নিয়মিত লেখিকা ছিলেন। তিনি মুখ্যত ভারতীর কবি বলে পরিচিত হলেও অন্যান্য পত্রিকার সঙ্গে তাঁর কোনো আদর্শগত বিরোধ ছিলো না। তিনি কবি হিসাবে নিঃশত্রু ছিলেন। তাই একদা তিনি যেমন সবুজপত্রের আসরে আমন্ত্রিত হয়েছেন, তেমনি আমন্ত্রিত হয়েছেন কল্লোলের আসরে। তবে কবিতার ভালো-মন্দ নিয়ে তিনি নিজে ছিলেন নিজেরই পরিচয়, কল্লোলের বিশেষ চারিত্র্য গঠনে তাঁর কোনো দান ছিলো বলে মনে হয় না।

অনেকের, ধারণা কল্লোলে বল্গাহীন যৌবন-সারথ্য ও মীনকেতনের ধ্বজাবহনের মন্ত্রগুরু হচ্ছেন দুজন—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। কেউ কেউ স্পষ্ট করেই বলেছেন, যৌন-আবেগমূলক সাহিত্যের আধুনিক নেতা ছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং কল্লোলের বীজ বোনা হয়েছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাত্রদের বার্ষিক পত্রিকা বাসন্তিকায় (১৯২২)[২৫]। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, শরৎচন্দ্র ও নরেশচন্দ্র কেউ কল্লোলে কোনোদিন লেখেন নি। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কল্লোলের কিছু কিছু ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিলো, তিনি একদিন এসেছিলেন কল্লোলের আড্ডায়। শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উক্তি—'সমাজ জিনিসটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে আমি মানিনে' কিংবা 'পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়'—বিবাহের -চেয়ে-বড়ো-কিছুর সন্ধানী কল্লোল গোষ্ঠীর কাছে আদর্শস্থানীয় বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। আধুনিক সাহিত্যের সপক্ষে শরৎচন্দ্রের আজীবন সংগ্রামও এঁদের কাছে প্রেরণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু শরৎচন্দ্র 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার বাঁধা লেখক ছিলেন এবং কল্লোলের আর্থিক সামর্থ্যও সীমাবদ্ধ ছিলো। সেজন্য তরুণরা শরৎচন্দ্রের লেখা সংগ্রহ করে কল্লোলে ছাপতে পারে নি। তাই ১৩৩৪-এর পৌষ সংখ্যা কল্লোলে শুনি—'শরৎচন্দ্র নানা বিঘ্ন বিপত্তিতে পড়িয়া, দিবার প্রতিশ্রুতি

দিয়াও আমাদের লেখা দিতে পারেন নাই।' নরেশচন্দ্র বাংলা উপন্যাসে 'আধুনিক বাস্তবতা' আমদানি করে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন তা একালের বিশ্বামিত্রদের মনোহরণ না করে পারে নি। তিনি অশ্লীলতার অভিযোগের বিরুদ্ধে আদালত প্রকোষ্ঠ ও সাহিত্যের অঙ্গনে লড়েছেন, সাহিত্যের রীতি ও নীতি নিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের সমধর্মা হয়ে সংগ্রাম করেছেন। কল্লোলের ঢাকাগোষ্ঠী—বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, অমলেন্দু বসুর দল—তাঁর কাছাকাছিই ছিলেন। সুতরাং এঁদের দুজনকে কল্লোলের অলিখিত লেখার লেখক বলা যেতে পারে।

শরৎচন্দ্রের লেখা ছাপতে না পারার ক্ষতি কল্লোল পূরণ করে দিয়েছিলে শরৎচন্দ্রের ফোটো, জীবনী ও প্রসঙ্গকথা ছেপে। বেশ কিছু সংখ্যায় সম্পাদক শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। কতকটা এই সূত্রেই কল্লোলের আসরে লেখকরূপে হাজির হন শরৎচন্দ্রের মাতুলদ্বয়—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও গিরীন্দ্র-নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রথমজন লেখেন শরৎচন্দ্রের জীবনী, দ্বিতীয়জন শরৎচন্দ্র সম্পর্কে প্রবন্ধ। এঁরা দুজনেই প্রবীণ, কিন্তু নবীনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ নন। ১৩৩৭ সালের মজঃফরপুর সাহিত্য সম্মেলনে গিরীন্দ্রনাথের ভাষণ আজও স্মরণীয় হয়ে আছে—'যাহা সত্য তাহা যদি অশুভও হয় তথাপি তাহাকে অস্বীকার করিয়া কোন লাভ নাই, তাহাকে গোপন করিবার চেষ্টা বৃথা!...আমার তরুণ সাহিত্যিক বন্ধুগণ, আমি আপনাদিগকে সত্য বলিতেছি যে, বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত শুভদিনে আপনাদের সাহিত্যজীবন আরম্ভ হইয়াছে।' সুরেন্দ্রনাথ কালের সঙ্গে পা ফেলে চলতে জানতেন, তাই কল্লোলের আসরে অবাঞ্ছিতভাবে তাঁর ডাক পড়েনি।

তবু এঁরা কল্লোলের বহিঃচক্রেরই অন্তর্ভুক্ত, অন্তঃচক্রের নয়।

অবনীন্দ্রনাথকে লেখকরূপে আবিষ্কার করার কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য। রবিমণ্ডলে তিনি আজীবন বাস করেছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি আপন স্বাতন্ত্র্যে আপনি অনন্য। তাঁর অননুকরণীয় স্টাইল আজও তাঁর শিল্পী-ব্যক্তিত্বের বিশিষ্টতা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর শিল্পিত স্বভাবে এমন একটা গাঙ্গেয় ঔদার্য ছিলো যা কোনো গোষ্ঠীভাবনাকে প্রশ্রয় দেয় নি। শোনা যায়, বিচিত্রা ভবনের সভায় তিনি কোনো বিশেষ দলের হয়ে যোগদান না করলেও এমন কিছু বলেছিলেন যা তাঁর মনের প্রগতিশীলতার পরিচায়ক। এই সব কারণে কল্লোল কর্তৃপক্ষ তাঁকে পত্রিকা-টিতে লেখার জন্য সশ্রদ্ধভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তবে তাঁর সেই সব লেখায় নতুন কালের জয়ধ্বনি শোনা গিয়েছে এমন কথা বলতে পারবো না। ভাবনায় ও সৃষ্টিকর্মে তিনি এখানেও নিজের পথই অনুসরণ করেছেন।

এ ছাড়া প্রবীণ বা পূর্ববর্তীকালের লেখকদের মধ্যে আর যাঁদের কল্লোলের আসরে দেখা গেছে তাঁদের অনেকের লেখায় নতুনত্ব কিছু নেই। বক্তব্য, লিখন-শৈলী ও চারিত্র্যে সেগুলি কোনো ঐতিহাসিক তাৎপর্য লাভ করতে পারে নি। তাঁদের মধ্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন (১৮৬০-১৯৩৯), গিরিজাকুমার বসু (১৮৮২-১৯৮৫), নরেন্দ্র দেব (১৮৮৮-১৯৭১), রাধাচরণ চক্রবর্তী (১৮৯৩-১৯৩৮), প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (১৮৯০), বারিন্দ্রকুমার ঘোষ (১৮৮০—?), বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৭-১৯৩২), সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪), প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (১৮৯৬-১৯৭২), নলিনীকান্ত সরকার, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯), যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮), হেমেন্দ্রলাল রায় (১৮৯২-১৯৩৫), হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৩-১৯৬৩), শৈলবালা ঘোষজায়া (১৮৯৪) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এ-পর্যন্ত কল্লোলের যে কলহংসদের পরিচয় দিলাম, তাঁরা কল্লোলে লিখলেও ঠিক কল্লোলীয় নন। তাঁরা পত্রিকার আসরে আমন্ত্রিত অতিথিশিল্পী মাত্র। তাঁদের কেউ কেউ স্বয়ংবৃত্ত থেকেই কল্লোলের দিকে দাক্ষিণ্যের হাত বাড়িয়েছেন, কেউ কেউ বা নিজেদের মানসবৃত্ত থেকে ক্ষণিকের জন্য হলেও বেরিয়ে গিয়ে কল্লোলের উদয়াচল স্পর্শ করেছেন—নবযুগের যৌবনপথের পথিক হতে চেয়েছেন। ভারতী ও মানসীর কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিতায় শারীরিক স্পর্শকাতরতার বর্ণনায় তার একটা দৃষ্টান্ত মেলে—

টসটসে রস-ভরপুর
আপেলের মত মুখ
আপেলের মত বুক
পরিপূর্ণ প্রবল প্রচুর ;
যৌবনের রসে ভরপুর।
মেঘ ডাকে কড়কড়,
বুঝি বা আসিবে ঝড়,
তিলেক নাহিক ভয় তাতে,
উহারি বুকের বাস
পূরায় মনের আশ
উরস পরশ করি হাতে ;
অজানা ব্যথায় সুমধুর

সেথা বুঝি করে গুর গুর।

—যৌবন চাঞ্চল্য

এ সত্ত্বেও প্রবীণ লেখকদের রচনা প্রকাশে তরুণের দল সন্তুষ্ট হয় নি, প্রাচীন-পন্থীরা পেয়েছেন আক্রমণের নূতনতর ক্ষেত্র। সজনীকান্তের আত্মস্মৃতিতে শেষোক্তদের মনোভাবের কিছু পরিচয় আছে—'বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত এমন কিছু নহে ; আর পাঁচটা পত্রিকা যেমন হয় সেই রকমই পাঁচমিশেলি ব্যাপার, থোড় বড়ি খাড়া—খাড়া বড়ি থোড় ; লেখক রবীন্দ্রনাথ, জলধর সেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেমেন্দ্র অচিন্ত্য নৃপেন্দ্র বুদ্ধদেব পর্যন্ত ; পুরাতন ও নূতনের মিশেল, ভাল মন্দ মাঝারি সব রকমের লেখাই ইহাতে।'[২৬] অথচ প্রবীণদের লেখা ছেপে দীনেশরঞ্জন আত্মপ্রসাদের সুরে বলেছিলেন (অবশ্য গোকুলচন্দ্র তখন বেঁচে নেই, কল্লোলকে বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে সংগ্রাম করে চলেছেন দীনেশরঞ্জন)—'কল্লোলে বাংলার প্রায় প্রত্যেক প্রথিতযশা লেখক বা লেখিকাই তাঁহাদের রচনা দিয়া আমাদের গৌরবান্বিত করিয়াছেন।' কিন্তু অচিন্ত্যকুমার এ নিয়ে পত্রিকাটির ধর্মবিচ্যুতির অভিযোগ এনেছেন, তিনি তাঁর অসন্তোষ চেপে রাখার চেষ্টা করেন নি।

এর পর আসে যথার্থ কল্লোলীয়দের কথা। এদের মধ্যে বোধ হয় জ্যেষ্ঠ ছিলেন দীনেশরঞ্জন, কনিষ্ঠ ছিলেন বিষ্ণু দে (১৯০৯) ও ভবানী মুখোপাধ্যায় (১৩১৬)। এঁরা সকলেই অল্পবয়স্ক নতুন লেখক—কল্লোলে তাঁদের লেখা প্রথম প্রকাশিত হয়েছে, কিংবা অন্যত্র দু'একটি লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর কল্লোলে এসে জুটেছেন। এঁরা সম্পূর্ণভাবে কল্লোলের সৃষ্টি, কল্লোলের ধ্বনি কোলাহলে তাঁদের সাহিত্যিক প্রাণের জাগরণ। কিন্তু এঁরা ছাড়া আরেক দল লেখক পাই যাঁদের মধ্যে অনেকে আগে থেকে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে আসতে চেয়েছিলেন। কতকটা প্রতিষ্ঠিত হলেও এঁরা ছিলেন নতুন প্রাণের আকুতি নিয়ে নতুন কবি-পুরুষ। কল্লোলের জন্মের পর তাঁরা হাতের কাছে পেলেন আত্মপ্রকাশের একটা প্রশস্ততর ক্ষেত্র। তাই কল্লোলের সাহিত্যের আসরে এঁদের কণ্ঠধ্বনি সোচ্চার হয়ে উঠলো, প্রকাশোন্মুখ লেখকরা তাঁদের মধ্যে স্বলোকের পথ-প্রদর্শক আলোক দেখতে পেলেন।

কল্লোল প্রকাশের সময়ে যাঁরা ছিলেন কতকটা স্বীকৃত কবিকর্মী তাঁদের প্রায় সকলের কবিতা মণিলাল ও সৌরীন্দ্রমোহনের সম্পাদিত ভারতীর অঙ্কে স্থান পেয়েছিলো। যাঁদের কবিতা ছিলো চারিত্র্যে ও স্বাদে কম-বেশি পরিমাণে রবীন্দ্র-

কাব্যের প্রতিস্পর্ধী তাঁরাও ভারতীকে এড়িয়ে যেতে পারেন নি। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) ছিলেন এক বিরল ব্যতিক্রম। তিনি ভারতীতে একটি কবিতাও লেখেননি। তার একটা কারণ 'মরীচিকার' (১৯২৩) কবিতাগুলিতে তিনি যে বাস্তবগন্ধী দুঃখাত্মকতা ও অমসৃণ রূপপ্রবণতার অবতারণা করেন তা ভারতীর ভাব-চতুর মজলিশে ও 'সুখ সুখ' ধ্বনির খেলায় ঠিক মানানসই বলে বিবেচিত হয় নি। যতীন্দ্রনাথ পরিচিত আবেগের মুখোশ পরে স্বধর্মবিচ্যুত হতে রাজী ছিলেন না, তাই পরদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তির উৎসাহ তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি। অন্যদিকে তাঁর কবিতার তীক্ষ্ণ স্বাতন্ত্র্য যাঁদের মনোহরণ করেছিলো তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মোহিতলাল। তিনিই যতীন্দ্রনাথের দিকে দীনেশরঞ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল থেকে শুনেছি। সম্পাদক মফস্বলে কবিকে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিলেন। কবিও খোঁজ-খবর রাখছিলেন; নতুন পত্রিকার নতুন চারিত্র্য সম্বন্ধে অবহিত থাকছিলেন। অন্তরে এর সঙ্গে সাযুজ্য অনুভব করায় সম্পাদকীয় দপ্তরের অনুরোধে 'অন্ধকার' শীর্ষক কবিতা পাঠালেন, তা ছাপা হলো ১৩৩১ সালের মাঘ সংখ্যায়। তারপর এলো 'রেল-ঘুম' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২)। তরুণরা চমকিত-বিস্মিত হলেন, কারণ অগ্রজের মানসিকতার সঙ্গে তাঁদের রোমান্টিক বিষাদচেতন মানসিকতা খাপ খেয়ে গেছে। যতীন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন কল্লোলের কবি; ১৩৩৬ সালের মাঘ সংখ্যা পর্যন্ত মাঝে মাঝে লিখলেন। তবে একথা ঠিক, মনের যে ধাতু-প্রকৃতি নিয়ে তিনি কল্লোলে এসেছিলেন তা তাঁর স্বোপার্জিত—কল্লোলে প্রকাশিত বিভিন্ন কবিতায় তারই অভিব্যক্তি ঘটেছে, কল্লোলীয়দের সংস্পর্শে তার কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটেনি। সেদিক থেকে তিনি কল্লোলের সৃষ্টি নন। তবে তরুণদের সঙ্গে প্রায় একই ধরনের মানসগঙ্গায় তাঁর অবগাহন ছিলো বলে তিনি তাঁদের কাছে অনুসরণীয় হয়ে উঠেছিলেন। সেই কারণে যতীন্দ্রনাথকে একজন কল্লোলীয় বলতে আমাদের দ্বিধা নেই।

কালিদাস নাগ (১৮৯২-১৯৬৬) কল্লোলের প্রাণ-পুরুষ গোকুলচন্দ্রের অগ্রজ প্রবাসীর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা ও রবীন্দ্রনাথের পার্ষদ্। এই কারণে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে তাঁকে কোনো বিশেষ দলভুক্ত করে দেখালে সত্যের অপলাপ হতে পারে। সংরক্ষণপন্থীদের সঙ্গে নব্যপন্থীদের বিবাদে তিনি নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়েছিলেন, একথা এখানে স্মরণীয়। তবে তিনি ছিলেন বরাবরই প্রগতির পূজারী, প্রাগ্রসর চিন্তার পরিপোষক এবং নূতন জীবনবোধে প্রবুদ্ধ। এই কারণে এবং অনুজের প্রতি স্নেহের জন্যও বটে, তিনি কল্লোলের খুব কাছেই ছিলেন। কল্লোলগোষ্ঠীর সাধনায় যেখানে কুশ্রীতার আতিশয্য নয়—

যৌবনশক্তি ও মানসিক সাহসিকতার সৌন্দর্য—সেখানে তাঁর সমর্থন ছিলো অকুণ্ঠিত। তাই কল্লোলের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩৩০) তিনি দীপঙ্কর ছদ্মনামে 'বসন্ত বিলাপ' কবিতা লিখেছেন, কল্লোলের শেষ সংখ্যায় (পৌষ, ১৩৩৬) সম্পাদক রচনা করেছেন কালিদাস প্রশস্তি। প্রবন্ধে ও অনুবাদে রেঁামা রলাঁর বেদনার বেদ ও জীবনদর্শনকে তরুণ সমাজের কাছে তিনি তুলে ধরেছেন কল্লোলের পৃষ্ঠাতেই। কবিতা, প্রবন্ধ ও অনূদিত উপন্যাস দিয়ে তিনি পত্রিকাটিকে সাহায্য করে গিয়েছেন, তাই ১৩৩৬-এর পৌষ সংখ্যার 'প্রবাহে' কল্লোল সম্পাদক লিখেছিলেন—'১৯২৩ সালে Europe হইতে ফিরিয়া…তিনি কল্লোলের বহুবিধ সাহায্য করিতে থাকেন।…নানাবিধ কাজের ভিতরও কল্লোলের জন্য প্রতিমাসে অনুবাদটি যোগাইয়া যাইতেন।…ডক্টর নাগ কল্লোলের বহু সংগ্রামের দিনে তাঁহার সাহায্য ও সহানুভূতি দিয়া আমাদের অনুপ্রাণিত করিয়াছেন।……তাঁহার দান ব্যক্তিগত জীবনে ও কল্লোলে অপরিশোধ্য হইয়াই থাকুক।' কালিদাস নাগও কল্লোলের তরুণ সম্প্রদায়কে প্রীতির চোখে দেখতেন। তাই ১৩৩২ সালের পৌষ সংখ্যায় 'রলাঁ ও তরুণ বাংলা' প্রবন্ধে বলেছেন—'এই সামান্য পত্রিকাটিকে ঘিরে আজ যে সাহিত্যমণ্ডলী গড়িয়া উঠিতেছে ইঁহাদের…এই প্রয়াসের অন্তরালে একটি শক্তি আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিতেছে।' এই পারস্পরিক হৃদ্যতার জন্যই কালিদাস নাগকে একজন কল্লোলীয় বলে অভিহিত করলে এক অর্থে অন্যায় হবে না।

বাইশ বছর বয়সে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৩০৭) গল্প-লেখক রূপে আত্ম-প্রকাশ করেন প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে (১৩২৯)। তারপর ভারতবর্ষ ও প্রবাসী হয়ে কল্লোলে আসেন। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩৩০) বেরোয় তাঁর গল্প 'মা'। কল্লোলের আসরে তিনি কেমন করে এলেন তার বিবরণ দিচ্ছি তাঁর জবানীতেই—

'কল্লোল তখনও বের হয়নি। নজরুল তখন মজাফ্ফর আহম্মদের কাছে বত্রিশ নম্বর কলেজ ষ্ট্রীটের দোতালায়। পবিত্র আর আমি যাচ্ছি নজরুলের আড্ডায়। পথে গোকুল নাগের সঙ্গে দেখা। গোকুলের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। পবিত্র বললে, আর একজনকে দেখাই চল্। গেলাম পটুয়াটোলায়। দেখলাম, দীনেশ দাশকে। গোকুল আর দীনেশ। দুই শিল্পীবন্ধু তখন 'কল্লোল' বের করবার স্বপ্ন দেখছে। হাতে টাকা নেই।…… পবিত্র বললে, কল্লোলের জন্যে টাকা দিতে পারলাম না। তবে একজন লেখক দিয়ে গেলাম। এই বলে সে আমাকে দেখিয়ে দিলে। পবিত্রর দেওয়া সেই আমিই হলাম কল্লোলের প্রথম লেখক।'

বছর দুই কল্লোলে লেখার পর ১৩৩৩ সালের বৈশাখ মাসে 'কালি-কলম' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটির সঙ্গে তাঁর সাময়িক ছেদ ঘটে। পরে আবার তিনি কল্লোলে ফিরে বেশ কিছু গল্প উপন্যাস লিখেছেন এবং একজন যথার্থ কল্লোলীয় হয়ে উঠেছেন। তিনি কল্লোলকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, কল্লোলও তাঁকে দিয়েছে প্রতিষ্ঠা।

নজরুলের (১৩০৬) কবিতার প্রথম যথার্থ প্রকাশ প্রবাসীতে (পৌষ, ১৩২৬)। তারপর মোসলেম ভারত, ধূমকেতু প্রভৃতি হয়ে তিনি আসেন কল্লোলের প্রথমবর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০)। কল্লোলের সঙ্গে তাঁর এই যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন বন্ধুদ্বয় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। তারপর থেকে কল্লোলের অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর একজন হয়ে ওঠেন নজরুল; তাঁর কবিতা ও গান হয়ে ওঠে বাংলা সাহিত্যের পাঠক সমাজের অন্যতম আকর্ষণ। পত্রিকাটির আগের সংখ্যায় প্রচ্ছদ-পটে ঘোষিত হতো পরবর্তী সংখ্যায় নজরুলের কোন কবিতা বা গান প্রকাশিত হবে। শত্রুপক্ষ ও সংরক্ষণ পন্থীরা তাঁকে কল্লোলের অন্যতম নায়ক ধরে নিয়ে তাঁর উদ্দেশে নিক্ষেপ করতেন বিদ্রূপের সুতীক্ষ্ণ শায়ক। কিন্তু সমস্ত আক্রমণ সত্ত্বেও তিনি লিখে গেছেন পত্রিকাটির সপ্তমবর্ষ পঞ্চম সংখ্যা (ভাদ্র, ১৩৩৬) পর্যন্ত। আর এই কারণে নজরুল কল্লোলের কবি বলেও পরিচিত।

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) ১৩৩০ -এ 'ভারতী' ছাড়লেন, এলেন কল্লোলে। সে সময় মোহিতলালের বাদুড় বাগান লেনের মেসে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় নজরুল ইসলামের,—সেই পরিচয়ের সূত্র ছিলো ১৩২৭ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত মোহিতলালের একটি চিঠি। তাতে তিনি কাজীর কবিতার প্রশংসা করেছিলেন। নজরুলের কবি-জীবনের এক প্রচণ্ড সম্ভাবনা দেখে তাঁর কাব্যকৃতিকে কলাসম্মত শাসনে সংযত সুন্দর করবার অভিপ্রায়ে মোহিতলাল তাঁর গুরুর আসন নেন। গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ যখন মধুর, তখন নজরুলই মোহিতলাল-কে নিয়ে আসেন কল্লোলে। তিনি তরুণতমদের চোখে যৌবনের রাজসাজে রাজসিক হয়ে উঠেছেন ততদিনে—তাই কল্লোলে তাঁর আবির্ভাবকে সশ্রদ্ধভাবে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন তরুণরা। তিনি তাঁদের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন—ছন্দঝংকারে কবি-প্রাণের আকুতির সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে তাঁদের কাব্যমন্ত্রে দীক্ষিত করতে চাইতেন। কিন্তু তিনি কল্লোলে ছিলেন মাত্র বছর খানেক (১৩৩০-৩১), দলে থাকতে কিছু না লিখলেও দল ছাড়া হয়ে লিখলেন দুটি কবিতা—'পান্থ' ও 'প্রেতপুরী'। কল্লোলগোষ্ঠীর কয়েকজন যখন স্বতন্ত্র হয়ে বার করলেন 'কালি-কলম' তখন তিনি তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন বছর দুই (১৩৩৩-৩৪) এবং তাতে মোট সতেরটি রচনা প্রকাশ করেছিলেন।

একদিন কান্তিচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে ফোর আর্টস ক্লাবে গিয়ে দীনেশরঞ্জন, গোকুলচন্দ্র ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৩০০) সেই পরিচয় ক্রমে পরিণত হয় বন্ধুত্বে। সেই বন্ধুত্বের ডাকেই এবং জীবনের পবিত্র প্রবাহে ভাসতে ভাসতেই তিনি সবুজপত্র থেকে এসে পৌছলেন কল্লোলের ঘাটে। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লেখার লেখক ততটা নন যতটা লেখকের লেখক। তারাশঙ্করের ভাষায়—'পবিত্রবাবু শুধু তাঁর নিজের কীর্তিতেই নয়, বহু কীর্তিমানের মধ্যে জীবিত থাকবেন। বহুজনকে তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে এনেছেন। আমাকেও তিনি কল্লোল থেকে প্রথম পত্র লিখে সাহিত্যক্ষেত্রে আহ্বান জানিয়েছিলেন—একথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে চিরদিন স্মরণ করি আমি।'[২৭] নজরুল, তারাশঙ্কর ছাড়া শৈলজানন্দ, বনফুল, অখিল নিয়োগী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ইত্যাদি কত খ্যাত ও অখ্যাত লেখককে নিয়ে এসেছেন কল্লোলের ধ্বনিতে কণ্ঠ মেলাবার সুযোগ দিয়ে। তিনি চির-নবীন বলেই কল্লোলের শ্যামল বীথিকায় রৌদ্রস্নান করতে এগিয়ে এসেছেন প্রায় প্রথমেই (বৈশাখ, ১৩৩০)—অনুবাদ করেছেন, নাটিকা ও প্রবন্ধ লিখেছেন, গল্প ফেঁদেছেন, সম্পাদনায় সাহায্য করেছেন। সংখ্যায় তাঁর রচনা বেশি নয়, তবু তিনি কল্লোলের সপ্রাণ প্রাণবন্ধু।

কল্লোলের আরেকজন তরুণ লেখক হচ্ছেন ভূপতি চৌধুরী (১৯০৩)। তিনি ছিলেন অন্তরঙ্গদের একজন—আড্ডা ও সাহিত্যের আসর উভয় ক্ষেত্রেই। তাঁর দীনেশরঞ্জন ও গোকুলচন্দ্রের সঙ্গে আলাপের ও কল্লোলীয় হওয়ার বিবরণ তাঁর কাছ থেকেই জানা গেছে—'বসন্তের এক অপরাহ্নে পরিচিত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা মানিকতলা ষ্ট্রিটের ওপর। তাঁর সঙ্গে এক বন্ধু, আমার অপরিচিত, কিন্তু মুখখানা যেন চেনা। পরিচয়ের প্রথম ধাপেই নাম জানা গেল—গোকুলচন্দ্র নাগ। হেসে বললাম—মুখটা আপনার চেনা মনে হচ্ছিল—"বাঁদির প্রাণ" ছবিতে আপনাকে দেখেছি। আর ভারতীতে ফুটকিওয়ালা যে গল্প বেরিয়েছে তাতো আপনারই লেখা! গোকুলবাবু মৃদু হাসলেন, বললেন—এই বৈশাখ থেকেই আমরা একটা কাগজ বার কচ্ছি—কল্লোল। আসুন না একদিন আমাদের ওখানে।... বলা বাহুল্য অপর পরিচিত ভদ্রলোক—দীনেশরঞ্জন দাশ, আমার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় এক সখের অভিনয়ের আসরে, প্রায় মাসখানেক আগে।' ভূপতি চৌধুরী এর দিন দুয়েক পরে যে কল্লোলের রাজ্যে ঢুকলেন অরে বেরিয়ে এলেন না। সাত আট বছর ধরে (১৩২৯-১৩৩৬) আড্ডা দিলেন, গল্প ও কথিকা জাতীয় রচনা লিখলেন। কল্লোলের সঙ্গে তাঁর সেই বন্ধুত্বের যোগ, যে-যোগে ইষ্টকে আর দশ জনের সঙ্গে সমানভাবে পেতে হয়। লেখক হিসেবে তাঁর প্রথম আবির্ভাব ১৯২০ সালের

ভারতীতে, তিনি সবচেয়ে বেশি লিখেছেন ভারতবর্ষে, প্রবাসী ও সারথিও তাঁর লেখার ক্ষেত্র ছিলো—তবু কল্লোলেই তিনি অধিকতর স্মরণীয় হয়ে আছেন গল্পকারের স্ফুটমান সম্ভাবনা নিয়ে।

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮) ঢাকাগোষ্ঠীর তরুণ লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে নিশ্চিত। ভাবতে অবাক লাগে তাঁর কবিতা কলকাতায় প্রথম বেরিয়েছিলো প্রগতি-বিরোধী কাগজ বলে বিবেচিত 'নারায়ণে'র ১৩২৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যায়। ১৯২৫ সালে বেরোয় তাঁর প্রথম কবিতার বই 'মর্মবাণী' (১৯২৫)। তখন পর্যন্ত তিনি কল্লোলের লেখক হন নি, অথচ কল্লোল (আষাঢ়, ১৩৩২) 'ডাকঘরে' লিখেছিলো—'শ্রীবুদ্ধদেব বসুর কিছু কিছু লেখা বোধ হয় আজকাল পত্রিকায় পড়ছ। মর্মবাণীর কবিতা সংগ্রহে এই কিশোর কবির শক্তির বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। বয়সের তারুণ্য মনে না রেখে বইখানা পড়ে দেখো।··· ভাল কবিতা যে মানুষের অপূর্ব সৃষ্টি, ধ্যান-লোকের নিবিড় প্রকাশ, তা আজকালকার অনেক নবীন কবির রচনা পড়ে অনুভব করা যায়।' কয়েক মাস পরে গোকুলচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষ্যে 'যৌবন-পথিক' নামে কবিতা লিখে ডাকে পাঠালেন বুদ্ধদেব, বেরুলো ১৩৩২-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায়, গোকুলচন্দ্রের স্মৃতিকে বন্দনা করে কল্লোলের লেখক হয়ে গেলেন বুদ্ধদেব। এ-কথা স্মরণ করেই বর্ষশেষে চৈত্র সংখ্যায় সম্পাদক লিখেছিলেন,—কল্লোলের তৃতীয় বৎসরে কয়েকজন লেখককে বিশেষ করে পাওয়া গেছে। তাঁদের প্রতিভা জয়যুক্ত হউক বলে কামনাও করেছে কল্লোল। সেই নতুন লেখকদের নামের তালিকায় অন্যান্যের মধ্যে পাই বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত ও জীবনানন্দ দাশের কথা। এর কিছুদিনের মধ্যেই এক ছুটিতে বুদ্ধদেব কল্লোলের আড্ডায় কম্পিত বক্ষে প্রবেশ করেছিলেন।[২৮] সেই যে কল্লোলের ঘাটে এসে ভিড়লেন সাত বছরের মধ্যে আর নোঙর তুললেন না। তারপর মাসে মাসেই গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেছেন—সেখানেই খ্যাতির প্রথম সোপান অতিক্রম করেছেন তৃতীয় দশকের আরও কয়েকজন যুবক সাহিত্যকর্মীর মতো। কল্লোল তাঁকে দিয়েছে অবলম্বন, তিনি কল্লোলকে দিয়েছেন বিশেষ চারিত্র্য।

আর তেরশ' বত্রিশ সালেই এলেন যুবনাশ্ব ওরফে মণীশ ঘটক (১৯০১)। প্রেসী-ডেন্সী কলেজে পড়বার সময় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিলো কল্লোল গোষ্ঠীর সঙ্গে সেই সহপাঠি বিজয় সেনগুপ্তের মাধ্যমে—যাঁকে আমৃত্যু দেখা গেছে পত্রিকাটির আড্ডায় ও লেখার আসরে। তিনি 'গোষ্পদ' নিয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন ১৩৩১-এর পৌষ সংখ্যা কল্লোলে। গল্পের অতি বাস্তবতা ও কবিতার উষ্ণ প্রেম-ভাবনা নিয়ে তিনি কল্লোলে নিষ্ঠার সঙ্গে এনেছেন একটা নতুন ডাইমেনশন—তাঁর বিরুদ্ধে শনিবারের চিঠির খড়্গ উদ্যত হয়েছে মাঝে মাঝে, কিন্তু তিনি স্বখাত বর্জন

করেন নি।

এই মণীশ ঘটকই কল্লোলে ডেকে আনলেন কবি অজিত দত্তকে (১৯০৭), যিনি ঢাকা গোষ্ঠীর অন্যান্যের মতো দূর থেকে কল্লোল-প্রেমের মুগ্ধ প্রহর গুণে চলেছিলেন। হাতে-লেখা 'প্রগতি'তে তিনি অজিত দত্তের একটি গল্প পড়ে চমৎকৃত হলেন, তাঁকে সানন্দ আমন্ত্রণ জানালেন কল্লোলের নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্রে। আমন্ত্রিতের স্বক্ষেত্র ছিলো কবিতা—সেই কবিতাই ডাকে পাঠিয়েছিলেন এবং তা ছাপা হলো ১৩৩২ সালের অগ্রহায়ণের গোকুল-স্মৃতি-সংখ্যায়। সেই প্রথম 'নিকশ কালো আকাশ তলে' এসে দাঁড়ালেন। প্রথম কবিতা বেরুবার পর কোনো এক ছোটোখাটো ছুটিতে কল্লোলে এসে সশরীরে হাজির হলেন[২৯] এবং তারপর থেকে অনেক লিখলেন ও আড্ডা দিলেন,সবশেষে ১৩৩৫ সালের মাঘ সংখ্যায়'গৌরবান্বিত' হয়ে বিদায় নিলেন। ততদিনে কল্লোলের (এবং মুদ্রিত 'প্রগতি'র) কবি বলে তিনি বাংলা দেশে চিহ্নিত হয়ে গেছেন। আর এঁদেরই আরেক সংগী অমলেন্দু বসু (বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রাধ্যাপক ও অধ্যক্ষ) প্রথম থেকে কল্লোলের ভক্তগোষ্ঠীর একজন হলেও গল্প লেখকরূপে কল্লোলে প্রবেশ করেন এক বছর পরে—১৩৩৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। সেই গল্পটির নাম 'পতি'। চিন্তনধর্মে ও রচনাকর্মে পুরোপুরি আধুনিক অমলেন্দু বসু (১৯০৮) পত্রিকাটিতে লিখেছেন খুবই কম, তবু তাঁর সামান্য সংখ্যক গল্প-প্রবন্ধ বিচারবুদ্ধি ও মনোভঙ্গির উজ্জ্বলতায় আজও চিত্তাকর্ষক হয়ে আছে। তাঁর একটি প্রবন্ধ 'অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য' (আষাঢ়, ১৩৩৪) সমধর্মাদের পক্ষ থেকে প্রচারিত এক চাঞ্চল্যকর ম্যানিফেস্টো।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (১৯০৩) কথা যেখানেই বলা হোক না কেন কল্লোলের সবুজ মিছিলে তিনি এক বলদৃপ্ত শক্তি। তাঁর প্রথম লেখা (কয়েকটি কবিতা নীহারিকা দেবীর ছদ্মনামে ১৩২৮-২৯ সালের প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়) কল্লোলে প্রকাশিত হয় নি, কিন্তু তিনি যথার্থভাবে কল্লোলেই প্রকাশিত হয়েছেন। বন্ধু সুবোধ দাশগুপ্তের সঙ্গী হয়ে তিনি কল্লোলে এসে পৌছেছিলেন। ১৩৩১ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো তাঁর গল্প 'গুমোট,' ১৩৩৬ সালের পৌষে শেষ সংখ্যায় সন্ধ্যাদীপের শিখার মতো জ্বলে উঠেছিলো তাঁর কবিতা 'সঙ্কেতময়ী'। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী কাল তাঁর পক্ষে অজস্র সৃষ্টি ও অক্লান্ত সংগ্রামের কাল। তিনি দুই হাতে গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেছেন। সাহিত্যের স্বাস্থ্য রক্ষার নামে বিরোধীরা সোরগোল তুলে উপহার দিয়েছেন নিন্দার বিষ, রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে মিলেছে নিন্দা প্রশংসা দুই-ই। তবু তিনি কখনও ক্লান্ত

হন নি; কল্লোলের স্রোতাবর্তে নিত্য-অবগাহন করে থেকে থেকে জ্বলে উঠেছেন নূতনতর দীপ্তিতে। কল্লোল তাঁকে দিয়েছে সাহিত্যিকের মান, তিনি কল্লোলকে দিয়েছেন ঘনিষ্ঠ প্রাণ।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪) কল্লোলের এক প্রজ্বলন্ত প্রাণকথা। অচিন্ত্যকুমার তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন গোকুলচন্দ্রের সঙ্গে। আর সেই পরিচয় সূত্র ধরেই তিনি প্রবেশ করেছিলেন কল্লোলের পৃষ্ঠায় লেখক রূপে। ১৩৩১ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রথম বের হয় তাঁর গল্প 'সংক্রান্তি' তারপর থেকে সাহিত্যের তিন বন্ধে—গল্প, উপন্যাস ও কবিতায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন সমর্পিতপ্রাণ। কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির ফলে কিছুদিনের জন্য সরে গিয়েছিলেন 'কালি-কলমের' ভিন্নতর ক্ষেত্রে কিন্তু যেখানেই থাকুন কল্লোলের দিকে কান পেতেই ছিলেন, তাই অন্তরের ভালোবাসার টানে আরেক দিন ফিরে এসেছিলেন কল্লোলিত প্রবাহের দিকে, সব মিলিয়ে তাঁকে মনে হয় এক সংহত উজ্জ্বল নক্ষত্র যা কল্লোলের পৃষ্ঠায় সৃষ্টির সত্য হিসেবেই ছড়িয়েছে আলো, স্নিগ্ধতা, তিমির ও জ্বালা। প্রেমেন্দ্র মিত্র নিঃসন্দেহে কল্লোলের অগ্রনায়কদের অন্যতম।

তেমনি ছিলেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (?—১৩৬৩)। এক আশ্চর্য প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে নজরুল ও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মাধ্যমে তিনি এসেছিলেন কল্লোলের আড্ডায় ও সৃজনক্ষেত্রে। বিশ্বসাহিত্য মন্থন করে তিনি নিত্য সুধা আহরণ করতেন, আর উন্মাদের মতো সেই সুধার স্রোত টেনে আনতে চাইতেন বাংলা সাহিত্যের প্রাদেশিক ভূগোলের মধ্যে। প্রাণে তাঁর একদিকে যৌবনের উদ্দামতা, অন্যদিকে সন্ন্যাসীর নির্লিপ্ততা। 'কাহিনী' নামের আড়ালে ঝকঝকে সাহিত্যচিন্তার উড়নি উড়িয়ে কল্লোলে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৩৩০ সালের ফাল্গুন সংখ্যায়, শেষ বিদায় ১৩৩৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যায়। কখনও কল্লোল সম্বন্ধে তাঁর আকর্ষণ বিচলিত হয়নি—অনেকেই 'কালি-কলমের' মায়া এড়াতে পারেন নি, কিন্তু তিনি কখনও তার চৌকাঠ পর্যন্ত মাড়ান নি। তিনি মুখ্যত বিদেশী সাহিত্যিক ও সাহিত্যিকের পরিচয় লিখতেন, সময় সময় লিখতেন দেশীয় সাহিতিক ও সাহিত্যের কথা, বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদেও তাঁর মনোযোগ দেখা গেছে। মোটকথা, কল্লোলকে একটা আধুনিক ও বিশ্বগত রূপ দেওয়ার কাজে তিনি ছিলেন নিরলস। সেদিক থেকে তাঁকে একজন নিষ্ঠাবান কল্লোলীয় বলা যেতে পারে।

কল্লোলের প্রথম বর্ষ থেকে শেষ বর্ষ পর্যন্ত যখন সুযোগ পেয়েছেন লিখে গেছেন, এমন একজন লেখক হচ্ছেন প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৭)। তিনি অবশ্য আড্ডায় এসছেন অনেক পরে। তিনি মানুষের খোলা শরীর ও মনের গল্পকার; খোলা

আর্বত ও স্বচ্ছ জল উভয় ক্ষেত্রেই অবলীলাক্রমে অবগাহন করার সাহস নিয়ে কল্লোলে তাঁর আবির্ভাব। যে আগুন নিয়ে খেলেছেন কল্লোলের অনেক গল্পকার, সেই আগুন নিয়েও ইনি খেলেছেন। অথচ মাঝে মাঝে তাঁর মধ্যে দেখা গেছে একটা উদাসীন চলতি হাওয়ার বেগ। সব মিলিয়ে দেখলে মনে হয় প্রবোধকুমার কল্লোলের অবিচ্ছেদ্য একজন। কথাসাহিত্যে এক উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি বহন করে কল্লোলে প্রথম আবির্ভূত হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮—১৯৭১)—কপালে 'রসকলি'র (ফাল্গুন ১৩৩৪) ছাপ নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তরুণদের সমাজে হলেন সম্বর্ধিত। তিনি অবশ্য লিখলেন সামান্যই—তিনটি গল্প ও একটি কবিতা মাত্র। কিন্তু একদিন কল্লোলের আড্ডায় এসে কতকটা নিরাশ হলেন—তাঁর মাটির সঙ্গে সংলগ্ন জীবনের প্রাণ-পিপাসা অচরিতার্থ রয়ে গেলো। কল্লোলগোষ্ঠী সাহিত্যের কল্পক্ষেত্রে যতই গ্রামবাংলাকে নিয়ে ঘর করুক না কেন, তাঁদের ছিলো বুদ্ধিবিলাসী পরিবর্তনমুখী শহুরে মন এবং সেই মনেরই ব্যায়াম-কৌশলে আড্ডায় রসায়ন ঘটতো। তার সঙ্গে তারাশঙ্করের মাটি-ঘেঁষা মনের স্থিতিস্থাপকতা মিলবে কেন? কিন্তু কল্লোলের ধ্বনি কলরোলে বরাবরই একটা গ্রামীণ সুর ছিলো বলে সাহিত্যের সৃজনক্ষেত্রে তারাশঙ্করের মৃণ্ময় পুরুষার্থ কল্লোলীয় সত্য বলে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে। তারাশঙ্কর নিজে আমৃত্যু কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন কল্লোলের প্রথম অভ্যর্থনার কথা। বীরভূমের তারাশঙ্করের মতোই বীরভূম-সংলগ্ন মুর্শিদাবাদের সরোজকুমার রায় চৌধুরীকে (১৯০২-১৯৭২) গল্পকার হিসাবে প্রথম আবিষ্কার করার গৌরব কল্লোলের প্রাপ্য। তাঁর প্রথম গল্প 'দুনিয়াদারি' বের হয়েছিল ষষ্ঠ বর্ষে (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫)। তাঁকে কল্লোলে আনেন প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং সে আনাটা কল্লোল ও বাংলা সাহিত্যের দিক থেকে ব্যর্থ হয়নি।

জীবনানন্দ (১৮৯৯-১৯৫৪) 'দাশগুপ্ত' পদবী নিয়ে কল্লোলে প্রথম আসেন এবং সেখানে থাকতে থাকতেই 'গুপ্ত'টুকু বর্জন করেন। পত্রিকাটিতে তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'নীলিমা' (ফাল্গুন, ১৩৩২), শেষ কবিতা 'পাখীরা' (বৈশাখ, ১৩৩৬)। তাঁর কবিতার যে রূপ, রস ও রং আজকের দিনে আমাদের কাছে পরিস্ফুট, তার প্রথম আভাস কল্লোলের (এবং প্রগতির) কবিতায় দেখা গেছে। তিনি এখানে নিজের পথ ধরবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু সিদ্ধি তখনও পুরোপুরি আসেনি। তাঁর স্ব-স্থিত হওয়ার সেই প্রক্রিয়ায় কল্লোলের অবারিত আশ্রয়ের ঐতিহাসিক প্রয়োজন নিশ্চয়ই ছিলো। আর তাঁর অতীতমুখিন ও প্রকৃতিগভীর চেতনার ধূসরাভ রং লেগেছিলো বলে কল্লোলিত ঢেউয়ে এক আশ্চর্য নির্জন মুখ আমরা দেখতে পেয়েছি। কল্লোল কর্তৃপক্ষ জীবনানন্দের কবিতা ছাপলেও তাঁর

কবিতা বেশি পছন্দ করতেন না,[৩০] কবিও আপন শিল্পিত স্বভাবে পত্রিকাটির জন্য কোনো স্পন্দন অনুভব করেন নি—এমন একটা প্রচারণা আছে। কিন্তু লিখিত সাক্ষ্যে দেখছি তিনি বিশ্বাস করতেন, উত্তরবৈবিক যুগ কল্লোলের সময় থেকে আরম্ভ হয়েছে।[৩১] আর কল্লোল (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪) তাঁর 'ঝরা পালকে'র সমালোচনায় লিখেছিলো—'কয়েক বৎসরের মধ্যেই শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত কাব্যসাহিত্যে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তরুণ কবির সমস্ত কবিতাতেই তারুণ্যের উল্লাস ধ্বনিত। তাঁর ছন্দ ভাষা ভাব সবেতেই বেশ বেগ আছে। ত্রুটি যা-কিছু আছে তা কখন কখন সেই বেগের আতিশয্য। নজরুল, মোহিতলালের প্রভাব তিনি এড়াতে পারেননি বটে কিন্তু সে প্রভাবকে নিজের বৈশিষ্ট্যের পথে ফেরাতে পেরেছেন বলে মনে হয়।' সুতরাং কল্লোল ও জীবনানন্দ উভয়ে উভয়ের।

প্রবাসীতে অন্নদাশঙ্কর রায়ের (১৯০৪) লেখক জীবনের শুরু, বিচিত্রায় প্রতিষ্ঠা —মধ্যে কল্লোল ও কালি-কলমের কালে তার মানসিক প্রস্তুতি। কালি-কলমের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত দরদ ও কৃতজ্ঞতার ঋণ তিনি স্বীকার করেছেন ১৯২৯ সালে। কিন্তু নিহিতার্থে তা সমগ্র কল্লোলের কাল সম্বন্ধেই তাঁর অনুরাগ ও সচেতনতার প্রমাণ, কারণ কালি-কলম কল্লোলবৃত্তের বহির্ভূত নয়। তিনি তখনকার দিনে নতুন কিছু লিখতে গিয়ে বিচিত্রা ও কালি-কলমের সঙ্গে কল্লোলের কথা মনে রেখেছিলেন,[৩২] য়ুরোপের বিশেষ করে পারির মানসিক খোলা হাওয়ায় কল্লোলের দলকে দেখতে চেয়েছিলেন তাঁদের নতুন জীবনায়নের জন্যই। আসল কথা, নিজের ও বাংলা সাহিত্যের দিক থেকে কল্লোলের কাল তাঁর কাছে অনেক অর্থ বহন করে এনেছিলো। তাই পত্রিকাটির প্রাবন্ধিক ও কবির দলে তাঁকেও আমরা পাই। তিনি লিখেছেন ছোটো কবিতা এবং শেষ বছরে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ, তবু মানসিক দিক থেকে কল্লোলের নগণ্য এক লেখক মাত্র ছিলেন না। এই সঙ্গে আরও দুজন —অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১) ও বিষ্ণু দে'র (১৯০৯) কথা মনে পড়ে, তাঁরাও কল্লোলে না লিখে পারেন নি। এবং তার কারণ ছিলো এই যে, কল্লোল ছিলো তখনকার দিনের তরুণদের আত্মপ্রকাশের এক অবারিত ক্ষেত্র। এই দুজনেই পরবর্তী বাংলা কাব্যের যে দুই দিগন্ত জয় করেছেন, তার উপোদ্‌ঘাতে কল্লোলের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। অমিয়চন্দ্রের মা অনিন্দিতা দেবীও লিখতেন কল্লোলে, একই সঙ্গে একই ক্ষেত্রে দুই পুরুষের এমন মিলনের দৃষ্টান্ত খুব বেশি নেই। বিষ্ণু দে অল্প লিখলেও কবিতা, প্রবন্ধ ও অনুবাদের ত্রিবিধ ধারাতেই হস্তক্ষেপ করতে এগিয়ে গেছেন। কল্লোলের আরেক কবি হেমচন্দ্র বাগচী (১৯০৪) অনেক সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু 'দীপান্বিতায়' দীপ জালিয়েই তিনি অসুস্থতার জন্য

সরে গেলেন। কিন্তু তাঁর কল্লোলের কবিতাগুলি আজও বন্ধুজন ও রসিকজনের কাছে আদরণীয় হয়ে আছে। ভবানী মুখোপাধ্যায় (১৩১৬) তাঁর কচি মনের সবুজ তৃণাঙ্কুর নিয়ে, জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) তাঁর যৌবনদীপ্ত দেহমনের সাহস ছড়িয়ে, জসিমউদ্দিন (১৯০৩) ও মনোজ বসু (১৯০৩) বাংলার মাটির নতুন গান শুনিয়ে, প্রমথনাথ বিশী (১৯০২) ও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯) তরুণ মনের ফসল ফলিয়ে কল্লোলের পৃষ্ঠাতেই আত্মোৎকর্ষের মহড়া দিয়েছেন।

এঁরা ছাড়া আরও যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৮), অমরেন্দ্র ঘোষ (১৯০৬-১৯৬০ ?), জগৎ মিত্র, পরিমল গোস্বামী (১৮৯৯), ভবানী ভট্টাচার্য, শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৫), মণীন্দ্রলাল বসু (১৮৯৭), সুনির্মল বসু (১৯০২-১৯৫৭), প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় (?-১৯৭১) ইত্যাদি বিশেষভাবে স্মরণীয়। সুকুমার ভাদুড়ী, বিজয় সেনগুপ্ত ও সুবোধ দাশগুপ্ত বিশেষ সম্ভাবনা নিয়ে কল্লোলের আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রথম দুজন অকালে পরলোকগমন করায় কল্লোল প্রবন্ধে ও কবিতায় গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ করেছিলো, শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলো নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কানপুর অধিবেশন (১৩৩৩)। এঁরা কল্লোলের কলহংস রূপে নতুন যুগের সাহিত্য-ইতিহাসের সহযাত্রী।

কল্লোলের লেখক-তালিকায় কিছু মহিলার নাম পাই। তাঁদের মধ্যে রাধারাণী দেবী (১৯০৭) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন। শ্লীলতা ও অশ্লীলতা নিয়ে বিচিত্রা ভবনে যে সভা হয়েছিলো তাতে নব্যপন্থীদের নেতৃত্ব দিয়ে তিনি নিজের যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছেন। অপরাজিতা দেবীর ছদ্মনামে 'বুকের বীণা' (১৯৩০) লিখে তিনি যে দুঃসাহস ও আত্মদর্পিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিলো কল্লোলের কাছে। তিনি এখানে গল্প কবিতা প্রবন্ধ লিখেছেন সামান্য সংখ্যক, তবু কল্লোলের সঙ্গে তাঁর যোগ সুদৃঢ়। ফোর আর্টস ক্লাবের আমল থেকে কল্লোলগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিলো সুলেখিকা সীতা দেবীর (১৮৯৫) তাই পত্রিকাটিতে তিনিও না লিখে পারেন নি। কবি সুধীরকুমার চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহের সানন্দ ঘোষণা ছিলো কল্লোলের পৃষ্ঠায়। তবে সুধীরকুমারের মতো তাঁকেও পুরোপুরি কল্লোলীয় বলে দাবি করা ঠিক হবে না, এঁরা মুখ্যত প্রবাসীর লেখক-লেখিকা। শান্তা দেবীর (১৮৯৪) সঙ্গে কল্লোলের সংযোগ পারিবারিক, স্বামী কালিদাস নাগ ও দেবর গোকুলচন্দ্রের নাগের সূত্রে তিনিও এর ভালোমন্দের অংশীদার ছিলেন। রোমঁ্যা রলাঁর জঁা ক্রিসতফের

অনুবাদে স্বামীর সঙ্গে সহযোগিতা করে তিনি এক মহৎ সাহিত্যিক কর্তব্য সম্পন্ন করেছেন। তিনি ফরাসী ভাষা কিছুটা জানতেন যদিও ইংরেজী থেকেই জঁা ক্রিস্তফের এক কিস্তি মাত্র তিনি নিজে পুরোপুরি অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর একটি গল্পও কল্লোলের ১৩৩১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় এবং একটি প্রবন্ধ ১৩৩৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় দেখতে পাই। মনে রাখতে হবে, জঁা ক্রিস্তফ্ কল্লোলের তরুণ লেখকদের কাছে গীতা হয়ে উঠেছিলো। ডায়োসেশন থেকে ইংরেজী অনার্সের গ্রাজুয়েট ও সর্ববিদ্যাপটিয়সী সুনীতি দেবী (:৮৯৬) ছিলেন ফোর আর্টস ক্লাব ও কল্লোলের অন্যতম স্তম্ভ। সেকালে নানা পত্র-পত্রিকায়, বিশেষ করে প্রবাসীতে কবিতা লিখেছেন; কিন্তু কল্লোলে তিনি কবিতার চেয়ে গল্প ও কথিকা জাতীয় রচনা লিখেছেন অনেক বেশি। প্রথম দিকে প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই তাঁর গল্প থাকতো—তাঁর ভাবুকতা ছোট্ট ছোট্ট লেখায় ফুটে উঠতো। এ থেকে বোঝা যায়, কল্লোলের কর্তৃপক্ষ ও পাঠকদের কাছে তিনি কতটা আদরণীয়া হয়ে উঠেছিলেন।

অকাল-পরলোকগতা নীলিমা বসু (?—১৩৩৩) ছিলেন কল্লোলের আর একজন সমাদৃতা লেখিকা। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন কল্লোলের বন্ধু ও লেখক এবং কালি-কলমের অন্যতম সম্পাদক মুরলীধর বসুর স্ত্রী। কল্লোলের প্রথম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যাতে তাঁর একটি কথিকা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। তিনি গল্প লিখতেন। তাঁর মৃত্যুর পর সম্পাদক তাঁর কল্লোল প্রবেশের এক মনোজ্ঞ বিবরণ দেন—"কিছুকাল পূর্বে, কল্লোল-এর প্রথম অবস্থায় বুকপোষ্টে একটি গল্প পাই; তার সঙ্গে একখানা চিঠি। লেখিকা চিঠিতে জানিয়েছেন, লেখার দিকে তাঁর খুব ঝোঁক।··· আমি আর গোকুল লেখাটি পড়লাম। লেখার ভঙ্গী ও সংযম আমাদের মুগ্ধ করল আমরা তাঁকে উৎসাহ দিয়ে একখানা চিঠি দিলাম,···বুড়ো-ঝি প্রভৃতি গল্পগুলি পড়ে তখন থেকেই মনে হয়েছিল, এই অজ্ঞাত লেখিকা সাহিত্য ক্ষেত্রে একটি বিশেষত্ব নিয়ে প্রবেশ করেছেন।···উৎসাহ পেয়ে তাঁর গল্পগুলি ক্রমে ক্রমে আরও ভাল হতে লাগল। সে দিকে তাঁর চেষ্টাও ছিল। পর পর কয়েকটি গল্প কল্লোলে প্রকাশিত হোল। তখন লক্ষ্য করতাম, মাত্র প্রচারের দিকেই তাঁর লক্ষ্য নয়, লেখার ভিতর তাঁর দরদ ও সাহিত্যের জন্য তাঁর অন্তরের প্রীতি গোপন সাধনার বেশেই ধরা দিয়েছে। তিনি লিখেছেন খুব অল্প।···কল্লোলে প্রকাশিত "ঝরা ফুল" কালি কলমে প্রকাশিত "গোপনধারা" যাঁরা পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লেখিকার অন্তর্দৃষ্টি, সংযম ও প্রকাশভঙ্গির নিপুণতা লক্ষ্য করেছেন।'[৩৩] 'অশোকা' ও 'শতদল' কাব্য গ্রন্থ এবং 'কাহিনী' ও 'ফুলদানী' গল্পগ্রন্থের পরিচিতা লেখিকা

সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫-১৯২৬) কল্লোলে গল্প লিখেছিলেন। লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম বাংলা সাহিত্যের মনোযোগী পাঠকের কাছে অজানা নয়। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে পত্রালাপ ও পরিচয়ের সূত্রে তিনি আজীবন সাহিত্য-সান্নিধ্য লাভ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি কল্লোলে কয়েকটি কথিকা ও গল্প লিখেছেন। নৃসিংহদাসী দেবী ছিলেন কল্লোলের প্রথম দিকে প্রায় নিয়মিত গল্প-লেখিকা। তিনি তাঁর নাম ও লেখা উভয়ের গুণেই কল্লোল কর্তৃপক্ষ ও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ডাকযোগে তাঁর গল্প আসতো, তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ কারো ছিল না। তবে সদলবলে কল্লোলীয়রা যখন তাঁর বাড়িতে গেলেন তখন দেখা গেলো তিনি আধুনিকা যুবতী নন, এক মধ্যবয়স্কা সালঙ্কৃতা শ্রীরামপুরের জমিদার-বধূ। অথচ তাঁর গল্পে এক সাহসিকা লেখিকারই পরিচয় ফুটে উঠতো। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মহারাজা প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর ও ব্যারিষ্টার অবনী ব্যানার্জির আত্মীয়া ছিলেন বলে শুনেছি।

এঁদের মধ্যে রাধারাণী দেবী, নীলিমা বসু, নৃসিংহদাসী দেবী এবং সুনীতি দেবী যথার্থভাবে কল্লোলীয় হবার দাবী করতে পারেন।

এঁরা ছাড়া কল্লোলের লেখিকা-তালিকায় আর যাঁদের নাম পাই তাঁরা প্রায় অজ্ঞাতনামা। এঁদের মধ্যে 'মর্মস্মৃতি', 'ঝরাপাতা' ও 'আহুতি' গল্পগ্রন্থের লেখিকা সুরুচিবালা রায় আমাদের পরিচিতা ; কবি অমিয় চক্রবর্তীর মা অনিন্দিতা দেবী সাহিত্যরুচিসম্পন্না মহিলা হিসাবে আমাদের অপরিচিতা নন। এই নামমালার মধ্যে কোনো কোনোটি ছদ্মনাম—নারী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীর লেখকেরই।

প্রশ্ন উঠবে, কল্লোলের পৃষ্ঠায় এত লেখিকার রচনা প্রকাশ করা হয়েছিলো কেন ? সে কি লেখার গুণের জন্য না অন্য কোনো কারণে ? সত্য বটে, কোনো কোনো লেখিকার রচনার শিল্পোৎকর্ষের একটা অনতিস্ফুট আভাস ছিলো এবং যত্ন থাকলে ও সহানুভূতি পেলে সার্থকতা লাভের সম্ভাবনা ছিলো বলে কল্লোল তাঁদের সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন। নারীর একটা নিজস্ব জগৎ আছে, সে-জগতের আশা আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখ মহিলা-লেখকের মনে ও কলমে পুরুষ লেখকের চেয়ে বেশি পরিমাণে ধরা দিতে পারে। কল্লোলের তরুণ পরিচালকরা এ সম্বন্ধে সচেতন বলে কতকটা উদারভাবে তাঁদের রচনা প্রকাশ করেছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, পত্রিকা কর্তৃপক্ষ নারী প্রগতিতে বিশ্বাসী ব্রাহ্ম ছিলেন। প্রবাসীতে এই কারণেই লেখিকারা সমাদৃতা হতেন, কল্লোলেও হয়েছেন। তাছাড়া কল্লোলের তরুণদের প্রখর নারী-চেতনাও অনুকূল প্রতিক্রিয়ায় লেখিকাদের প্রতি তাঁদের উদার করে তুলেছিলো। তবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কল্লোলে প্রথম দিকে অখ্যাত লেখিকাদের সংখ্যা

যত ছিলো শেষের দিকে তত নেই। সম্পাদকের এই ক্রমবর্ধমান নিরুৎসাহের কারণ সত্যিকারের ভালো লেখিকা তৈরি হয় নি, হওয়ার আশু কোনো সম্ভাবনাও দেখা যায় নি।

এই তো গেল কল্লোলের কলহংসদের পরিচয়। নূতন ও পুরাতনের সেই মেলায়, পূর্বেও বলেছি; জোর থাকতো নূতনদের ওপর—'কল্লোল এতদিন ধরিয়া এই তরুণদলকেই কামনা করিয়া আসিয়াছে। বর্ষে বর্ষে তরুণদল কল্লোলের পথে পথে দেখা দিয়াছে। নূতন চিন্তা, নূতন আকাঙ্ক্ষা ইহারা জীবনে বিকশিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই তরুণ দলের সঙ্গে আরও যাঁহারা বয়সের গণ্ডী এড়াইয়া নবীনতার সৃষ্টি কামনায় উৎসুক তাঁহাদের সকলকে লইয়াই বাংলার এই নবীন দলের সৃষ্টি।...বয়স আজ নবীনতাকে অন্তরের দ্বার হইতে ফিরাইয়া দিতে পারিতেছে না। তাই নব নব কল্পনার সম্পদ লইয়া বহু প্রবীণও এই নবীন দলের সঙ্গী।'[৩৪] কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করতেন, যৌবন চিরদিনই চঞ্চল—চিরদিনই নূতন থাকা তার ধর্ম। সেই যৌবনের জয়োল্লাস তাঁরা দেখতেন তরুণ লেখকদের মধ্যে, সে কারণে তাঁদের পরিচয় লিপিরচনায় আগ্রহ দেখিয়েছেন সম্পাদকরা। যেমন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—তাঁর বর্ণনায় পাই—'সুশ্রী, ভ্রূ দুটি টানা, চোখের পাতা কাল কাল ঝালরের মত, রোগাই বলতে হয়, মাথায় খুব বড় চুল রাখেন না, লেখকদের মত হাবভাব নয়, হাসতে ইচ্ছা করলে হাসেন, না ইচ্ছা করলে হাসেন না। পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চির দলে—মুখ দেখলে বোঝা যায় না ভিতরে এত আগুন।' কিংবা ভূপতি চৌধুরী—'যৌবনদৃপ্ত মুখ, চোখে চশমা, গোঁফ দাড়ী কামান, নিপীড়িত দুঃখীর জীবন সমস্যা কে চিন্তার বিলাস করে নিয়েছেন।'

কল্লোল পাঠক-পাঠিকাকে লেখক-লেখিকা করে তুলতে চেয়েছিলো। সম্পাদকরা বিশ্বাস করতেন, সকলের সমবেত চিন্তায় ও চেষ্টায় কল্লোল এককালে তার আকাঙ্ক্ষাকে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারবে। অনেক পত্রিকার বিজ্ঞাপনে যেমন 'নিয়মিত' লেখক-লেখিকার তালিকা থাকতো, কল্লোলের প্রথমদিকে তেমন থাকতো না—কারণ তাতে তার বিশ্বাস ছিলো না।[৩৬] বরং পরীক্ষামূলক রচনাকে সম্বর্ধিত করে নতুন লেখক সৃষ্টির দিকে তার লক্ষ্য ছিলো। তাই' 'সংক্রান্তি' গল্পের লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রকে উৎসাহিত করে লেখা হয়—এই লেখকের প্রথম গুণ বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করবার ক্ষমতা। আজ যিনি ছোটো গল্প লিখছেন ক্রমে তিনি আরও ক্ষমতাশালী লেখক হবেন এবং উপযুক্ত সময়ে তাঁর উপন্যাস পড়ে জনসাধারণ মুগ্ধ হবে।[৩৭] অচিন্ত্যকুমার সম্বন্ধেও পত্রিকাটির আশার অন্ত ছিলো না—তাঁর গল্পে যে কবি-প্রতিভা, মানব-চরিত্র-গুণ ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিলো তাতে

তিনি যে ভবিষ্যতে প্রসিদ্ধ লেখক হবেন, এই বিশ্বাস তার ছিলো।

কিন্তু তরুণ লেখকদের যেখানে ত্রুটি সেখানে কল্লোল উদাসীন থাকতে পারেনি। এটা সত্য যে, সকলেরই লেখক হতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু লেখক হওয়ার জন্য যে, সাধনা, অভিজ্ঞতা ও আত্মবিচারের প্রয়োজন তা ছাড়া লেখক হওয়া অসম্ভব। কল্লোল এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়নি, তরুণ লেখকদের মধ্যে বিনয় ও বড়োর প্রতি শ্রদ্ধার যে অভাব দেখা যায় তা তাঁদের বড়ো হওয়ার পথে অন্তরায় বলে নির্দেশ করতেও সে দ্বিধা করেনি।

১. সত্যনারায়ণ দাস, বঙ্গদর্শন ও বাঙালীর মনন সাধনা, প্রথম অধ্যায়, জিজ্ঞাসা।

২. ···'একটি হলদে রঙের বাক্স হইল 'ভারতী'র ভাণ্ডার ; প্রথমে সেটি জ্যোতি বাবুর কাছেই থাকিত, পরে কোন এক সময়ে সেই ভাণ্ডারটি আমাদের মাণিকতলা স্ট্রীটের ক্ষুদ্র ঘরের তাকের উপর রাখা হয়। সেই বাক্স ও কয়েকটি পরিত্যক্ত প্রবন্ধ অনেকদিন পর্যন্ত আমার সাথের সাথী ছিল—অল্প কিছুদিন হইল বিসর্জন দিয়াছি।,

সে সময় প্রতি রবিবারে জ্যোতিবাবু ও রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' ভাণ্ডার লইয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া 'ভারতী' সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন ও পরে 'তাঁহাকে' লইয়া ৺বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের বাটীতে যাইতেন এবং সেখান হইতে জোড়াসাঁকো ফিরিয়া যাইতেন।

কোন কোন দিন বৈকালে আমরা ৺জানকীবাবুর রামবাগানস্থ বাড়ীতে যাইতাম—সেখানে ন-বৌঠাকুরাণী, নতুন বৌ, জ্যোতিবাবু, রবিবাবু প্রভৃতিও আসিতেন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী তখন শেক্সপিয়ার পাঠ করিতেন—আমি যখনই যাইতাম, অধিকাংশ সময়ই দেখিতাম, তিনি শেক্সপিয়ার পড়িতেছেন, আবার কখন দেখিতাম, সেতার শিক্ষা করিতেছেন, কখন বা মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতেছেন বা ভাঁড়ার দিতেছেন। লেখাপড়া করিতেন বলিয়া তিনি কখনও গৃহস্থালিতে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন না—ইহা তাঁহার বিশেষ গুণপনার কথা।

সকলে মিলিত হইলে 'ভারতী'র জন্য রচিত নূতন প্রবন্ধাদি পাঠ, আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের গান হইত, পরে আহারাদি সমাপনান্তে বাড়ী ফিরিতে রাত্রি ১০।১১ টা বাজিয়া যাইত।'—ভারতীর ভিটা, শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী (১৩৫৭), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পৃঃ ৩৭৩।

৩. হেমেন্দ্রকুমার রায়, মণিলালের আসর, মানসী ও মর্মবাণী, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬।

৪. জীবেন্দ্র সিংহরায়, 'প্রমথ চৌধুরী' (২য় সং, ১৯৫৭), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রকাশিত, পৃঃ ৯, ১০, ৬৯, ৭০।

৫. অতুলচন্দ্র গুপ্ত, 'প্রমথ চৌধুরী', বিশ্বভারতী পত্রিকা, পঞ্চম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

৬. এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় এই যে ভারতী (নিজের সম্পাদনাকালে) বঙ্গদর্শন (নব পর্যায়) ও সাধনায় রবীন্দ্রনাথ কিছু কিছু নতুন লেখক সৃষ্টি করলেও তাঁকে কেন্দ্র করে ঐ সব পত্রিকার পাদপীঠতলে কোনো সুস্পষ্ট গোষ্ঠী গড়ে ওঠেনি। ফলে তাঁদের আড্ডার ইতিহাসও নেই। কবিগুরু আপন প্রদীপ্ত তেজে এতই প্রোজ্জ্বল ছিলেন যে, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে থেকেও তিনি আপন স্বভাবে ও প্রতিভার বৈশিষ্ট্যে ছিলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ তবে সাধারণভাবে বলা যায়, প্রত্যেক পত্রিকারই কোনো-না কোন রকমের একটা আড্ডা ছিলো, সেই সব আড্ডার কাহিনী নানা জনের রচনায়

ছড়িয়ে আছে। উৎসাহী পাঠকেরা হেমেন্দ্রকুমার রায় (যাঁদের দেখেছি), সুধীরচন্দ্র সরকার (আমার কাল আমার দেশ) সজনীকান্ত দাস (আত্মস্মৃতি) পরিমল গোস্বামী (স্মৃতিচিত্রণ, যাঁদের দেখেছি) ইত্যাদি গ্রন্থ দেখে নিতে পারেন।

৭. 'গোকুলবাবু মৃদু হাসলেন, বললেন—আসুন না একদিন আমাদের ওখানে। বিকেলে আমরা সকলে থাকি।'—ভূপতি চৌধুরী, কল্লোলের দিন, দিগন্ত, প্রথম বর্ষ, পৃঃ ৯৯।

৮. এঁর সস্নেহ দৃষ্টির কথা সকলেই উল্লেখ করেছেন—অচিন্ত্য সেনগুপ্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, ভূপতি চৌধুরী, সতীপ্রসাদ সেন, নিরুপমা দেবী ইত্যাদি।

৯. 'কল্লোল-যুগে' পড়েছি এবং অনেকের কাছে শুনেছি।

১০. স্মৃতির খাতায় (দীনেশরঞ্জন সম্পর্কিত) 'মৃত্যোরমৃতম' প্রবন্ধে হরিহর চন্দ্র বলেছেন। খাতাখানি মণিকা সেনের কাছে থেকে পাওয়া গেছে।

১১. যখন কলকাতায় আসতেন। সুরেশ চক্রবর্তী (উত্তরা-সম্পাদক) গোকুলচন্দ্রের মৃত্যুর পরে কল্লোলের আড্ডায় আসতে শুরু করেন, একথা আমাকে বলেছেন। অমলেন্দু বসু কল্লোল আপিসের পাশে একটা মাটির বাড়িতে,বোধহয় মণীন্দ্র চাকীর ঘরে রাত্রি যাপনও করেছেন।

১২. ১৯৬১ খৃঃ পুরীর ভিক্টোরিয়া হোটেলে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা সাক্ষাতের সময়ে কল্লোল যুগ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিলো। উল্লিখিত নামগুলি ছাড়া আরও অনেক আড্ডাধারীর নাম তিনি করেছিলেন। অচিন্ত্যকুমারের বইতেও অতিরিক্ত আরও কিছু নাম পাওয়া যায়।

১৩. আর্ট স্কুলে গোকুলচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। 'ছবি আঁকার চেয়ে ছবির ব্লক তৈরির দিকে ঝোঁক ছিলো বেশি।

১৪. ভূপতি চৌধুরী, কল্লোলের দিন, দিগন্ত, প্রথম বর্ষ, পৃঃ ১০১-১১২। লেখকের সম্মতি নিয়ে এই উদ্ধৃতি দেওয়া হলো।

১৫. কল্লোল-গোষ্ঠীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ফোর আর্টস ক্লাবের বার্ষিক উৎসবে সুনীতি দেবী অশ্রু দেবী (হরিহর চন্দ্রের স্ত্রী), উমা দাসগুপ্তা প্রমুখ মহিলারাও উপস্থিত থাকতেন।

১৬. 'পূরবী'তে গ্রন্থিত।

১৭ 'দিনাবসান' নামে পরিশেষ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

১৮. ঘোষণাটি প্রকাশিত হয়েছিল কল্লোলের ১৩৩১ সালের চৈত্র সংখ্যায়।

১৯. রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প সংগ্রহ 'ছোট গল্প' (পরে গল্পগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত) প্রকাশিত হয় ১৩০০ (১৮৯৩-৯৪) সালে।

২০ তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনা ও ব্রাহ্মধর্মানুরাগের পরিচয় আছে 'যুগপূজায়' (১৮৯২)।

২১. সবুজ পত্রের নবম বর্ষ শেষ হয় চৈত্র, ১৩২৮ ও বৈশাখ, ১৩২৯ এইযুগ্ম সংখ্যা দিয়ে। কল্লোল আরম্ভ হয় বৈশাখ, ১৩৩০ থেকে।

২২. যুগ্ম সংখ্যাগুলি দুই সংখ্যা ধরে।

২৩. কল্লোল-যুগ (৪র্থ সঃ) পৃঃ ৫০।

২৪. প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে কল্লোল গোষ্ঠীর যোগাযোগের সূত্র ছিলেন প্রাক্তন সবুজপত্রী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং কল্লোলের আড্ডাধারী ও লেখক সুকুমার ভাদুড়ী—যিনি প্রমথ চৌধুরীর বাড়ীতে গৃহশিক্ষকের কাজ করতেন।

২৫. সুকুমার সেন, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড। ১৯৫৮), পৃঃ ২২৯-৩০।

২৬. কল্লোল, পৌষ, ১৩৩২ সজনীকান্ত দাস, আত্মস্মৃতি (১ম খণ্ড), ১৩৬১।
২৭. পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় জয়ন্তী, মহাজাতি সদন, ১৯৬২। পৃঃ ৪।
২৮. কল্লোল ও দীনেশরঞ্জন দাশ, কবিতা, কার্তিক, ১৩৪৮।
২৯. অজিত দত্ত, 'কবিতা লেখার কথা', দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৯।
৩০. অজিত দত্ত, 'কবিতা লেখার কথা', দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৯।
৩১. জীবনানন্দ দাশ, কবিতার কথা (১৩৭০), পৃঃ ৩৮।
৩২ অন্নদাশংকর রায়, প্রবন্ধ পৃঃ ৬৯৮।
৩৩. নীলিমা বসু, কল্লোল, বৈশাখ, ১৩৩৪।
৩৪. ডাকঘর, কল্লোল, আষাঢ়, ১৩৩৩।
৩৫. কল্লোল, আশ্বিন, ১৩৩০।
৩৬. কল্লোল, শ্রাবণ, ১৩৩১।
৩৭. কল্লোল, শ্রাবণ, ১৩৩১।
৩৮. ডাকঘর, কল্লোল, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩।

পঞ্চম অধ্যায়

কল্লোলের দিন : বাংলা সাহিত্যে পালাবদল

উনিশ শতকের নবম দশকে কলকাতা শহরের একটি যুবককে হাঁটতে দেখেছিলাম চরঘোষপুরের রাস্তায়। সে খুঁজছে তার আইডিয়েলকে, ভারতবর্ষকে—কখনও হরচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বেদান্ত শিক্ষার আসরে, কখন ত্রিবেণী যাত্রীর জাহাজের ডেকে, কখন বা পরেশবাবুর বাড়িতে সুচরিতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। তার জীবনের সম্বল তিনটি বীজমন্ত্র—আবেগের, শ্রদ্ধার ও ধ্যানের। দেশের বৃহত্তর সত্তার মধ্যে নিজের আইডেণ্টিটি তার অম্বিষ্ট, তার সমস্যা আইডেণ্টিফিকেশানের সমস্যা। অনেক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার শেষে, যখন তার মনের তলার মাটির রদবদল হলো আর বিয়েত্রিচের মতো নারীর হাত ধরে এলো নির্মল প্রেম, তখন সে পেলো তার অন্বেষিত সত্যকে—বিশ্বমানবিক ভারতবর্ষকে। স্মর্তব্য, এ-যুবকের জন্ম সিপাহী বিদ্রোহের কালে, তার জীবনের মুখোমুখি হওয়ার সময় কেশব সেনের মৃত্যুর প্রাক্-লগ্ন।

এই গোরার দল দেশ-কালের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় বিদায় নিয়েছে উনিশ শতকেই। তার বদলে ভিন্নতর অবস্থাগত কারণে বিশ শতকের প্রথম দশকে দেখা দিয়েছে সন্দীপের দল। এরা নতুন মানুষ। এদেরও সমস্যা আইডেণ্টিটি ও আইডেণ্টিটিফিকেশানের সমস্যা—কিন্তু তার জটিলতা অনেক বেশি, চেহারা ভিন্নতর, আয়োজন আরেক রঙের। যে আইডিয়ার মণ্ডলটাকে সন্দীপেরা এঁকেছে সেখানে গোরার যুগের ন্যায়ের সত্য নেই, আছে শক্তির সত্য—প্রবৃত্তির জয়-পতাকা—'প্রবৃত্তিই সুন্দর, প্রবৃত্তিই নির্মল।' সেই প্রবৃত্তির তাড়নায় এরা ঝড়ের মতো ছুটে চলে, ফুল ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে দেয়। এদের নতুন প্রণবমন্ত্র—প্রবৃত্তি, শক্তি ও সাহস। গোরাদের আভ্যন্তর প্রশ্ন ছিলো প্রেমহীন জীবনে প্রেমের পদ-সঞ্চার নিয়ে। সেখানে উভয়পক্ষে প্রয়োজন হয়েছিলো বিনম্র প্রস্তুতির। কিন্তু সন্দীপের ক্ষেত্রে দেখি বিচারহীন তৃষ্ণার নাগিনী ছন্দ, আর 'সাহসের অন্ত নেই, যে সাহসের কোন আবরণও নেই—একেবারে আগুনের মত নগ্ন। তাকে বাধা দেওয়ার সময় পাওয়া যায় না; তাকে নিষেধ করা যেন বজ্রকে নিষেধ করা। বিদ্যুৎ সে নিষেধ হেসে উড়িয়ে দেয়।' রবীন্দ্রনাথ নিখিলেশ ও বিমলার দাম্পত্য-বৃত্তে অ্যাডজাস্টমেণ্ট আনলেন, কারণ সামাজিক ট্রাডিশান ও নিখিলেশের জীবন-

ধর্মেই তার সহজ সম্ভাবনা ছিলো। অন্যদিকে সন্দীপের স্বজাতিক দেশধর্ম ও স্বভাবজ প্রাণধর্মের কঠিনতর সমস্যাকে মোকাবিলা করতে না পেরে তিনি ব্যর্থতার পঙ্ককুণ্ডে নিক্ষেপ করেছেন। তবু তা নতুন কালের নতুন পুরুষের ব্যক্তিগত ও দেশগত স্বরূপ সন্ধানের দিক থেকে ঐতিহাসিক হয়ে আছে।

সন্দীপের কালের কোল ঘেঁষেই জন্ম নেওয়া আর একটি যুবককে আইডিয়ার চতুর্দোলায় চড়ে চতুরঙ্গ-সাধনায় অবতীর্ণ হতে দেখি। তার যাত্রা নিরাবেগ বুদ্ধির মঞ্চচূড়া থেকে। এই স্তরে তার যে মূর্তি দেখি, তাতে মনে হয় ও 'যেন একটা জ্যোতিষ্ক—তার চোখ জ্বলিতেছে; তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা; তার গায়ের রঙ যেন রঙ নহে, তাহা আভা।' শুধু এইটুকু নয়, 'তার মগজের মধ্যে মিল-বেন্থামের অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে সে যেন নাস্তিকতার মশালের মতো জ্বলিতে লাগিল।' আসল কথা, প্রথম পর্বে শচীশের জীবন-মন্ত্র হচ্ছে—আস্তিক্যহীন বুদ্ধিধর্ম, নিরাবেগ দৃষ্টির অনাবিলতা ও বিচারপ্রবণ চিত্তশক্তি। এবং তা নিয়েই সে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে তার সত্তার স্বরূপ, তাঁর সামাজিক অস্তিত্ব। তার এই পথে সিদ্ধি আসেনি—তবু নতুন জীবনাস্ত্র নিয়ে তাঁর নিজের আইডেণ্টিটি খোঁজার এই অভিযান সামাজিক ইতিবৃত্তে অর্থবহ। এরই মতো আরও চার ইয়ারকে দেখেছি সমকালের রঙ্গভূমিতে—যাদের মোহহীন বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিপ্রেমের অমৃতকুম্ভে বিদ্রূপের অম্লরস নিক্ষেপে এগিয়ে গেছে। 'চতুরঙ্গ' ও 'চার-ইয়ারী কথা' প্রথম মহাযুদ্ধের সমকালীন চরিত্র মিছিলে আরেক নতুন মানুষের মুখ দেখিয়ে দিয়েছে।

এই পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের আয়নায় প্রতিফলিত বাংলার যুবশক্তির নানা আদল আমরা দেখবার চেষ্টা করলাম। সময়ের পরিধি খুব কম—উনিশ শতকের নবম দশকের থেকে বিশ দশকের দ্বিতীয় দশক। এই সময় দ্রুত ঘটনা ঘটেছিলো, সামাজিক রাষ্ট্রীয় বিন্যাসের ত্বরান্বিত রদ-বদল হচ্ছিল। সেই বার বার দৃশ্যান্তরণে একের পাশেই ফুটে উঠেছিলো আরেক মানুষের মুখ—দুই-ই পরস্পরের কাছে কতকটা অচেনা, দেহমনে ভিন্ন ভিন্ন লোকের বাসিন্দা। বাইরে বাস্তব জগতে দ্রুত পট-পরিবর্তনের নতুন পুরুষের প্রাণ-মন-বুদ্ধির যে নবায়ন—তা ছিলো আমাদের সামাজিক সত্য। অবশ্য তাদের আবির্ভাব সব সময়েই কালগত পৌর্বাপর্যে নয়—অনেক সময় একই সঙ্গে কিংবা সামান্য ব্যবধানে, কারণ, দ্রুত ধাবমান কালর যাত্রায় যে জটিল সামাজিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, তার মধ্যে কোনো যান্ত্রিক ক্রমিকতা না থাকাই স্বাভাবিক। সে যা হোক, আসল কথা গোরা-সন্দীপ-শচীশের দল তিন দশকের—যার শেষ সীমা প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত—সামাজিক নতুন পুরুষদের সম্ভাব্য নানা সাহিত্যিক

প্রটোটাইপগুলির মধ্যে এক একটি বিশিষ্ট উদাহরণ মাত্র।

এই পটভূমিকায় এবং জীবনবৃত্তের পরিবর্তন হলো প্রথম মহাযুদ্ধের উত্তর কালে। আগের সব কিছু মুছে গেলো না, যুদ্ধের জাঙাল ডিঙিয়ে এ ধারে চলে এলো বিদায়-নেওয়ার দশকগুলির অনেক ভগ্নাংশ, পুরনো ছকে তাদের সংগঠিত করার চেষ্টাও চলছিলো—কারণ সেটাই ইতিহাসের নিয়ম; তবু পালা বদলের হাওয়াটা চারদিক থেকে জমে আসছিলো সামাজিক ও মানসিক বলয়ে। সেই ঋতু পরিবর্তনের অবস্থাগত পটভূমি বিশ্লেষণ না করলে যুদ্ধোত্তর কালকে—কল্লোলের কালকে—বোঝা যাবে না। কিন্তু সেদিকে দৃষ্টিপাতের আগে এই সন্ধ্যাগত সময়ের প্রতিনিধিকে এক নজর দেখে নিতে চাই কল্লোলেরই পৃষ্ঠা থেকে। যাকে দেখবো তার নাম মায়া, গোকুল নাগের পথিকদের একজন। সে শুধু তার বর্তমানের প্রতিনিধি নয়, সে তার প্রগত চিন্তা ও অনুভূতি নিয়ে ভাবী কালের দোসরও বটে।

তখন দেশ জুড়ে অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ, এমন সর্বাত্মক আন্দোলন আগে আর হয়নি। যুবতী মায়া প্রগতিশীল ব্রাহ্ম ঘরে ও প্রতিবেশে বড়ো হয়েছে, চলনে বলনে শিক্ষায় চিন্তায় তার পিছু-টান কম। মাসী করুণা যেন এক নতুন যুগের মা—তিনি সুস্থ সবল মনের ছেলের (শ্রীশের) স্বাধীনতায় হাত দেন না, অসহযোগের সৈনিক পুত্রের পৌরুষে গর্ববোধ করেন। মায়া দেখে আর দেহমনে মুক্ত হয়ে ওঠে। সে লজ্জায় মরে যায় যখন দেখে কোনো মেয়ে পুরুষের কাছে কাঁদছে পুরুষেরই অত্যাচারের কথা বলে, অথচ তার নিজের মন মাসতুতো দাদা শ্রীশের গম্ভীর ও চাপা আবরণের আড়ালে বেদনার উৎস দেখে বেদনা অনুভব করে। তার কথায় অন্যদের মনে হয়, সহস্র বৎসরের শৃঙ্খলিত নারী-হৃদয় মুক্ত আলো বাতাসের স্পর্শ পাওয়ার জন্য নড়ে উঠেছে। মায়া দীপ্তিকে বলে—'মারামারি করে নিতে পারিস্ বাঁচবি, নইলে অমনি করে মরে থাকতে হবে।' তার বড়াই সে সুস্থ সহজ মেয়ে। তার চাঞ্চল্যকর উক্তি—

'শ্রীশদার কাছে আমি কতটা সহজ হতে পেরেছি তা বুঝতে পারবেন যদি বলি ওর সঙ্গে আমি Havelock Ellis-এর Sex Psychology-টা সমস্ত পড়েছি—ও কি! আপনি যে চমকে উঠলেন।' মায়া হেসে উঠলো।

দীপ্তি। একটি কথা বলবি ভাই? কাকে সবচেয়ে ভাল লাগল?

মায়া। সব কটাকে।—একেবারে ভালবেসে ফেলেছি।

সে বুঝতেই পারে না, যে স্বামী বা স্ত্রী জানে যে সে প্রতারিত হয়েছে বা প্রতারণা করেছে, আর কোনো দিনই তারা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে

চলতে পারবে না, তারা একে অন্যের ছেলে-মেয়ের জনক বা জননী হয়ে কেমন করে সংসারে বাঁচে। মায়ার দর্শন—জীবনকে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা না থাকতে দিয়ে সহস্র কাজের ভেতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যাওয়া। অথচ নারীত্ব তার মধ্যে ছিলো এবং আছে। বিকাশের চরম দুর্দিনে তাকে সে ছাড়েনি, কারণ 'আমি ছাড়া তার আর কে আছে বল ?' কিংবা 'যে মা কলঙ্কের ভয় করে, সে মা নয়। লাগুক কত কলঙ্ক লাগবে আমার গায়ে, ওরা আমাকে একেবারে কালো করে দিক।' আসল কথা মায়া ও তার পথিকবন্ধুর দল বুদ্ধিমার্জিত চেতনার নিকষে সদসৎ ও সুন্দর-কুৎসিতের প্রশ্নটাকে নতুন করে যাচাই করেছে, নিজেদের জীবন দিয়ে এবং পারস্পরিক সম্পর্কের বিচিত্র ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে নিজেদের ব্যক্তিসত্তার আবিষ্কার ও সমাজসত্তার সঙ্গে তার যুগানুগ সাযুজ্য সন্ধান করেছে। এটা তারা জানে, সত্তার সেই প্যাটার্নও অব্যয় হবে না, কারণ পথিক মানুষের পথ চলার শেষ নেই।

এই মায়াদের জীবন-উপাদান ছড়িয়ে ছিলো প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর দেশকালের মধ্যে। এদের জগৎ সন্দীপ-বিমলা-নিখিলেশর জগৎ নয়, তাই পথিক উপন্যাস সেদিনকার তরুণ সমাজে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলো, তারা এর মধ্যে দেখতে পেয়েছিলো তাদের সমাজ ও জীবনের সাহসিক অভিক্ষেপ। যা ছিলো হাওয়ায় ছড়িয়ে অথচ যা ছিলো জল বাতাসের মতোই স্বাভাবিক সত্য, তাকে সাহিত্যের আসরে সংগঠিত হতে দেখে নবীন লেখকরাও উত্তেজনা বোধ না করে পারেন নি। সুতরাং এই নতুন ব্যক্তিপুরুষ ও তাদের সামাজিক অস্তিত্ব কিংবা নতুন লেখক সম্প্রদায় ও তাদের সৃষ্টিকে বুঝতে হবে দেশকালের সূত্রগুলি দিয়ে।

সেই সন্ধান নিতে গেলে আদিতেই প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) কথা মনে পড়ে। আমরা ভারতবাসীরা সেই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অংশীদার ছিলাম না, ইংরেজের প্রাদেশিক প্রজা হিসাবে তার সঙ্গে কতকটা জড়িয়ে পড়েছিলাম মাত্র। তবে সেই অনাবশ্যক যুদ্ধায়োজনে এদেশবাসীকে যে-কোনো ভাবে জড়ানোর বিরুদ্ধে কোনো লক্ষণীয় প্রতিবাদ তখন হয়নি। কারণ নেতৃত্বের ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তখনও ইংরেজের কাছে অনেক আশা। কোনো কোনো নেতা ও পার্টি প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই চার বৎসরব্যাপী যুদ্ধ ব্যাপারটির সঙ্গে আমাদের 'নাড়ীর' যোগ না থাক, 'তারের' যোগ ছিলোই। তাই যুদ্ধের আগুনের আঁচ পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতির গায়ে লাগবে, আমরাও বাদ যাবো না—এ জ্ঞান প্রমথ চৌধুরীর মতো কোনো কোনো চিন্তাশীলের ছিলো।[২]

বাস্তবেও দেখতে পাই, য়ুরোপে সুরাসুরের সংগ্রামে যে অমৃত ও হলাহল উঠেছে তার ভাগ আমরাও কতকটা পেয়েছি। যদিও তার বেশীর ভাগটা পেয়েছে য়ুরোপ এবং সেটাই স্বাভাবিক।

য়ুরোপের কুরুক্ষেত্রের একটা ফলাফল এই যে আমরা এযাবৎ প্রতীচী বলতে বুঝতাম ইংল্যাণ্ড ও কতকটা পশ্চিম য়ুরোপ এবং সেই ভূখণ্ডের ইতিহাসের আলোকেই মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশকে বিচার করতাম। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশের ব্যাপকতর পরিপেক্ষিতে যুদ্ধের গুণাগুণ নিরূপণ এবং সমগ্র মানবসভ্যতার ওপর তার প্রতিক্রিয়া মূল্যায়নের সুযোগ এদেশের শিক্ষিত মানুষের হলো। অধ্যাত্ম-প্রাণতার ঘুণধরা আদর্শ দিয়ে প্রাচ্যখণ্ডের মানুষ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করলো, অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে কর্মপ্রাণ য়ুরোপের বৈশ্য সভ্যতা কী পরিণতি লাভ করেছে। সুতরাং যুদ্ধের কাণ্ড কোলাহল এদেশের তরুণদের কূপমণ্ডূকতায় বিশ্বতোমুখী দৃষ্টি সঞ্চারিত করে দিয়েছিলো। তার ফলে যুদ্ধোত্তর কালে কলম্বাসী তৃষ্ণায় য়ুরোপে অধিক সংখ্যায় পাড়ি দিতে শুরু করে বাংলার নতুন মানুষেরা।

যুদ্ধ মাত্রেই ধ্বংস-মৃত্যু আছে, আছে নির্ভীকতা ও আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত। তা শুধু নৃশংসতা নিয়েই পাপবৃত্ত রচনা করে না, উত্তেজনার বেড়াজালে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে শক্তি, সাহস ও তারুণ্যকেও বন্দী করে ফেলে। অন্যের কথা দূরে থাক, স্বয়ং প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথের কাছে যখন 'বিনা তারে টেলিগ্রামে' যুদ্ধের বার্তা এসে পৌঁছেছিলো তখন তিনি গেয়েছিলেন সবুজদের পুচ্ছ তুলে নাচার গান। আর বাঙালী পল্টনে কোনো এক হাবিলদারের চড়া গলায় সৈনিক-জীবনের উন্মাদনাতেই কী জেগে ওঠেনি বিদ্রোহ ও বলিষ্ঠতার উজ্জীবন মন্ত্র? প্রথম মহাযুদ্ধ অনুকূল সংঘটনে অনেক বাঙালী তরুণের মনে অন্তত তাদের প্রাথমিক চেতনায়, একটা উদ্দাম যৌবন ও বাধাবন্ধনহীন অভিযাত্রার স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছিলো, জাতীয় ভাগ্য বা স্বাধীনতা অর্জনের দুর্মর স্বপ্নাবেগ সৃষ্টি করেছিলো। যুদ্ধোত্তর তরুণ বাংলার মানসলিপির এই সংকেত সাহিত্যের মোড় ফেরার প্রয়াসে একটা নির্ভর সত্য হিসেবে আজও স্মরণীয়।

কিন্তু য়ুরোপে যুদ্ধের পরিণাম ভালো হয়নি। জার্মান সাম্রাজ্যের শক্তিমদমত্ত অভ্যুদয় ব্যাহত হলো বটে, কিন্তু যুদ্ধ সংক্রান্ত দুষ্টচক্রের সর্বনাশা কামড় জীবনের পরীক্ষিত মূল্যবোধ ও কর্মযোগী সভ্যতার বনিয়াদকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে গেলো। যে সমস্ত সজীব মনোভাব ও সৃজনাত্মক প্রণোদনা য়ুরোপের মানুষকে এতকাল জিইয়ে রেখেছিলো তাতে এলো অবসাদ ও অবক্ষয়। এলিয়ট 'দি ওএস্ট ল্যাণ্ড' (১৯২২) কাব্যে সেই অনুর্বর বিধ্বস্ত পোড়োজমির এক মনোজ্ঞ চিত্র উপস্থাপিত

করেছেন। তিনি শুধু শীতের প্রাতঃ সন্ধ্যায় বাদামী কুয়াশায় আচ্ছন্ন 'আনরিয়েল সিটি' লণ্ডনকে দেখেন নি, দেখেছেন 'ফলিং টাওয়ার্স' জেরুজালেম, এথেন্স, আলেকজেন্দ্রিয়া, ভিয়েনাকে। সর্বত্রই শুধু পাথুরে আবর্জনা, জলহীন বন্ধ্যাভুমি, মৃতের সমাধিস্তূপ, যুগলজীবনের বৃন্তে প্রেমহীন যৌনসম্পর্কের এক দুঃসহ অভিশাপ। অদৃষ্টের কী নিদারুণ পরিহাস—জলাভাবে যেমন মৃত্যুর দৃষ্টান্ত আছে, তেমনি আছে, জলে ডুবে মরার ঘটনা! সুতরাং প্রথম মহাযুদ্ধ য়ুরোপের মানস-ভাণ্ডারে জমিয়ে তুলেছিলো—হতাশ্বাস, নৈরাশ্য, শূন্যতাবোধ ও বিষাদ চেতনা। আর ভালো দিকের সঙ্গে এই নৈরাশ্য ও বেদনার বেদগান এসে পৌঁছেছিলো আমাদের শিক্ষিত তরুণদেরও মনে।

প্রথম মহাযুদ্ধের কোল ঘেঁষেই ঘটলো আধুনিক যুগের পৃথিবীর সবচেয়ে চমক-প্রদ ঘটনা—রুশ-বিপ্লব, ১৯১৭ থেকে ১৯২১-এর মধ্যে রচিত হলো তার সফলতার ইতিহাস। মানুষের ভূগোলে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার উদ্ভব শুধু রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের বাস্তব দৃষ্টান্ত মাত্র নয়, মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও চেতনার ধাত একেবারে বদলে দেওয়ার এক সফল পরীক্ষাও বটে। দ্বান্দ্বিক জড়বাদ মানুষের সামাজিক অস্তিত্বে ও জীবন-দর্শনে যে নতুন জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলেছিলো, রুশ বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার সত্যতা স্থিরীকৃত হয়ে গেলো। তার বার্তা ভারত তথা বাংলা দেশে পৌঁছোতে দেরি হলো না। ১৯১৯-এ এক বক্তৃতায় প্রবীণ বিপিনচন্দ্র পাল ঘোষণা করলেন কম্যুনিজমের আবির্ভাবের কথা, ব্যাখ্যা করলেন বলশেভিকবাদের নিহিতার্থ। ১৯২০ সালের অক্টোবরে তাসখন্দে প্রতিষ্ঠিত হলো ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি। তখনকার দেশ-সচেতন তরুণ সমাজে এই সংবাদ অজানা রইলো না। কিন্তু সেকালের বেশির ভাগ তরুণের মধ্যে বুদ্ধি ও চেতনার এত দৃঢ়তা ছিলো না যে, জনগণের জীবন সমস্যার গভীরে সে মানবিক অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারে।

তবে পক্ষে হোক বিপক্ষে হোক বলশেভিকবাদ ও রুশবিপ্লব কোনো কোনো গোষ্ঠীতে কিছু সাড়া জাগাতে পেরেছিলো। পরিচ্ছন্ন ও সামগ্রিক দৃষ্টি হয়তো সর্বত্র ছিলো না, কিন্তু পরিচয়ের চিহ্ন ছিলো। কল্লোলের সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে তার উদাহরণ পাওয়া যায়। 'সমাজতন্ত্রবাদ' নামে গোপাললাল সান্যালের একখানি বইয়ের সমালোচনায় কল্লোল (ভাদ্র, ১৩৩২) লিখেছিলো—'বইখানি খুব কাজের বই। বর্তমান সময়ে জগতের অধিকাংশ দেশই সমাজতন্ত্রী আদর্শে পরিচালিত, বাংলা ভাষায় এ-রূপ জন-মতবাদের একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়াতে ভালই হয়েছে। গ্রন্থকারের চেষ্টা সার্থক হবে আশা করি।' তাছাড়া

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের 'বলশেভিকবাদ'-এর অনুবাদ তখনকার দিনে হয়েছিলো এবং কল্লোলে সেই প্রয়াস প্রশংসিতও হয়েছিলো।

শতাব্দীর তৃতীয় দশকের একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের (মার্ক্সের কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো) সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত অনুবাদ গ্রন্থ 'সাধারণ স্বত্ববাদীদের ইস্তাহার'। তার সমালোচনায় কল্লোলের (পৌষ,১৩৩৬) সশ্রদ্ধ বক্তব্য—'এরূপ একখানি পুস্তক বাংলা ভাষায় প্রচারিত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন ছিলো, সৌম্যেন্দ্রনাথ সে অভাব মোচন করিয়াছেন।...তিনি নিজে একজন সাধারণ স্বত্ববাদী, Proletariat বা "আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের" উন্নতি কামনায় পৃথিবীব্যাপী যে শ্রমিক আন্দোলন চলিতেছে, তাহার ঘোষণাবাণীর সহিত এ দেশের জনসাধারণের পরিচয় করাইয়া দেওয়াই তাঁহার উক্ত অনুবাদের উদ্দেশ্য।' 'বিশ্ব-দর্পণ' গ্রন্থে সমসাময়িক সমাজদর্শন আলোচনা-প্রসঙ্গে শচীন্দ্রকুমার সাহা লিখেছিলেন (কল্লোল, পৌষ, ১৩৩৬)—'সাম্রাজ্যবাদ বা বলশেভিকবাদ কোনোটাই আমার কাম্য নহে। তাই কোন মতবাদের প্রতি পক্ষপাত না দেখাইয়া যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে ইহাদের সম্বন্ধে নিজের মত ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।' বস্তুত বিপ্লবোত্তরকালে অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালী তরুণের এটাই ছিলো সাধারণ মনোভাব। এঁরা তেমনভাবে অনুরক্ত হওয়ার চেষ্টা না করলেও অবহিত থাকার চেষ্টা করেছেন। এ-প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সমকালীন চিন্তা (কল্লোল, শ্রাবণ, ১৩৩৫) উদ্ধারযোগ্য—'জড়বাদ ভাল কি মন্দ সে কথা উঠছে না এবং সাহিত্য জড়বাদের ব্যাখ্যা করুক তাও বলছি না। তবে জড়বাদ যে বর্তমান যুগে নিতান্তই স্বাভাবিক, সে কথা ক্ষুধার্ত ব্যক্তি এবং সহুরে লোক কি করে অস্বীকার করে ?... ...... বস্তুতন্ত্রবাদীদের communist হবার সাহস আছে কি ?'

বিপ্লব-দর্শন ছাড়া আরও কিছু সমাজ-দর্শন সম্পর্কে সশ্রদ্ধ কৌতূহল তখন জাগতে শুরু করেছে। তাদের মধ্যে ফ্রয়েডীয় গবেষণা ও মনস্তত্ত্ব তরুণ দলের মনকে আকর্ষণ করলো সবচেয়ে বেশি। সেই মনস্তাত্ত্বিক আলোক-সম্পাতের ফলে স্বপ্নের আকাশ নতুন অর্থ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো; নারী-পুরুষ, জননী-সন্তান, দেহ-মন, প্রেম-কাম ইত্যাদি সম্পর্কে পুরনো ধারণাগুলি একেবারে পাল্‌টে গেলো। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালের তরুণ সমাজে ফ্রয়েডের চর্চা তাদের চৈতন্যের রাজ্যে আনলো এক আলোড়ন। বুদ্ধদেব বসুর 'অভিনয় নয়' (কল্লোল, কার্তিক, ১৩৩৬) গল্পের এক জায়গায় আছে—'ফ্রয়েড্ পড়ে অবধি আমার মনে হয়েছিলো যে পৃথিবীতে এমন কোনো জিনিষ নেই—থাকতে পারে না—যা আমি না বুঝতে পারি।' আসলে এ শুধু গল্পের কথকের মনের কথা নয়, কল্লোলের আবির্ভাব-

কালের বাংলার নবোদ্ভূত যুবক সমাজেরই মনের কথা। সাইকো-অ্যানালিসিসের সূক্ষ্মতম অণুবীক্ষণ হাতে নিয়ে তারা জীবন-রহস্যের সিংহদ্বারে প্রবেশ করে তার সবটুকুই ধরতে চাইছিলো। এই জন্যই ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আত্মসমীক্ষা করতে গিয়ে কল্লোলে লিখেছিলেন (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪)—ফ্রয়েড, ইয়ং এবং পরদেশী সাহিত্যের জ্বালায় আমরা sexconscious হয়ে পড়েছি। তিনি অবশ্য এও বলেছেন যে, নিজের ও পরের সহজ সরল আস্ত ব্যবহারকে চুল-চেরা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মানুষ কতটা উচ্ছন্নে যেতে পারে তার দৃষ্টান্ত আছে ফরাসী সাহিত্যে। এই ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব ছাড়া শোপেনহাওয়ারের দুঃখদর্শনও তখনকার নৈরাশ্যপীড়িত তরুণ মনে ছায়া ফেলেছিলো। তাদের সংবেদনশীলতাকে আকর্ষণ করার মতো একটা প্রবণতা ছিলো শোপেনহাওয়ারী বিষাদচারিতার মধ্যে, কারণ তরুণদের প্রসরণশীল অস্তিত্বের সামাজিক সমর্থন আদায়ের ব্যাপারে যে যুগগত ব্যর্থতা ছিলো তা মন ও চেতনার নিস্তেজতায় পর্যবসিত হবে, এতো স্বাভাবিক। তাই ধূর্জটি-প্রসাদ শোপেনহাওয়ারের কথা উল্লেখ করেছেন, বুদ্ধদেব বসুও জীবনের ম্রিয়মাণ মুহূর্তের চর্বণায় স্মরণ করেছেন এই যুগ-পূজিত জার্মান দার্শনিককে। দর্শন ছাড়া বিভিন্ন বিজ্ঞানের—বিশেষ করে সমাজবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্বের—আবিষ্কার থেকেও তখনকার শিক্ষিত বাংলার নতুন নায়করা খুব দূরে ছিলেন বলে মনে হয় না।

এই তো আমাদের তরুণ সমাজের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও দার্শনিক মননভূমিতে বাইরের ঘটনা ও আইডিয়ার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা। বিদেশী সাহিত্য ও সংস্কৃতির মানস-সান্নিধ্যও তাঁরা কম-বেশি পরিমাণে লাভ করতে চেয়েছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত আমরা বিদেশী সাহিত্য বলতে বুঝতাম ইংরেজী সাহিত্যকে কিছুটা বা ফরাসী সাহিত্যকে। মানসিক ক্ষেত্রে জার্মান দার্শনিকদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকলেও সাহিত্যকলার ক্ষেত্রে জার্মানদের সৃষ্টির সঙ্গে আমাদের যোগ ছিলো না বললেই চলে। ফলে পরাধীন দেশের প্রাদেশিক প্রজার জীবনের দায় হিসেবে তখনকার বাঙালী তার দৃষ্টিকে অ্যাংলো-স্যাক্সন সৃষ্টিমণ্ডলের দিকে নিবদ্ধ করে রেখেছিলো, তাদের প্রাণ-মনের আকৃতিও তাকে স্বীকার করে নিয়েই ছিলো সন্তুষ্ট। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন য়ুরোপের দ্বার খুলে দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলো তখন আমাদের সাহিত্যিক ক্ষুধা বেড়ে গেলো। ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্যের বাইরেও যে য়ুরোপীয় সাহিত্যের এক মহৎ ভাণ্ডার আছে এ সংবাদ বাঙালী চৈতন্যে নতুন সাড়া না জাগিয়ে পারেনি। ঠিক এই সময়ে—হয়তো বিশ্বব্যাপী চাহিদার খাতিরে—ফরাসী, স্ক্যাণ্ডানেভিয়ান, নরওয়েজিয়ান, আইস-ল্যাণ্ডিক, স্প্যানিশ, ইতালীয়ান, জার্মান, পোলিশ, হাঙ্গেরিয়ান, রাশিয়ান ও

জাপানিজ সাহিত্য ইংরেজী অনুবাদে বাংলার বাজারে সুলভ হয়ে উঠলো। ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি বহুকালাগত প্রভাব তো ছিলোই, তার সঙ্গে এসে যুক্ত হলো কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের বিশেষ করে গল্প ও উপন্যাসের, প্রভাব। এ কথা স্মরণ করেই কল্লোলের কালে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন—'ফরাসী-রুশ-নরোয়েজীয় উপন্যাসগুলোর ইংরেজি তর্জমা বাঙলা দেশে যদি না ছড়াতো, তবে একা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাধ্যি ছিলো না, দেশের তরুণ তরুণীদের এমন universal প্রেমের মন্ত্রে মন্ত্রণা দেন।'[২] ইংরেজী অনুবাদ ছাড়া টাইমস্ লিটারেরি সাপ্লিমেন্টে পরিবেশিত কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের বিবরণও তাঁরা সাগ্রহে পড়তেন। তখনকার দিনের বিদেশী সাহিত্যের বাংলা সংবাদ যে অনেকটা ওই সাপ্লিমেণ্ট-নির্ভর ছিলো তা তুলনামূলক বিচার ও সাহিত্যিকদের মৌখিক সাক্ষ্য থেকে আজও জানা যায়। তাঁরা অনেক জীবিত সাহিত্যিকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগও করতেন। তার সমষ্টিগত ফল বাংলার তরুণ মনে নতুন দিগন্ত উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিলো। এ-প্রসঙ্গে প্রখ্যাত কল্লোলীয় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠভাষিতা স্মর্তব্য—'বাংলা দেশে এক দল তরুণ সাহিত্যিক উঠ্‌ছেন······তাঁদের বিরুদ্ধে···একটি অভিযোগ আছে যে, তাঁরা সাহিত্যের আদর্শের জন্য নাকি সাগর পারের দিকে চেয়ে থাকেন। নূতন নূতন বিলাতী ও য়ুরোপীয় নামের মোহ এই তরুণ দলকে ঘিরে আছে।······যদি য়ুরোপের সাহিত্য তরুণ বাঙালীকে টেনে থাকে—তার নিদারুণ প্রয়োজন আছে। সাহিত্যের সপ্তসিন্ধুর জল আজ মঙ্গল ঘটে ভরা চাই—নইলে অভিষেক হবে কি করে? য়ুরোপের সাহিত্য আজ একটা কথা তরুণ বাঙালীর কানে খুব করে বলে দিচ্ছে যে, মানুষের দাম অনেক বেড়ে গেছে, তোমরা সেকথা ভুলে গিয়েছ। বাঙালীর ছেলে অবাক্ হয়নি, তবে অনুতপ্ত হয়েছে।'[৩]

আর এই বিদেশী সাহিত্যপ্রীতির মধ্যে রুশ সাহিত্যপ্রীতির কথা সমধিক উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যের এই বিশেষ দিগন্তে আমাদের তরুণকুলের সস্নেহ দৃষ্টিপাত বিশ্বমানবতাধর্মী প্রত্যয়ের সাক্ষ্য বহন করছে। কল্লোলেরই দুজন সেই অনুরাগ-বশত লিখেছিলেন দুটি ভালো প্রবন্ধ—বুদ্ধদেব বসু 'প্রবাসী', বৈশাখ, ১৩৩২-এ 'বর্তমান রুশ-সাহিত্য' শিরোনামে, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 'কল্লোল' বৈশাখ, ১৩৩৩-এ 'রুষ সাহিত্য ও তরুণ বাঙালী' শিরোনামে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের লক্ষ্য ঠিক ছিলো, তাই তিনি অবিচলিত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—'বিংশ শতাব্দীর তরুণ বাঙালীর মন আজ রূপকথার রাজপুত্রের মত সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হবার জন্যে দুর্বার বেগে ছুটে চলেছে।······তরুণ বাঙালীর মনে আজ ভবিষ্যৎ বাংলার একটা আব্‌ছায়া এসে পড়েছে, আর সেই আব্‌ছায়ায় দাঁড়িয়ে তার মন যেন সুদূর

রুষিয়ায় তার সম্ভাব্য রূপ দেখছে। রুষ-সাহিত্যে বাঙালী দেখেছে বেদনার সিন্ধু মন্থন করে জয় মাল্য গলে মানবের অন্তরের বিজয়লক্ষ্মী উঠেছে ; বাঙালীর মন রুষ সাহিত্যের ইতিহাসে একটা এত বড় নিষ্ঠার পরিচয় পেয়েছে যে, সে আপনার অজ্ঞাতসারেই তাকে স্বীকার করে নিয়েছে।'

তরুণ বাঙালীর মন য়ুরোপীয় সাহিত্য থেকে যুদ্ধোত্তর কালে পেয়েছিলো মনুষ্যত্বে শ্রদ্ধেয়তা, বাস্তব ও জনগণতান্ত্রিক চেতনা, যৌবনসংলগ্নতাবোধ মিথুনাসক্তি, প্রেমের মনস্তাত্ত্বিকতা, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের পুনর্বিচারজাত নতুন মূল্যবোধ এবং দুঃখাত্মকতা ও বিষাদচেতনা। আর সেই সব নতুন মত ও পথ তাঁরা বিশেষভাবে দেখতে পেয়েছিলেন ফ্লবেয়ার, জোলা, ইবসেন, ন্যুট হামসুন, গর্কি, গোগোল, টুর্গেনিভ, চেখভ, ডস্টয়ভস্কি, টলস্টয়, মেটারলিঙ্ক, জোহান্ বোয়ার্, বেনাভান্তে জাসিন্তো ইত্যাদির মধ্যে।

বাইরের দিক ছেড়ে দিয়ে ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, সেখানে আলোড়নের অন্ত নেই। যে-মহলে শাসকদের সুবিবেচনা সম্পর্কে আশা তখনও ফুরিয়ে যায় নি, তাদের মনস্তুষ্টি এবং ভারতবাসীর যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহায়তার জন্য মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিফর্মের (১৯১৯) দাক্ষিণ্য বিতরণ করা হলো। এতে রাজনৈতিক অগ্রগতি কিছুটা হলো বটে, কিন্তু জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার দিক থেকে তা 'অযথেষ্ট, অসন্তোষজনক ও নৈরাশ্যকর' বলে বিবেচিত হলো। এই সময়েই জাতীয় চেতনায় একটা প্রচণ্ড আঘাতের মতোই ঘটলো জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড (১৯১৯)। প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি ত্যাগ করলেন। ফলে সংবেদনশীল যুবকচিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো, ৬ই এপ্রিলের দেশব্যাপী হরতালে তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া গিয়েছিলো। তারপর প্রতিক্রিয়াশীল খিলাফৎ আন্দোলনকে (১৯১৯-২২) কৌশলে স্বীকার করে গান্ধীজী শুরু করলেন বৃহত্তর অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১)। স্ত্রী-পুরুষ, মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত বেকার-চাকুরীজীবী, শ্রমিক-কৃষক ইত্যাদি জনসাংকর্ষের বিরাট অংশ ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই সর্বাত্মক রাজনৈতিক আয়োজনে। সবচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া হলো যুবক সমাজে। তারা সেই আন্দোলনের জোয়ারে ভেসে গেলো, স্কুল কলেজ ছাড়লো, পিকেটিং এবং ধর্মঘটে নিলো প্রধান ভূমিকা, অনেকে চাকুরী ছেড়ে দিলো। সেই অদ্ভুত গণজাগরণের মোট ফল এই যে, 'দেশ তখন সত্যিই মাতোয়ারা হয়েছিলো এবং যে পরশমণি আমাদের এতদিনকার লাঞ্ছিত জীবনের সকল কালিমা ধুয়ে মুছে সোনা করে দেবে, তার সন্ধান যেন দেশ পেয়েছিলো।' বাংলায় তখন যে জোয়ার এসেছিলো তারই জের টেনে 'স্বাধীনতা' পত্রিকার ১ম সংখ্যায় (১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫) বলা

হয়েছিলো—'আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য জাতির স্বাধিকার সম্বন্ধে তাহাকে সচেতন করিয়া দেওয়া, তাহার ন্যায্য অধিকারকে দাবী ও ব্যক্ত করার সাহস তাহাদের হৃদয়ে সঞ্চার করা, তাহাকে মরণের দীক্ষায় দীক্ষিত করা, তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া মৃত্যু বা দুঃখকে ভয় করা ক্লীবেরই ধর্ম।' এককথায়, অসহযোগ (এবং কিছুটা গোপন সন্ত্রাসবাদ) দেখিয়ে দিলো বাংলার বিস্ফারিত যৌবনকে। সেই নবজাগ্রত যৌবনধর্মে স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা ঔদ্ধত্য ও অবিনয়ও স্ফূর্তি পেয়েছিলো।

অন্যদিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুই ক্ষেত্রেই হতাশাও ছিলো। অসহযোগ আন্দোলন অকস্মাৎ প্রত্যাহৃত হওয়ায় ঈপ্সিত সাফল্য এলো না। দেশবন্ধু অসহযোগের অন্তে ১৯২৩ সালে কংগ্রেসের ভেতরেই স্বরাজ্য দল প্রতিষ্ঠার পর নির্বাচনক্ষেত্রে ও আইনসভায় উত্তেজনাকর বক্তৃতা দিয়ে দেশকে কিছুকাল উৎসাহিত করে তুলেছিলেন। তিনি আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু দেশবন্ধুর অকালমৃত্যুতে (১৯২৫) দেশে আবার ঘনিয়ে এলো অবসাদ। তার পেছনে অবশ্য অর্থনৈতিক কারণও ছিলো। দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরণ, যুদ্ধ ভাণ্ডারে দেড়শো কোটি টাকা দান, দেশবাসীর ওপর (যুদ্ধের খরচের জন্য) চাপানো করভার, যুদ্ধকালে শিল্প-বাণিজ্যে বিশৃঙ্খলা, নতুন কর্মোদ্যোগের অভাব—সব মিলিয়ে একটা অর্থনৈতিক অরাজকতা তখন চলেছে। তার ওপর অসহযোগের কালে যখন কর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে গেলো তখন আর্থিক সংকট আরও ঘনিয়ে এলো। এর অনিবার্য পরিণামে দেশে, বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে, দেখা দিলো অবসাদ, শূন্যতাবোধ ও বিষাদাত্মকতা।

এর অবশ্য আরও কিছু কারণ ছিলো। শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে শুরু করে তৃতীয় দশক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে স্কুল-কলেজের সংখ্যা বেড়ে যায়। কলেজীয় ও পোস্টগ্রাজুয়েট শিক্ষার সুযোগ বাড়তির ফলে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অথচ চাকুরীর ক্ষেত্র খুবই সীমিত ছিলো। স্বাধীন উপজীবিকা হিসেবে ওকালতি এ-যাবৎ যে ভূমিকা নিয়েছিলো, অধিক ভিড়ের ফলে তার সুযোগ অনেক সংকুচিত হয়ে পড়ে। শিক্ষকতার আকর্ষণ তেমন ছিলো না, কারণ তা থেকে ভদ্রভাবে জীবন-যাপন করার মতো আয় হতো না। বাঙালীর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং বাংলার প্রাদেশিক সীমানা পুনর্বিন্যাস বহির্বাংলায় তরুণদের বসবাস ও জীবিকা নির্বাহের উপায় কতকটা নষ্ট করে ফেলে—শাসকরাও বাঙালী তরুণের সর্বনাশা প্রভাব থেকে সে-সব অঞ্চল মুক্ত রাখতে প্রয়াসী ছিলেন। স্বাধীন অন্য কোনো জীবিকা সন্ধান ও শিল্পোদ্যোগ তখনও তাদের লক্ষ্য হয়নি। ফলে শহরে নগরে শিক্ষিত-বেকারের সংখ্যা স্ফীত হয়ে ওঠে। তারা শহরে ভিড় জমাতে থাকে—

মুখ্যত প্রাদেশিক রাজধানী কলকাতায়, গৌণত অন্যান্য মফস্বল শহরে। আগে থেকে শহরের সঙ্গে শিক্ষা ও কর্মের সূত্রে যে যোগ ছিলো তা আরও অব্যবহিত হয়ে ওঠে। ম্যালেরিয়ার অত্যাচার, জমির উৎপাদন থেকে জীবন-নির্বাহের কষ্টকরতা, সাংস্কৃতিক আলোবাতাসহীন ও দলাদলি-ভরা গ্রামীণ জীবনের দুঃসহতা এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধা যুক্ত শহরবাসের মোহ—এই সব ছিলো তার কারণ। এছাড়া শহরগুলির উপকণ্ঠে স্থাপিত কলকারখানায় চাকুরী সূত্রেও সেখানে থাকার প্রয়োজন বাড়তে থাকে। এদিক থেকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ ছিলো কলকাতার—উনিশ শতকের আদি পর্বে প্রথম কলকাতা আমাদের জাতীয় জীবন ও কৃষ্টির কেন্দ্রে পরিণত হয়, তারপর থেকে তার প্রাধান্য বাড়তে বাড়তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে একচ্ছত্র আধিপত্যের আকার নেয়। তার বাইরে কিছু প্রতিপত্তি ছিলো পূর্ববঙ্গের বৃহত্তম শহর ঢাকার, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তার গুরুত্ব ও জনসমাগম বৃদ্ধি পায়। সে যাই হোক, কলকাতা ও অন্যান্য বড়ো শহরগুলির জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাও বৃদ্ধি পায় এবং সেই সব সমস্যার ফল হিসেবে সমাজে ও জীবনে দুঃখ ও অবসাদের ভাগ চক্রবৃদ্ধিহারে জমতে থাকে। পুরুষের জীবনের এই প্যাটার্ন মেয়েদের জীবনকেও অবিকৃত থাকতে দেয় নি ; তাদের বিয়ের বয়স যতই বাড়তে থাকে ততই স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন ও আয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর তারই অনিবার্য পরিণাম হিসেবে দেখা দেয় পারিবারিক বিন্যাসের পরিবর্তন, নারীপুরুষের সম্পর্ক ও সমাজে মেয়েদের স্থান নিয়ে নতুন করে ভাববার প্রয়োজনীয়তা।

মোট কথা, প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কাল বাংলাদেশের পক্ষে মোড় ফেরার কাল—জীবনচর্যায় ও মানসিকতায়। আমাদের সংস্কৃতিতে যে পূর্ববাহিত গ্রামীণ সুর ছিলো তাকে ছাপিয়ে বড়ো হয়ে উঠলো আধুনিক যুগের নাগরিক সুর, আমাদের বদ্ধজল জীবনের প্রাঙ্গণে বিশ্বের স্রোত আরও বেশী অর্থবহরূপে এসে পৌঁছলো। আমাদের নাগরিক জীবন দেশের প্রকৃত ও সহজ জীবন থেকে দূরে যাচ্ছে বলে আর্তনাদ করে উঠেছিলেন রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মতো কেউ কেউ (বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন, ১৩২১-২২), কিন্তু কোনো ঐরাবতই সেই নবগঙ্গার গতি রুখতে পারে না। সে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে তার ভালোমন্দ, আশানৈরাশ্য ও ভাঙাগড়াসহ।

এবার প্রাক্-কল্লোল কালের বাংলা সাহিত্যের রূপরেখার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

প্রত্যেক কবিকেই, যদি তিনি ইতিহাসের প্রক্রিয়ার মধ্যে বেঁচে থাকতে চান, পূর্বগামীদের থেকে সরে আসতে হয় কিংবা নিশ্চিন্ত স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

করতে হয়। আপন কবিসত্তার নির্মাণের সেই দায়ে রবীন্দ্রনাথ কৈশোরেই এগিয়ে গিয়েছিলেন মধুসূদনের ধ্রুবকল্প নতুন সাম্রাজ্য এবং বিষয়মগ্ন গীতলতার উৎসমুখ উৎখাত করার দিকে। কিন্তু সেই ঋণাত্মক কর্মিষ্ঠতায় নিজেকে অন্য রকম দেখালেও নিজস্ব পৃথিবীর প্রতিশ্রুতি ছিলো না। তাই রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের কাব্য থেকে স্বপ্নচারিতা ও সৌন্দর্য-সংকেত গ্রহণ করে নতুন পথে যাত্রা করলেন এবং অনতিবিলম্বে তাঁকে অতিক্রম করে আত্মগৌরবী সাহিত্যাচল রচনা করলেন। নব্য রোমান্টিক দুর্গে সৌন্দর্য কল্পনার অন্তর্বাসের ওপর আস্তিক্যবুদ্ধি, অধ্যাত্মবিবেক ও অতীন্দ্রিয় রহস্যরসের সোনালি সাজে তিনি রাজসিকভাবে স্বয়ংবৃত হলেন।

কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়েও স্বয়ংনির্দিষ্ট শিল্পমণ্ডলে রবীন্দ্রনাথ আজীবন বন্দী হয়ে রইলেন না। বিহারীলালের বীজমন্ত্র উচ্চারণ করে যে রাবীন্দ্রিক সাহিত্য জগৎ তিনি এক সময়ে গড়েছিলেন এবং সেখানে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে বাংলা সাহিত্যের সর্বস্তরে বটের ঝুরি নামাতে শুরু করেছিলেন, নিরন্তর জিজ্ঞাসা ও সংকটানুভবে তার রদবদল ঘটিয়ে চললেন। তাঁর কবিস্বভাবের এই পরীক্ষাসংকুল ক্রমিকতা একদিকে আত্মাবিষ্কারের তৃপ্তিহীন আকুলতা থেকে উৎসারিত, অন্যদিকে কালের যাত্রা ও মাত্রার সঙ্গে সন্নদ্ধ। তাই তাঁর দীর্ঘায়ত কবিজীবন বর্তমানের ভেতরে থেকেই ভবিষ্যৎ ভাবনায় নিয়ত উজ্জীবিত, ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় আভ্যাসিক পৌনঃপুনিকতায় কখনও ক্লান্তিকর নয়। হয়ত মৌল বিশ্বাসের ধ্রুববীজটি কবির সেই আত্মহননের মধ্যেও নষ্ট হয়ে যায়নি, তবু তাঁর মনোজগৎ ও শিল্পজগৎ বারংবার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ফলে কোনো স্থবির মহিমা অর্জন করতে সমর্থ হয়নি।

আসল কথা, রবীন্দ্রনাথের কালজ্ঞান ও ইতিহাসের সত্যবোধ ছিলো রক্তমাংসের মতোই অব্যবচ্ছেদী। এ সত্য তাঁর শিক্ষিত মানসে ও মননে অনুস্যূত হয়ে ছিলো যে, কাল চিরযাত্রী। আর

'পদাতিক পথিক চলতে চলতে
পাত্র তুলে ধরে,
পায় কিছু পানীয় ;
পান সারা হলে
পিছিয়ে পড়ে অন্ধকারে ;
চাকার তলায়
ভাঙা পাত্র ধুলায় যায় গুঁড়িয়ে।
তার পিছনে পিছনে
নতুন পাত্র নিয়ে যে আসে ছুটে,

পায় নতুন রস,
একই তার নাম,
কিন্তু সে বুঝি আর একজন।'

—৪৩ নং, শেষ সপ্তক।

ফলত রবীন্দ্র-কাব্যের ক্রমমুকুরে প্রতিফলিত হয়েছে একই নাম নিয়ে নানা জনের মূর্তি। ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর সীমানায় নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা রচিত হয়েছে। আত্মবিলুপ্তির আশঙ্কায় তিনি আর্তনাদ করেন নি।

কিন্তু পরিবর্তমান ইতিহাসের তাগিদে নিজেকে ভেঙে নানান খানা করে দেখবার কর্মিষ্ঠতা রবীন্দ্রনাথের যতোই থাকুক না কেন তিনি প্রাথমিক স্তরে বিশ্বাসের যে শিলালেখটি রচনা করেছিলেন তাকে কালের ঝড়-ঝাপটা থেকে তিনি বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভেই তাঁর বিশ্বাসের প্রাকারে আক্রমণ এলো চতুর্দিক থেকে, তাঁর আত্মস্থতাব সুদৃঢ় বলয়ে ভাঙনের কামড় প্রকট হয়ে উঠলো। তাই তখন তিনি খুঁজলেন নতুন করে বাঁচবার প্রাণস্তোত্র। যে যৌবনকে ছেড়ে এসেছেন সে যৌবনকে পুনরুদ্ধার করার জরুরী সূত্রটি তাঁর কাছে সেই সময় অনাবৃত করে দিয়েছিলো সবুজপত্র।

'এমন সময়ে আমাকে ডাক দিলে
তোমার সবুজপত্রের আসরে।
আমার প্রাণে এনে দিলে পিছুডাক,
খবর দিলে,
নবীনের দরবারে আমার ছুটি মেলেনি।
দ্বিধার মধ্যে মুখ ফিরালেম
পেরিয়ে-আসা পিছনের দিকে।
পর্যাপ্ত তারুণ্যের পরিপূর্ণ মূর্তি
দেখা দিল আমার চোখের সম্মুখে।
ভরা যৌবনের দিনেও
যৌবনের সংবাদ
এমন জোয়ারের বেগে এসে লাগেনি আমার লেখনীতে
আমার মন বুঝল
যৌবনকে না ছাড়ালে
যৌবনকে যায় না পাওয়া।'

—৪৫ নং, শেষ সপ্তক।

কিন্তু তিনি আর একবার নতুন হলেন বটে যৌবনায়মান প্রাণকে পুনরাবিষ্কার করে তবু প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগ-যন্ত্রণা ও জটিল মানসিকতা তাঁর সম্যক মনঃসংযোগ ঘটাতে পারে নি বলে মনে হয়। অবশ্য তা সম্ভবও ছিলো না। তিনি অবশ্য নতুন কবিগ্রহ-মণ্ডলকে কাছে টানতে চাইলেন, আধুনিক কবি হয়ে নিজেকে নতুন কালের একজন বলে প্রমাণ করতে চাইলেন। কিন্তু তার আগেই বিদ্রোহী নব্য-পন্থীদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে গেছে যে, রবীন্দ্রনাথকে পেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। আর সেই সুযোগে নতুন বিশ্বাসের ধ্বজা উড়িয়ে কল্লোলের আসরে এসে জমা হয়েছিলেন একদল তরুণ কবি।

একথা সত্য যে, রবীন্দ্র-কাব্যের গীতল চারিত্র অনেকের ওপর মোহের জাল বিস্তার করেছিলো, দেখা দিয়েছিলো রবীন্দ্রানুসারী কবি-সমাজ। কেউ কেউ আরম্ভে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের দ্বারস্থ হয়েও অনতিবিলম্বে প্রত্যাবর্তন করেছেন রাবীন্দ্রিক আদর্শের কুহকলোকে। আবার কয়েকজন প্রতিভার সারবত্তায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিস্পর্ধী না হয়েও স্বর্ধাবর্তের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন কবি-জনোচিত জেদের বশে। অক্ষমদের গঞ্জনা বাদ দিলে আর যাঁদের কাব্যগত তিরস্কার শোনা গিয়েছে তাঁদের অন্যতম হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তাঁর কবি-শক্তি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দ্বারাও স্বীকৃত। সর্বব্যাপী রবীন্দ্র-প্রভাবের দিনে তিনি স্বখাত সন্ধান করেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের কলাকৈবল্যবাদ, অনুপ্রেরণা-ধর্ম, শুদ্ধসৌন্দর্যসূত্র অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদ ও অধ্যাত্ম বিবেকপ্রবণতা সমর্থন করতে পারেন নি। রাবীন্দ্রিক আদর্শের অনিবার্য পরিণাম যে ব্যঞ্জনাপ্রাধান্য ও অস্পষ্টতা তাও তাঁর মনোহরণ করে নি। বাংলা কাব্যে তাঁর আবির্ভাব বিপরীত বৃত্তক্রান্তি থেকে। কতকটা অনতিভব্য বস্তুবোধ, সামাজিক নৈতিকতা, জ্ঞানাত্মক বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাবুকতার বাঙালীয়ানা দ্বিজেন্দ্রলালের কবিস্বভাবে এসে ভীড় জমিয়েছিলো। রবীন্দ্র-সুলভ কল্পনাপ্রবণতা ও স্বপ্নচারিতার বদলে বুদ্ধিমানের তার্কিকতা ও বাস্তববাদীর মনোভঙ্গি তিনি আমদানি করতে চেয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের এই দ্রোহাত্মক নিজস্বতার একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। বাংলা কাব্যে রবীন্দ্র-প্রভাবের সর্বতোমুখী আধিদৈবিকতায় দ্বিজেন্দ্রলালের তিরস্কারাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি বাঙালীর কাব্য সাধনায় অন্তত কিছুটা মানসিক খোলা হাওয়ার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলো।

রবীন্দ্র-বিরোধী কবি রূপে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গেই মনে পড়ে প্রমথ চৌধুরীর কথা। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক মানুষ ও অতি নিকট আত্মীয় হয়েও তাঁর সম্ভবপর প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। কবিগুরুর সার্বভৌম ও সর্বাশ্রয়ী

প্রতিভা ছিলো। সেই রবিরশ্মিজালে ধাঁধিয়ে গিয়েছিলো সেই যুগের অন্যান্য কবি-সাধকের দৃষ্টি। কিন্তু রবীন্দ্র-যুগে আবির্ভূত হয়েও প্রমথ চৌধুরী আপন বৈশিষ্ট্যে ছিলেন আপনি স্বতন্ত্র। তাঁর কবিতায় আছে এক ভাববিমুখ আবেগহীন কল্পনা-মোহ-বর্জিত মনের, প্রজ্ঞাবিজড়িত মননাশ্রিত জীবনের স্বাক্ষর। এবং সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের কবিতার চরিত্রের সঙ্গে বীরবলী কবিতার চরিত্রের ভেদ আছে। তাঁর কবি হওয়ার পেছনে ছিলো রবিচক্র থেকে সরে এসে স্বয়ংবৃত্ত হওয়ার সংকল্প। রবীন্দ্র-যুগের ছায়াকবিরা কবিগুরুর কবিতার তরলায়িত সংস্করণ সৃষ্টিতে ঝুঁকে পড়ায়, রবীন্দ্রনাথের অক্ষম অনুকরণ সেকালের কাব্যগত ফ্যাসান হওয়ায় প্রমথ চৌধুরী বিরক্ত হয়েছিলেন। সেই অক্ষম অনুকারকদের চোখে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভাবের বেগ ও বহিঃসৌষ্ঠবই ধরা পড়েছিলো, কিন্তু তার তলায় সংযমের যে কঠিন মাটি ও তার ভেতরে শক্তির যে বলিষ্ঠতা ছিলো তা তাঁরা ধরতে পারেন নি। ফলে সংযমবিহীন আবেগধর্ম ও চিন্তার শৈথিল্য বাংলা কাব্যের মধ্যে একটা ঢিলে-ঢালা ভাব সৃষ্টি করতে শুরু করে। কিন্তু কোনো দেশের কাব্যের পক্ষেই এই ধরণের অনুকরণাত্মকতা ও অসংযম স্বাস্থ্যকর নয়। এই সাহিত্যিক অপচয় রোধ করবার মনোভাব নিয়ে প্রমথ চৌধুরী ভাস্কর্যধর্মী সনেট রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।[৪] এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী যে কবিতা লিখেছিলেন, তা উদ্ধারযোগ্য—

প্রবাসে চলিয়ে গিয়েছে রবি।
এই ফাঁকে হও নূতন কবি॥
নূতনের আজ জরুর বড়।
এই বুঝে নব সাহিত্য গড়ো॥
বড়র আওতা না বুঝে মাগো,
বড় হতে চাও— ফাঁকায় ভাগো॥
সাহিত্যজগতে থাক্‌-না রাজা।
পূজা নয় তাঁর তামাক সাজা॥
মাছি মারা শুধু নকল করা
মাছি মারা নয় নিজেই মরা॥
প্রকৃতি কাহারো রক্ষিতা নয়।
সবারি গলাতে জড়ায়ে রয়॥
সে রস তাহার পরশে পাও
নিজের জবানি কবুল খাও॥

—নূতন কবি।[৫]

সুতরাং এই একজন প্রমথ চৌধুরীও 'গদ্যের কলমে লেখা পদ্যগুলিতে' বুদ্ধি-মার্জিত তির্যক মনোভঙ্গি ও তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার রচনাশৈলী নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বাঁধা পথ থেকে সরে এসেছিলেন।

মোহিতলাল মজুমদার কল্লোল সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশের সমবয়সী এবং কল্লোলের অন্যতম কবি হলেও কবি হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা ঘটেছিলো কল্লোলের জন্মের আগেই। তিনি কল্লোল, কালি কলমের কবি হওয়ার আগে হয়েছিলেন বীরভূমি-মানসী-বাণী ও ভারতী-প্রবাসীর কবি। কল্লোলের জন্মের দু'বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিলো (১৩২৮) তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'স্বপনপসারী'। এর মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে একটা নতুন সুর—যা রবীন্দ্র-কাব্যের সংস্কার বিরোধী। সত্য বটে এর মধ্যে রোমান্টিক কল্পনার অসদ্ভাব নেই, মানুষ-জীবন-প্রকৃতির সহজ সত্য ও সৌন্দর্যে মাত্র কবি অবগাহন করেছেন ; তবু একটা অকৃত্রিম পৌরুষের তাড়নায় জন্ম-মৃত্যুর সীমানায় বাঁধা জীবনের আসবকে আকণ্ঠ পান করার তৃষ্ণায়ও তিনি এখানে উদ্বেল। ধর্মের ধ্বজায় ও মন্ত্রতন্ত্রে তিনি তাঁর প্রাণের পূর্ণতা খোঁজেন নি ; তিনি চেয়েছেন জীবনের সব হাসি ও কলরবকে বুকের মধ্যে টেনে নিতে। তাঁর অনাধ্যাত্মিক জীবনপ্রেম ও সাহসিক ভোগপ্রবণতার সোচ্চার ঘোষণা—

জীবন মধুর ! মরণ নিঠুর—তাহারে দলিব পা'য়,
যতদিন আছে মোহের মদিরা ধরণীর পেয়ালায় !
দেবতার মত কর সুধাপান—
দূর হয়ে যাক হিতাহিত জ্ঞান !
আমরা বাজাব প্রলয় বিষাণ শম্ভুর মত তুলি'—
টিটকারী দাও মৃত্যুরে, ধর মড়ার মাথার খুলি !

—অঘোর-পন্থী।

ত্যাগ নহে, ভোগ,—ভোগ তারি লাগি', যেই জন বলীয়ান্,
নিঃশেষে ভরি' লইবারে পারে, এত বড় যার প্রাণ !

—পাপ।

তাঁর অকুতোভয় কবি-প্রাণ 'স্বপন-পসারীর' মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সোনার খাঁচা স্বীকার করেও তাকে ত্যাগ করতে চেয়েছে, বেরিয়েছে নতুন অরুণাচলের সন্ধানে। তাই মোহিতলালের এই রবীন্দ্র-প্রতিস্পর্ধী কবিসত্তার কাছে কল্লোলের তরুণতম কবিরা গত্যন্তর খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি আধুনিকদের চোখে হয়ে উঠেছিলেন রবিদ্রোহিতার অগ্রবর্তী প্রাণ-পুরুষ।

মোহিতলালের সঙ্গেই উচ্চার্য আর একটি নাম যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। তিনিও আগে থেকে রবীন্দ্র-তট ভেঙে চলেছিলেন, সেই ভাঙনের কাজ চালাতে চালাতে এসে ভিড়েছিলেন কল্লোলের কূলে। কল্লোলের কবিগোষ্ঠীর কাছে তাই তিনি ছিলেন আরাধ্য। আজীবিকায় যিনি বাস্তকার; সৃষ্টির বস্তুবিন্যাসে সৌষম্য তাঁর লক্ষ্য; কিন্তু দুঃখের কথা, যতীন্দ্রনাথ বিশ্বকর্মার সৃষ্টিলোকে সেই প্রত্যাশিত সৌষম্যের সাক্ষাৎ পান নি। তিনি তাতে দেখেছেন শুধু গোঁজামিল। আর তার অনিবার্য পরিণামে তিনি মেনে নিলেন সৃষ্টির পরম সত্য দুঃখকে। রবীন্দ্রনাথও দুঃখকে অঙ্গীকার করেছেন, কিন্তু তাঁর চোখে দুঃখ শেষ পর্যন্ত আনন্দ লাভের একটা অপরিহার্য ধাপ মাত্র। দুঃখের অশ্রুজলে জীবনের রাজ্যাভিষেকে তিনি বিশ্বাসী, সত্যের দারুণ মূল্য হিসেবেই দুঃখের তপস্যায় তাঁর আস্থা। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যেখানে সৃষ্টির মধ্যে আনন্দরূপ খুঁজেছেন, সেখানে প্রথম কাব্য 'মরীচিকা'য় (১৯২৩) যতীন্দ্রনাথ খুঁজে চলেছেন দুঃখের রুদ্রমূর্তি। উপনিষদের যে অমৃত বাণীতে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ সুস্থিত, তাকে তিরস্কার করে যেন যতীন্দ্রনাথ বলতে চাইলেন—সর্বব্যাপী দুঃখ থেকেই এই সমস্ত প্রাণী জন্মাচ্ছে; সেই সর্বব্যাপী দুঃখের দ্বারাই এই সমস্ত প্রাণী জীবিত আছে, সেই সর্বব্যাপী দুঃখের মধ্যেই এরা গমন করে, প্রবেশ করে।

তোমার নিঃশূন্য গর্ভ হতে,
রক্তালোক স্রোতে
ভরি' দিয়া ব্যোম,
যে দিন প্রথম
জন্ম মাত্র শিশু-বিশ্ব করিল ক্রন্দন
ওম্ ওম্ ওম্—
তুমি মাতা মূর্চ্ছাগতা
কে করে সান্ত্বন!—

—অন্ধকার।

ধূ ধূ করে মরুভূমি, যত চলি জীবনে,
মরীচিকা পিছাইয়া যায়;
শুধু দাহ, শুধু তাপ এ মানব ভবনে
কোথা প্রেম নিত্য রস পায়?

—প্রেমের স্পর্ধা।

মিলন বিরহ ভাব ও অভাব যোগবিয়োগের কাজ,
থেমে গিয়ে যবে এ বিশ্ব হবে ভস্মের মহাতাজ,

বিভূতিভূষণ শঙ্কর একা রহিবেন যেই কালে
তখনোও কি তুমি আপন জ্বালায় জ্বলিবে তাহারি ভালে ?

—বহ্নিস্তুতি।

হে বিরাট ? আজ হেরি যেন এত দুঃখের নাহি তর ;
চির বর্ষণে ফুরায় না তবু অফুরান' আঁখিলোর !
ওগো অক্ষয় বট !
যত বেড়ে যাও আপনি ছড়াও শত দুঃখের জট।

—ঘুমের ঘোরে।

যতীন্দ্রনাথের কণ্ঠে এই দুঃখের ধ্বনি শোনা গেছে কল্লোলের জন্মের আগে। রবীন্দ্রনাথের আনন্দমণ্ডপে যখন জীবনের উৎসব গান মুখরিত তখন এই বেসুরো গান ধরেছিলেন তিনি। কবিগুরুর সৌন্দর্য-ভাবাতুর কাব্যকলা ও ধ্বনি-মসৃণ কারুকলার পাশে উপস্থাপিত হয়েছিলো তাঁর কাব্যের তির্যক মনোভঙ্গি ও অনতিভব্য শিল্পকর্ম। এবং তাতে রবীন্দ্রকাব্যমণ্ডলে ধ্বস নামিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও ছিলো।

বাংলা কাব্যে এই অ-রাবীন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ ও সুরের ক্রমাভিব্যক্তিতে নজরুল ইসলামেরও একটা দান আছে। তাঁর জীবনের চলন বোহেমীয়, অনেকটাই বিশৃঙ্খল—এই বেপরোয়া ভাব তাঁর মনের চরিত্রে, বিশেষ করে তার আদি পর্বে, এনে দিয়েছিলো একটা উদ্দাম উল্লাস। সেই উল্লাসে বেগ সঞ্চার করেছে পল্টনী পর্যায়ের বিচিত্র অভিজ্ঞতা—প্রায় বিস্ফার ঘটিয়েছে পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রগুলির প্যান-ইসলামিজম ও কামাল পাশার রিপাব্লিকানিজমের স্বপ্ন, খেলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ, চিত্তরঞ্জনের স্বদেশ সাধনার বলিষ্ঠতা। এর ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় তাঁর শিল্প-স্বভাবে যে উদ্দীপনা জাগে তারই সৃষ্টি তাঁর প্রথম কাব্য 'অগ্নিবীণা' (১৩২৯)। আর এই অগ্নিস্রাবী কাব্যের জন্যই তিনি পেয়েছেন কবি-বিদ্রোহীর সম্মান, আখ্যাত হয়েছেন চড়া গলার কবি বলে। বাংলা কাব্যে এমনতর উচ্চকণ্ঠের উচ্চারণ পূর্বে শোনা যায়নি। অন্য দিকে তাঁর গজল গানের ফার্সি আবহাওয়া বাংলা দেশের সঙ্গীতলোকে একটা নতুন স্বাদ আমদানী করেছিলো। এ সবই রবীন্দ্র কাব্যবলয়ের বহির্ভূত এবং সেই কারণেই সুর-স্বাতন্ত্র্যে তার আছে একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য। মনে রাখতে হবে, 'অগ্নিবীণা'র কবির আবির্ভাব কল্লোলের জন্মের প্রাক্-লগ্নে।

নজরুলের অগ্নিবীণার রুদ্র ঝংকার তৎকালীন বাঙালী পাঠকের কাছে নতুন মনে না হয়ে পারে নি, তার প্রাণ-মনের নতুন পিপাসা তাতে অনেকটা পরিতৃপ্ত

হয়েছিলো। হতে পারে নজরুলের কাব্যখানির দুটি সুখ্যাত কবিতার—'প্রলয়োল্লাস' ও 'বিদ্রোহী'র কিছু প্রেরণা এসেছিলো রবীন্দ্রনাথেরই দুটি কবিতা—'দুরন্ত আশা' (মানসী) ও 'বিজয়ী' ('পূরবী') থেকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে, মোহিতলালের 'আমি' শীর্ষক গদ্য প্রস্তাবটির (মানসী, পৌষ, ১৩২১) সঙ্গে 'বিদ্রোহী'র ভাব-সাদৃশ্য অনেক বেশি। সে যাই হোক, এই নতুন কবির নতুন সুরের কবিতাকে সম্বর্ধনা জানাতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' (১৯২৩) গীতিনাট্য নজরুলকে উৎসর্গ করেন ; প্রায় গুরুর ভূমিকা নিয়ে মোহিতলাল স্বাগত মন্ত্র উচ্চারণ করেন—

মানস-আকাশে রক্ত-সাগরে ডুবিছে রবি ?
কাল-নিশীথিনী বধূ কি তোমার, মরণ-লোভী ?
এতটুকু আলো কোথাও নাহি রে ! সৃষ্টি শেষ।
চিতায় চিতায় ফুৎকারি তাই ফিরিছ কবি।...
হে কবি নবীন জীবন তোমার মুক্তধারা।
তুমি গাও গান—শুনিবে সকলে নিদ্রাহারা
দাও বিশ্বাস, দাও আশ্বাস—অভয় বাণী
আলোক-আঘাতে ভেঙে দাও এই আঁধার কারা।

—কবি বিদ্রোহীর প্রতি।[৬]

রবির এই অস্তগামিতার কথা শুধু রূপকার্থেই সত্য নয়, সাহিত্যিক অর্থেও যে সত্য তার প্রমাণ আছে নজরুলের কবিতায়।

রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে আসার বা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের এই সব কাব্যগত প্রয়াস এবং বাংলা কাব্যে নতুন সুর সৃষ্টির এই নানা আয়োজন যখন চলছিলো তখন গল্প-উপন্যাসেও দেখা যাচ্ছিলো বলিষ্ঠ পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা। শিল্প প্রকরণগত যে ছক বঙ্কিম বেঁধে দিয়েছিলেন সেটা পরবর্তীকালেও অচল হয়ে যায়নি, যদিও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও চরিত্রগঠনশৈলী আরও যুক্তি-সঙ্গত রূপলাভের দিকে ক্রমাগত ঝুঁকেছে। তবে বঙ্কিমের আমল থেকে যা নিয়ে নানা অভিযোগ ও কোলাহল বেশি শোনা গেছে তা হচ্ছে সাহিত্যের বিষয় ও লেখকের মনোভঙ্গি নিয়ে। বস্তুত এই দ্বিতীয় বৃত্তেই সাহিত্যকারদের মনঃসংযোগ ও পরীক্ষাত্মকতা অধিকতর প্রকট হয়ে উঠতে দেখা যায়। এবং তারই মধ্যে থেকে দুর্নীতি ও অশ্লীলতার নানা উপাদান খুঁজতে থাকেন নতুন পুরনো সব মহলের কিছু কিছু লোক।

যে বিধবার প্রেমের দৃষ্টান্ত রেখে বঙ্কিম তথাকথিত অপরাধ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'তে তার আরও বাস্তবিক ও মনস্তত্ত্বসম্মত ব্যাখ্যা খুঁজেছিলেন। এবং সেই বলিষ্ঠ মানসিকতার জন্যই শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে 'চোখের বালি' (১৯০৩) হয়ে উঠেছিলো আধুনিক উপন্যাসের পথিকৃৎ। তাঁর 'বড়দিদি' ও 'পল্লীসমাজ' সেই একই দৃষ্টিসূত্র অবলম্বন করে লিখিত। অন্যপূর্বা নারীর সধবা অবস্থায় পূর্বপ্রেমের জের টানার উদাহরণ বঙ্কিম সাহিত্য থেকে উৎসারিত হয়ে শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' ও 'স্বামী'তে আরও দৃঢ়ভাবে স্বীকৃত হয়েছে। এই অসামাজিক প্রেমকে বাংলা উপন্যাসে বিশ শতকের প্রারম্ভে নূতন করে রূপ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন বিবাহিত অবস্থায় অন্য পুরুষের প্রতি প্রেম সঞ্চারের কাহিনী রচনা করে—লিখলেন শতাব্দীর আরম্ভে 'নষ্টনীড়' (১৩০৮) এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬)। আর দেখালেন 'স্ত্রীর পত্র'-এর (১৩২১) স্বামীর চরণাশ্রয়ছিন্ন মৃণালকে। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ সমাজনীতির প্রাকারিক মহিমা ও জীবনের স্থির মূল্যবোধের প্রশ্ন তুলেই ক্ষান্ত হলেন না, তার ভিত্তিতে ধ্বংসাত্মক খননকার্য চালিয়ে দুঃসাহসিক নেতৃত্ব দিয়ে গেলেন। শরৎচন্দ্রও পেছিয়ে রইলেন না—'চরিত্রহীনে'র (১৯১৭) কিরণময়ী ও 'গৃহদাহের' (১৯২০) অচলাকে তিনি উপস্থাপিত করে প্রেমের শারীরিক প্রতিক্রিয়া এবং ব্যক্তিনীতির নতুন সত্যকে স্থায়িত্ব দিলেন। তাঁর হাত ধরে গণিকার প্রেমও বাংলা উপন্যাসের রাজসভায় এসে উপস্থিত হলো। অনুবাদ-গল্পের নরনারীর স্বাধীন যৌন-জীবন আগে থেকেই পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বাঙালীর অঙ্গনে এসে পৌঁছচ্ছিলো (যেমন প্রমথ চৌধুরীর অনূদিত মেরিমোর 'ফুলদানী' গল্প)।

কল্লোল-পূর্ববর্তী কালে এই নারী-সমস্যা সামাজিক বিদ্রোহ ও যৌনবাস্তবতার রূপ নেয় নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের গল্প-উপন্যাসে। নরেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়ে'র ঢঙে লিখলেন 'ঠানদিদি' (১৯১৮)। 'শুভ্রা' (১৯২০), 'শাস্তি' (১৯২১), 'পাপের ছাপ' (১৯২২), 'দস্তুগিন্নী' (?), 'দ্বিতীয় পক্ষ' (১৯১৯), 'অগ্নিসংস্কার' (১৯২০) ইত্যাদি কাহিনীতে নর-নারীর জীবন ও নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে তিনি সাহসিক মনোবৃত্তির পরিচয় দিলেন। বিবাহিতা নারীর স্বামী-গৃহ ত্যাগ ও প্রণয়ীর নিকট আত্মসমর্পণ, প্রৌঢ়া নারীর পরপুরুষে গোপন আসক্তি, যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা ও পাপাচারের চিত্র রচনায় তিনি প্রায় নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার বশবর্তী হয়ে এক ধরনের আধুনিকতার প্রবর্তন করলেন। চারুচন্দ্র বিদেশী উপন্যাসের অনুসরণে যে সমস্ত গল্প-উপন্যাস লিখলেন—যেমন 'চোরকাঁটা' (১৩২৬), 'যমুনাপুলিনের ভিখারিণী'

(১৩৩০), 'দোটানা' (১৩২০), 'স্রোতের ফুল' (১৩২২) 'পঙ্কতিলক' (১৯১৯) ইত্যাদি—তাতে যৌন-বিষয়ে নরেশচন্দ্রের মতোই দুঃসাহসিকতার পরিচয় ছিলো। সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত রবীন্দ্রনাথের রচনার তথাকথিত বস্তুতন্ত্রহীনতার বিরোধিতা করতে গিয়ে যে 'ডালিম' (১৩২১) গল্প সৃষ্টি করলেন তাতেও নরেশচন্দ্র-চারুচন্দ্রের যৌন-বাস্তবতারই আরেকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গেলো। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'নারায়ণে' প্রকাশিত 'ডালিম', 'মরণে জয়', 'হাসির দাম', 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা', 'বিভাকর', ইত্যাদি গল্পকে 'গণিকাতন্ত্র-সাহিত্য' নামে অভিহিত করেন (১৩২৬)।

যে দেশ-কালের আবহাওয়ায়, বাস্তব ও সাহিত্যিক ভিত্তিভূমিতে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের নতুন মানুষদের মনোজগৎ সংগঠিত হয়েছিলো তা আমরা দেখলাম। দেশ ও বিদেশ উভয়ই তাদের মনের গড়নে কিছু-না-কিছু কার্যকর উপাদান জুগিয়েছিল তবে সমকালের দেশী ও বিদেশী সমস্ত ক্রিয়া-প্রক্রিয়া যে সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে একই ভঙ্গিতে দেখা দিয়েছিলো এমন কথা বলা অনৈতিহাসিক ও অযৌক্তিক হবে। সচেতন মনের ধাত সকলের সমান তো নয়, একই দেশ-কালের আবহাওয়া থেকে সব প্রাণ সমপরিমাণ খাদ্য আহরণ করতে পারে না এবং সেই ব্যক্তিগত মানসিক যোগ্যতার তারতম্যের জন্য আত্ম-সংগঠনের ক্ষেত্রেও তারতম্য দেখা দেয়। তবু সব মিলিয়ে বিচার করলে যুগের মানুষগুলির ধাতু-প্রকৃতি ও প্রবণতা বুঝতে কষ্ট হয় না। কল্লোলগোষ্ঠী তাঁদের প্রায়-কিশোর মন নিয়ে জীবনের মুখোমুখি হয়েছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কাল-পরিবেশে। সে যুগের নতুন মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁদের ক্ষেত্রেও উপস্থিত ছিলো, সন্দেহ নেই, তবু তাঁদের সাহিত্যিক মনের রসায়নে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি কী ভাবে কতখানি সংরক্ষিত ও সংহত হয়েছিলো সেটাই কল্লোল-যুগের সাহিত্য-বিচারে প্রধান লক্ষণীয়। বিভিন্ন লেখকের কলমের কাজে যে ভেদাভেদ তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এখানে আমাদের লক্ষ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য সমগ্রভাবে কল্লোলের চারিত্র উদ্‌ঘাটন। তাতেই বোঝা যাবে, কল্লোল নতুন নতুন প্রবণতার প্রবর্তনায় বাংলা সাহিত্যকে কতখানি দিতে পেরেছিল, এবং তার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের পালাবদল কতখানি হয়েছিলো।

যৌবনের জয়পতাকা উড়িয়ে কল্লোলগোষ্ঠীর সাহসিক আবির্ভাব। যে ভাবগ্রন্থি বা বীজকোষ তাঁদের সাহিত্য-চর্চার মূলগত প্রেরণা জুগিয়েছে তা হচ্ছে যৌবনের সজীবতা। তারুণ্যমন্ত্র তাঁদের প্রণবমন্ত্র। প্রাজ্ঞতা ও বিজ্ঞতা নয়, স্থিরবুদ্ধির বিবেচনাও নয়, আবেগ-তাড়িত যৌবন-ধর্মের অবিবেচনাই ছিলো তাঁদের পথচলার পাথের। তাই বিচার নয়—সদর্প আত্মপ্রকাশে তাঁদের উজ্জীবিত হতে দেখি।

আমরা জানি, যৌবন রঙিন কাচের মধ্য দিয়ে জগৎ ও জীবনকে দেখে। সবই তার চোখে রঙিন ঠেকে। যৌবন-বেদনার সে উচ্ছল দিনগুলিতে এক অসহ্য আবেগ, অনন্ত কামনা, অসীম অতৃপ্তি মানুষকে পেয়ে বসে। তাইতো কবিতার বাধাহীন আকাশের মধ্যে যৌবনের বহুবর্ণ রঙ্গরাগ ছড়িয়ে পড়ে। দুরন্ত আবেগ কাব্য-কল্পনার ডানায় ভর দিয়ে বল্গাবিহীন বিশ্বাভিসারে মেতে ওঠে। আর সত্যিকারের কবিতা যখন আবেগনির্ভর, অনুভূতি-চঞ্চল—তখন যৌবনের কবিতাই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ কবিতা। শেলী, কীটস তার উদাহরণ—প্রাক্-তিরিশেই তাঁরা বিশ্বজয়ী কবিতা রচনা করে গেলেন এবং সে-কবিতা যৌবনের গান ছাড়া আর তো কিছু নয়।

কল্লোলের প্রাণ-পুরুষ গোকুলচন্দ্র নাগকে বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন—যৌবন-পথিক, নব-বসন্তের সুরভিত দক্ষিণ বাতাস। তাঁর মধ্যে তিনি দেখেছিলেন—

চিরন্তন যৌবনের অন্তরঙ্গ আনন্দ প্রতিমা,
প্রথম ফাল্গুনে তুমি জাগাইলে সুখ-শিহরণ,
হাসির তরঙ্গ দিয়ে ধৌত করি' ব্যথার নীলিমা
উৎসবান্তে জীবনের শূন্যপাত্র করিলে বর্জন।

এই যৌবন-পথিক গোকুলচন্দ্র কল্লোলের পৃষ্ঠায় 'পথিক' উপন্যাসে বসালেন যৌবনের মেলা। সেখানে কতো নারী-পুরুষের দুরন্ত প্রাণের মিছিল। সকলেই চলছে, চলতে চলতে সুখ-দুঃখের বিচিত্র ঢেউয়ে দোলা খাচ্ছে এবং আপন আপন পথিক-বন্ধুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যৌবনোচিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তারা বাঁচতে শিখেছে। দেখতে পাচ্ছি, কল্লোলের যাত্রারম্ভেই গোকুলচন্দ্র এ-যুগের কাহিনীতে যৌবনের সুর বাঁধলেন। সেই সুরে গলা মেলালেন আরও কতো কবি—

বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে জাগ্‌ল তরুণ প্রাণ ;
জমাট করা অন্ধকারের বিশাল প্রাচীর টুটে
উৎসারিত আলোর পানে বেরিয়ে এস ছুটে—
চক্ষে তাহার নবীন দীপ্তি কণ্ঠে নূতন গান।

—কল্লোল, সুনীতি দেবী।

যৌবনের উচ্ছ্বসিত সিন্ধুতটভূমে
বসে আছি আমি।
দগ্ধ স্বর্ণরেণুসম বালুকণারাশি
লুটায় চরণপ্রান্তে অকৃপণ বিপুল বৈভবে !

—শাপভ্রষ্ট, বুদ্ধদেব বসু।

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগ্‌বগিয়ে খুন হাসে—
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।
আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে
বান ডেকে ঐ জাগ্‌ল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে!

—সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে, নজরুল ইসলাম।

আজ দরজায়
তাই ত' কবি ডাক্ দিয়ে যায়—
ফাগুন ফুরায়—
আগুন জুড়ায়!
মধু-মাসের মহোৎসবে দস্যু হ'য়ে লুটবি কে আয়।
ছিনিয়ে নেবার সাহস যে চাই—
বিনিয়ে কাঁদিস কার ভরসায়?

—কবি-নাস্তিক, প্রেমেন্দ্র মিত্র।

তব দগ্ধ আতপ্ত চুম্বনে
যৌবন উঠুক দুলি' উচ্ছুসিয়া ধরিত্রীর স্তনে।
সঙ্কোচ-লজ্জিত ম্লান যত ব্যথা জমেছিল শীতে,
বাষ্প হয়ে যাক্ উড়ে তব সৌম্য নয়ন-ইঙ্গিতে!
আন আন অগ্নির ঝটিকা,
মরণের যজ্ঞে জ্বাল যৌবনের দীপ্ত হোমশিখা
হে পবিত্র!

—সূর্য, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

যৌবনের এই দীপক-তান শুধু তরুণ লেখকদের সীমা-স্বর্গেই আবদ্ধ ছিলো না, তা উদ্বুদ্ধ করেছিলো বিগত-যৌবন লেখকদেরও। 'সবুজপত্রে' যখন যৌবনকে রাজটীকা দেওয়ার আয়োজন করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও প্রমথ চৌধুরী, তখন যেমন নতুন প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ সবুজ ও কাঁচাদের গান ধরেছিলেন, তেমনি কল্লোলের যৌবনের ডাকে অনেক পুরোনো লেখকেরও প্রাণে সাড়া জেগেছিলো। তার কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

ফুলের কুঁড়ি,
কচি-পাতা
যৌবনেরি নবীনতা

কোথা পাবি বল্?
ঝরা ফুলের
কুঁক্‌ড়ে যাওয়া পাব্‌ড়ি
যত পচা,
কে বলে রে
হয় না তাতে
পূজার অর্ঘ্য-রচা!

—যাত্রা, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

তোমার সংহার মূর্তি জরাজীর্ণ জড়তা জঞ্জাল
দলি যায় দৃপ্ত পদতলে,
প্রাচীনে পশ্চাতে ফেলি নব-পথে ওগো মহাকাল,
তোমার প্রলয়-রথ চলে!...
হে তরুণ! নবমন্ত্র! আজি তব অরুণ উদয়ে
তোমারে জানাই মোর নতি!

—তারুণ্য, নরেন্দ্র দেব।

গল্পেও দেখি, যৌবনের উদ্বেলিত সিন্ধুতীরে দাঁড়িয়ে নতুন লেখকদের উদয়-সূর্যকে বন্দনা করার চেষ্টা। বিভিন্ন লেখক তাঁদের কাহিনীতে যে চরিত্র-মিছিল রচনা করেছেন তাদের সুখ-দুঃখ মিলন-বিরহ ভাঙা-গড়ার ইতিবৃত্তের মধ্যে বার্ধক্যের জরাজীর্ণতা নয়, যৌবনের প্রতিষ্ঠাকামিতার বিচিত্র প্রয়াসই লক্ষণীয়। প্রসঙ্গক্রমে অন্য ধরনের চরিত্র এলেও তরুণ-সমাজের সমস্যাই লেখকদের প্রধান উপজীব্য। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পঞ্চশর' (চিত্রা) গল্পে সেই যৌবনেরই এক অনবদ্য মহিমার কথা—'যৌবনের স্বভাব উপভোগ করা, সে ব্যর্থতা বেদনা হতাশাকেও উপভোগ করতে পারে। যৌবনের ধর্ম অহঙ্কার। সে ব্যর্থতা নিয়েও অহঙ্কার করে। ফুল যদি তার না ফোটে সে ব্যর্থ মুকুলের ব্যথাকে নিয়েই হৈ-চৈ বাধিয়ে তুলতে পারে। যৌবনের জগতে নিত্য উৎসব; অহরহ সেখানে সমারোহ চলছে কোলাহলে। সে উৎসব ফাল্গুনের তোয়াক্কা রাখে না। আষাঢ়ের অশ্রুসিক্ত আকাশের তলেও সে মেতে ওঠে। তার সব সমারোহের পতাকা শুধু খুশীর রঙেই নয়, গাঢ় বেদনার রঙেও কতক ছোপান।'

সেক্স্ বা যৌন-জীবন কল্লোলগোষ্ঠীর একটা প্রধান চিন্তার বিষয় ছিলো। বিষয়টি তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে ছিলো সংযুক্ত, কারণ তাঁরা নিজেরা ছিলেন বয়সে তরুণ। সুতরাং যৌনতার প্রশ্নটি শুধু তাঁদের বুদ্ধির মহলে সীমাবদ্ধ ছিলো

না, বয়সোচিত শারীর-ধর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকায় জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক প্রশ্নেরই আকার নিয়েছিলো। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, পূর্বসূরীরা প্রেম-ভাবনায় ও নর-নারীর যুগল জীবনের চিন্তায় মন বা আত্মার ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ওপর জোর দিয়েছেন, তার চেয়েও জোর দিয়েছেন একটা নীতি-বিধৃত সামাজিক ভারসাম্যের ওপর। ফলে তাঁদের লেখায় শারীরধর্মের প্রকাশ যে সম্ভোগ-স্পৃহা ও প্রজনন-প্রবৃত্তিতে, তা উপেক্ষিত হয়েছে। অথচ সামগ্রিক জীবন তা বাদ দিয়ে নয়। সুতরাং জীবনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ও ছবি আঁকতে গিয়ে তাঁরা স্বভাবতই ঝুঁকে পড়লেন যৌন-জীবনের দিকে এবং পূর্ববর্তীদের উপেক্ষার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় তা নিয়ে বাড়াবাড়িও করলেন। তাঁদের সাহস জুগিয়েছিলো প্রায়-সমকালের কিছু বাঙালী লেখকের যৌন-বাস্তবতা এবং বিদেশী লেখকদের যৌন-স্বাধীনতা।

আধুনিক কালে বিজ্ঞান এ প্রসঙ্গে চিরকালের পাপ-পুণ্য ও যুগানুগ নীতি-দুর্নীতির প্রশ্নটাকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। একালে সম্ভোগ-চরিতার্থতা ও ইন্দ্রিয়জ আনন্দ জীবনের সার্থকতার অঙ্গ, তাতে পাপের প্রশ্ন ওঠে না। বরং এই শারীর প্রবৃত্তিকে চেপে রাখলে গোপন সুড়ঙ্গপথে সামাজিক দুর্নীতির জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। তাই আধুনিক বিজ্ঞান সম্ভোগের বিষয়টাকে জীবনের প্রকাশ্য অঙ্গনে এনে দাঁড় করাবার পক্ষপাতী। তবে সমস্যা হচ্ছে এইখানে যে, সম্ভোগের সঙ্গে প্রজননের সম্ভাব্যতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং সেই সম্ভাব্যতাকে কতটা রোধ করে রাখা যায় সেদিকেই বিজ্ঞানের লক্ষ্য সমধিক। কল্লোলগোষ্ঠী তাঁদের সৃষ্টির আসরে শরীরজ সম্ভোগস্পৃহাকে কতকটা প্রকাশ্য করতে চেয়েছিলেন এবং প্রেমের ক্ষেত্রে শারীরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া যে অবান্তর নয় এ কথাটি প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী ছিলেন। তাতে পাপ যদি কিছু থাকে তা হচ্ছে আদি পাপ এবং তাকে এড়িয়ে যাওয়া শারীরিক জীব মানুষের পক্ষে সম্ভব বা উচিত নয়। তাই কল্লোলীয়রা সামাজিক 'চুপ-চুপ নীতি' উপেক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন। সমাজের জবরদস্তিমূলক নীতিতে এবং তারই অনিবার্য পরিণামে গোপন অসংযমে আমরা সেক্সকে যে বিষ করে তুলেছি তা দেখাতে গিয়ে তাঁরা আঁকলেন রোগ ও বিকৃতির চিত্র। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, কল্লোলগোষ্ঠী সেক্স বা যৌনতার আলোকে জীবন ও সমাজের শুভাশুভের প্রশ্নটাকে নতুন করে যাচাই করতে চাইছিলেন। অবশ্য তাঁদের দৃষ্টি পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক ছিলো না, অনেকটা ঘোলাটে দৃষ্টি নিয়ে তাঁরা যৌন-জীবনের ছবি এঁকেছেন বলে সেগুলো কতকটা বিকৃতির দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। আদি-শক্তি সম্বন্ধে সেগুলি তেমন পরিচ্ছন্ন দৃষ্টির জাগরণ ঘটায়

না। এই কথাটাই কল্লোল-যুগে তুলেছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। তিনি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

'......আমার মনে হয় মিথুনাসক্তি নিয়ে আরেকটু ব্যাপকভাবে ভাববার সময় এসেছে। হঠাৎ একই যুগে এতগুলো ছোট-বড়-মাঝারি লেখক মিথুনাসক্তিকে অত্যধিক প্রাধান্য দিতে গেলেন কেন? দেখে শুনে মনে হয় বিংশ শতাব্দীর লেখক মাত্রেই যেন Keats-এর মতো বলতে চান, "I felt like some watcher of the skies when a new planet swims into his ken." আলিবাবার সামনে যেন পাতালপুরীর দ্বার খুলে গেছে। "শোনো, শোনো, অমৃতের পুত্রগণ, আমি জেনেছি সেই দুর্বার প্রবৃত্তিকে, যে প্রবৃত্তি সকল কিছুর জন্ম দেয়, সে প্রবৃত্তিকে স্বীকার করলে মরণ সত্ত্বেও তোমরা বাঁচবে—তোমাদের থেকে যারা জন্মাবে তাদের মধ্যে বাঁচবে। অসার এই সংসারে কেবল সেই প্রবৃত্তিই সার, অনিত্য এই জগতে কেবল প্রবৃত্তিই নিত্য।"—এ-যুগের ঋষিরা যেন এই তত্ত্বই ঘোষণা করেছেন। Personal immortality-তে তাঁদের আস্থা নেই—race immortality-ই তাঁদের একমাত্র আশা। এবং race immortality-র কুঞ্চিকা হচ্ছে sex। যে বস্তু গত কয়েক শতাব্দীর বিশ্বব্যাপী বুর্জোয়া সাহিত্যে taboo হয়ে ছিল কিংবা বড়ো জোর রেস্টোরেশন যুগের ইংলণ্ডে বা ভারতচন্দ্রীয় যুগের বাংলাদেশে বৈঠকখানা-বিহারী বাবুদের মদের সঙ্গে চাটের স্থান নিয়েছিল, সেই বস্তুই আজকের সমস্যাসংকুল বিশ্বে নতুন নক্ষত্রের মতো উদয় হলো। একে যদি বিকারের লক্ষণ মনে করা হয় তবে ভুল করা হবে। আসলে এটা হচ্ছে প্রকৃতির পুনরাবিষ্কার। মানুষের গভীরতম প্রকৃতি বহু শত বছরের কৃত্রিমতার তলায় তলিয়ে গিয়েছিল। এতদিনে পুনরুদ্ধারের দিন এল। অনেকখানি আবর্জনা না সরালে পুনরুদ্ধার হয় না। অথচ আবর্জনা সরানোর কাজটা বড়ো অরুচিকর। Sex সম্বন্ধে ঘাঁটাঘাঁটি সেইজন্যে বড়ো বীভৎস বোধ হচ্ছে। কিছুকাল পরে এই বীভৎসতা—এই বিশ্রী কৌতূহল—এই আধেক ঢেকে আধেক দেখানো—এসব বাসি হয়ে যাবে। Sex-কে আমরা বিস্ময়সহকারে প্রণাম করব, আদিম মানব যেমন করে সূর্য-দেবতাকে প্রণাম করতো। এখনো আমরা sophistication কাটিয়ে উঠতে পারিনি বলে বাড়াবাড়ি করছি। কিন্তু এমন যুগ আসবেই যখন জন্মরহস্যকে আমরা অলৌকিক অহেতুক অতি বিস্ময়কর বলে নতুন ঋগ্বেদ রচনা করব, নতুন আবেস্তা, নতুন Genesis। ভগবানকে পুনরাবিষ্কার করা বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড়ো কাজ—সেই কাজেরই অঙ্গ সৃষ্টিতত্ত্ব পুনরাবিষ্কার।'[৭]

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, প্রকৃতি বা সৃষ্টিতত্ত্বের পুনরাবিষ্কার যৌন-বিজ্ঞানের দূরতম

লক্ষ্য হলেও বিশ্বসাহিত্যে যৌন-বিদ্রোহ সেই লক্ষ্যকে কতখানি নিকটবর্তী করে তুলতে পেরেছে ? কল্লোল-যুগের বাংলা সাহিত্য কা সেই লক্ষ্যের অভিমুখেই ধাবিত হয়েছিলো ? কল্লোলের রচনাসম্ভার তলিয়ে দেখলে মনে হয়, সেই বিরাট লক্ষ্যকে বুঝবার ও ধরবার মতো গভীরতর মনীষা ও সত্যদৃষ্টি অঙ্গীকার করে লেখকরা অগ্রসর হননি। তাঁদের সামনে ছিলো সামাজিক taboo-র দড়িদড়া এবং তাঁদের বিদ্রোহ সেই দড়িদড়ার গ্রন্থি মোচন করে দেওয়ার দিকেই নিয়োজিত ছিলো। সেজন্যে তাঁরা নর-নারীর বিশেষ করে নারীর অঙ্গ বা যৌনপীঠগুলি বর্ণনা, কামাতুরতার আলেখ্য-রচনা, সম্ভোগচিত্র নিরঙ্কুশভাবে উদ্ঘাটন এবং অবৈধ গর্ভসঞ্চারের কাহিনী বয়নের প্রতি মনোনিবেশ করেন। বিশেষ করে অন্ত্যজশ্রেণীর মধ্যে যৌন-স্বাধীনতার প্রশস্ততর ক্ষেত্র তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন। এছাড়া অবদমন বা অত্যাচারের ফলে সম্ভোগের অসুস্থতা ও বিকৃতি কতখানি দেখা দিতে পারে সেদিকেও তাঁদের লক্ষ্য ছিলো। প্রসঙ্গক্রমে দেহ-মনের দ্বন্দ্বের প্রশ্নটাও উত্থাপিত হয়েছে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, এর মধ্য দিয়েই জীবনে সত্যের সাক্ষাৎকার ঘটবে। অন্নদাশঙ্কর রায় কথিত প্রকৃতি পুনরাবিষ্কারের দুরূহতম উদ্দেশ্যে নয়, সমাজকাঠামোর মধ্যে যৌন-প্রবৃত্তির সহজ ও সুস্থ বিন্যাসের কামনায় তাঁরা উদ্বেলিত হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও এই বিশেষ ক্ষেত্রে কল্লোলগোষ্ঠীর সাহসিক পদক্ষেপ বাংলা সাহিত্যের মোড় ফেরার পালায় একটা বিপ্লবাত্মক ভূমিকা নিয়েছে।

কোনো কোনো কল্লোলীয়ের রচনায় শারীরিক তৃষ্ণার জয়জয়াকার। সেই তৃষ্ণার টানে কামাতুর শব্দের যেমন আয়োজন ঘটেছে তেমনি নারীর কামপীঠগুলির বর্ণনাও তীব্র-তপ্ত হয়ে উঠেছে। তাঁরা প্রেমকে আশরীর ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের একটি কবিতায় প্রেমের সেই শারীরিকতার সুস্পষ্ট ছবি আছে—

বিশ্বের অমৃত-রস যে আনন্দ করিয়া মন্থন,
লভিয়াছে নারী তার সুখোদ্বেল তপ্ত পূর্ণ স্তন ;
লাবণ্য-ললিত তনু যৌবন-পুষ্পিত পূত অঙ্গের মন্দিরে,
রচিয়াছে যে আনন্দ কামনার সমুদ্রের তীরে
সংসারশিয়রে ;—
যে আনন্দ আন্দোলিত সুগন্ধ নন্দিত স্নিগ্ধ চুম্বন-তৃষ্ণায়,
বঙ্কিম গ্রীবার ভঙ্গে, অপাঙ্গে, জঙ্ঘায়,
লীলায়িত কটিতটে ও কটু ভ্রূকুটিতে,
চম্পা-অঙ্গুলিতে ;—

পুরুষ-পীড়নতলে যে আনন্দে কম্প্র মূহ্যমান,
গাব সেই আনন্দের গান।
যে আনন্দে বক্ষে বাজে নব নব দেবতার পদনৃত্য ধ্বনি,
যে আনন্দে হয় সে জননী।
যে আনন্দে সতেজ প্রফুল্ল নর, দম্ভদৃপ্ত, নির্ভীক, বর্বর,
ব্যাকুল বাহুর বন্ধে কুন্দকান্তি সুন্দরীরে করিছে জর্জর,
শক্তির উৎসব নিত্য যে আনন্দে স্নায়ুতে শিরায়,
যে আনন্দ সম্ভোগ-স্পৃহায় ;
যে আনন্দে বিন্দু বিন্দু রক্তপাতে গড়িছে সন্তান,
গাব সেই আনন্দের গান।

—গাব আজ আনন্দের গান।

কল্লোলের নানা গল্পেও এই ধরনের বর্ণনার ছড়াছড়ি। নর-নারী যখনই পরস্পরের সংস্পর্শে এসেছে তখনই তরুণ লেখকরা দেহগত বর্ণনার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। দেখেশুনে মনে হয় তাঁদের চোখে নারীর দেহ যেন এক রহস্যপুরী এবং তার সমস্ত প্রকোষ্ঠগুলি খুঁজে বেড়ানোই তাঁদের লক্ষ্য। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

'কিন্তু অন্তরে অন্তরে যে রক্তমাংসের শরীরী প্রিয়াকে বাহুর বন্ধনে নিষ্পেষণ করতেই চাই, তৃষিত ওষ্ঠ দিয়ে প্রিয়ার হৃদয়ের সমস্ত সুধারস শোষণ করে নিতে চাই, তার পরম সুন্দর মুখখানি তুলে ধরে দুটি ব্যাকুল নয়নের দৃষ্টি দিয়ে তার নয়নের অতলে জীবনের চরম সার্থকতা অন্বেষণ করতে চাই—তাকে যে নিকটে চাই, নিকটতম করে চাই।'

—পঞ্চশর (চিত্রা), প্রেমেন্দ্র মিত্র।

'তারপর হঠাৎ আমার মুখের উপর কি কতগুলো খস্‌খসে জিনিষ এসে পড়্‌ল—তার গন্ধে আমার সর্বাঙ্গ ঝিম্‌ঝিম্ করে' উঠ্‌ল। প্রজাপতির ডানার মত কোমল দু'টি গাল, গোলাপের পাপ্‌ড়ির মত দু'টি ঠোঁট, চিবুকটি কি কমনীয় হ'য়ে নেমে এসেচে, চারুকণ্ঠটি কি মনোরম, অশোক গুচ্ছের মত নমনীয়, স্নিগ্ধ শীতল দু'টি বক্ষ—কি সে উত্তেজনা, কি সর্বনাশা সেই সুখ, তা তুমি বুঝ্‌বে না, নীলিমা।'

—রজনী হ'ল উতলা, বুদ্ধদেব বসু।

এইসব বর্ণনা গল্পে এসেছে কামাতুরতা ও সম্ভোগ উভয়প্রসঙ্গেই। বেশ কিছু গল্পে লেখকরা কামাতুরতার আবহাওয়া রচনার বিস্তৃত আয়োজন করে, ধীরে ধীরে মানুষের আদি-স্বভাবের দিকে পাঠকের মনকে টেনেছেন—তাতে কাহিনীর সুরটি বাঁধা হয়েছে শারীরিক জগতকে কেন্দ্র করে। সেই সব ক্ষেত্রে অনেকটা স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে দেহের বর্ণনা। যেখানে সম্ভোগের চিত্র আছে সেখানে লেখকরা ইঙ্গিতে কাজ সারতে চান নি, যেমন করেছেন শরৎচন্দ্র গৃহদাহে কিংবা রবীন্দ্রনাথ যোগাযোগে। তাঁরা বিষয়টিকে নিষিদ্ধ বলে মনে করেন নি বলে রেখে ঢেকে কথা বলার চেষ্টা করেন নি। অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে তো নয়ই, এমন কী উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যেও নয়। বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হ'ল উতলা', অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে', শৈলজানন্দের 'মা', যুবনাশ্বের 'ভুখা ভগবান' ইত্যাদি গল্পে সম্ভোগ-চিত্রের নানাবিধ আয়োজন আছে—কোথাও সংক্ষিপ্ত, কোথাও বা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। দৈহিক তৃষ্ণা অবদমনের ফলে চরিত্রের যে অসুস্থতা তার কিছু কিছু ছবিও কল্লোলে আছে। সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'কপালের লিখন' গল্পের দিদিমণি কুলীন পরিবারের অনূঢ়া বয়স্কা মেয়ে। সুতরাং তার দেহ-মনের অস্বাভাবিকতার কাহিনী রচিত হয়েছে গল্পটিতে। অচিন্ত্যকুমারের ('বেদে'-র) আহ্লাদি ও শৈলজানন্দের ('মা'-এর) পরীর কুমারী অবস্থায় জননী হওয়ার বিবরণ আমরা পাই, লেখকদ্বয় কোথাও তিরস্কারের মনোভাব প্রকাশ করেন নি, বরং সেই অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের প্রতিই তাঁদের সহানুভূতি। পরীর সন্তান-জন্মের বর্ণনায় শৈলজানন্দ বলেছেন, সদ্যোজাত অরুণালোক বিধৌত শিশু সন্তানের কচি মুখের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি নিমেষেই সমস্ত কথা ভুলে গেলো, বিদ্রোহিনী নারীর চক্ষে আজ জননীর শান্ত কোমল দৃষ্টি। জনক মাষ্টারের বিশেষ ব্যবস্থায় যখন আহ্লাদি মৃত সন্তান প্রসব করে নিজেও মরে গেলো তখন একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে লেখক যে কথা বলেছেন তা মর্মস্পর্শী—'আমার পুতুল মাষ্টার খড়মের চাপে চেপ্‌টে দিয়েছিল, নিজের পুতুল সে নিজেই ভাঙ্‌ল।'

কল্লোলের একদল লেখকের লেখায় এই যে রিরংসা-প্রবণতা ও যৌনবিদ্রোহের প্রকাশ তা সমকালের কোনো কোনো মহলে ধিকৃকৃত হয়েছিলো। তাঁরা মানসিক অস্বাস্থ্য ও অশ্লীলতার অভিযোগও এনেছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয়, গল্প বা কবিতার কোনো কোনো অংশ বিচ্ছিন্ন করে দেখলে অশ্লীল বলে মনে হলেও তা অনেক ক্ষেত্রেই রচনার সামগ্রিক সুর ও জীবন সম্পর্কে লেখকের মনোভঙ্গির সঙ্গে মানিয়ে গেছে। এবং সে ক্ষেত্রে তাদের অশ্লীল বলার কোনো হেতু নেই। যেখানে মানায় নি সেখানে অবশ্য বিষয় ও ভঙ্গি শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করে গেছে।

তবে সেক্‌স্ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি, অন্নদাশঙ্কর যথার্থই বলেছেন, অরুচিকর। কল্লোলের এতজন লেখক এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলেন যে পাঠকের মনে অরুচিকরতার প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত কল্লোলে যৌনতা নিয়ে বাড়াবাড়ি হওয়ায় এর বিষয়গত সহজ আকর্ষণীয়তা, জীবনকে দেখার অন্যান্য দৃষ্টিকোণগুলিকে প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো। সেজন্যেই এর আতিশয্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—যদিও তাঁদের শক্তি ও সাহসকে তিনি তারিফ না করে পারেন নি। তৃতীয়ত কল্লোলের অনেকেই ছিলেন লেখক হিসেবে সদ্যোজাত, চিন্তা ও কলমের কাজে অপরিপক্ক। ফলে যৌনতার মতো একটি দুঃসাহসিক বিষয়ে লিখতে হলে যে সংযত সংহত দৃষ্টি ও শিল্পনৈপুণ্য থাকার প্রয়োজন তা তাঁদের প্রায় কারোরই ছিলো না। তাঁদের যৌন-বিদ্রোহের কাহিনী ও কবিতাগুলিতে কাঁচা হাতের লক্ষণ আছে। নীলিমা বসুর দুঃসাহসের প্রশংসা করি, তিনি মহিলা মহলের সমকামিতা বা homosexuality-র গল্প 'ঝরা ফুল' লিখেছেন। কিন্তু সেই দুঃসাহস নৈপুণ্যের অভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, জীবনের সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অবশ্য পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে বলতে পারি যৌন-জীবনকে বাঙালী স্বীকৃতি দিলেও সমকামিতাকে বর্জন করেছে।

রবীন্দ্রনাথ 'বেদে'-র সমালোচনায় মিথুনাসক্তির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, সাহিত্যে মিথুনাসক্তিকে তিনি পরিত্যাজ্য বলে মনে করতেন। তিনি দেহ-মনের অবিচ্ছেদ্যতায় এবং দেহের ওপর মনের আধিপত্যে বিশ্বাস করতেন। তিনি বোধহয় অচিন্ত্যকুমারের গ্রন্থটিতে মনের লীলার কোনো পরিচয় পান নি। এ থেকে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। মিথুনাসক্তির গল্পে বা কবিতায় উর্ধ্বায়ন বা উত্তরণ (sublimation) দেখাবার কোনো চেষ্টা কী কল্লোলগোষ্ঠী করেছেন? বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হ'ল উতলা' গল্পে প্রতি রজনীর অন্ধকারে অজ্ঞাতনাম্নীর সঙ্গে সম্ভোগলীলার শেষে তার পরিচয় জানবার ভীষণ আগ্রহ হয়েছে নায়কের। কিন্তু নিজের শরীরটাকে উজাড় করে দিয়েও পরিচয়ের আলোকে নায়িকা ধরা দেয় নি। তার পরিণামে নায়িকার নাম-রূপকে অবলম্বন করে যে প্রেমের জাগরণ সম্ভব ছিলো তা হয় নি। রাত্রির কামকেলির ফল হলো নায়কের দৈহিক ও স্নায়বিক অসুস্থতা। মনে হয়, নায়ক দেহের বন্দীদশা থেকে খুঁজেছে মনের আকাশকে, অন্ধকার থেকে খুঁজেছে আলোকে, সম্ভোগ থেকে খুঁজেছে প্রেমকে। আর সেখানে ব্যর্থ হলেও নতুন নায়িকা নীলিমাকে সে অন্ধকারে রাখতে চায় নি—'আমি নীলিমার হাত ধরে সেই অন্ধকারের তলা থেকে সরিয়ে

নিয়ে এলাম।' এখানে উত্তরণের ইঙ্গিত কি নেই?

কল্লোলে দেহের ভোগতৃষ্ণাজাত শারীরিক বর্ণনা ও সম্ভোগচিত্র আছে, সন্দেহ নেই; তবু সেই দেহগত ভাবনা কারো কারো লেখায় দেহদর্শনেরও রূপ নিয়েছে। যেমন মোহিতলালের কবিতায়। তাঁর দেহবাদের কেন্দ্রবিন্দু কামের শক্তি। সেই শক্তিকে তিনি সৃষ্টির মূল সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন—'সৃষ্টিমূলে আছে কাম, সেই কাম দুর্জয় দুর্বার!' দেহকামকে বুদ্ধির জগতে একটা তত্ত্বগত রূপ দিতে গিয়ে তিনি তার আবিলতা ও কুশ্রীতার দিক বর্জন করতে পেরেছিলেন। কল্লোলে প্রকাশিত তাঁর 'পান্থ' কবিতায় মানুষের কামধূপবদ্ধতা বুদ্ধির বকযন্ত্রে পরিস্রুত হয়ে আপন চরমতায় আপনি অমৃতরূপে লাভ করেছে—

চিনি বটে যৌবনের পুরোহিত প্রেম-দেবতারে,—
নারীরূপা প্রকৃতিরে ভালোবেসে বক্ষে লই টানি',
অনন্ত রহস্যময়ী স্বপ্নসখী চির-অচেনারে
মনে হয় চিনি যেন,—এ বিশ্বের সেই ঠাকুরাণী!
নেত্র তার মৃত্যু-নীল!— অধরের হাসির বিথারে
বিস্মরণী রশ্মিরাগ! কটিতলে জন্ম-রাজধানী!
উরসের অগ্নিগিরি সৃষ্টির উত্তাপ-উৎস!—জানি তাহা জানি।

মোহিতলালের এই বলিষ্ঠ দেহবাদের রিয়ালিজম্ কল্লোলীয় সাধনার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

বিদ্রোহ কল্লোল পত্রিকা ও কল্লোলগোষ্ঠীর প্রজাতিক লক্ষণ। সে বিদ্রোহ বিচিত্র বিষয়ে, বিচিত্র ভঙ্গিমায়। সমাজের কুসংস্কার, অন্ধতা, নিষ্পেষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অনেক কাল থেকেই বাংলা সাহিত্যে জমে আসছিলো—রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে তা তীব্র রূপ নিয়েছিলো—কল্লোলে তা-ই বিদ্রোহে মুখর হয়ে ওঠে। পূর্বসূরীরা অনেক সময় অন্ধসংস্কারের নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের চিত্র এঁকেছেন, তার উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং অত্যাচারিতের সপক্ষে সহানুভূতি দেখিয়েছেন, কিন্তু সমাজকে অস্বীকার বা উল্লঙ্ঘন করেন নি। কারণ সমাজ-সত্তার সংশোধনে তাঁরা বিশ্বাসী হলেও তার বিপর্যয়ে উৎসাহী ছিলেন না। জীবনের ওপর সমাজের দখল তখন একেবারে শিথিলও হয় নি। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে রাজনৈতিক তৎপরতাবৃদ্ধি এবং সামাজিক ও অর্থনীতিক অবক্ষয়ের ফলে সামাজিক বন্ধন যেমন কতকটা আলগা হয়ে পড়ে তেমনি একদল ক্রুদ্ধ ও হতাশাগ্রস্ত তরুণের আবির্ভাব ঘটে। নানা কারণে তাদের তেজ, সাহস ও অবিনয় ছিলো একটু বেশী। তাই সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রশ্ন

তুলেই তারা ক্ষান্ত হয় নি, তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতেও এগিয়ে গেছে। এই তরুণ-সমাজেরই অন্তর্গত কল্লোলের নবীন লেখকগোষ্ঠী সে-জেহাদ ঘোষণা করলেন সাহিত্যের ক্ষেত্রে। তাঁদের বিদ্রোহ জীবনে ও সাহিত্যে দুই ক্ষেত্রেই সত্য।

কল্লোলের গল্পে দেখতে পাই কত রকমের অত্যাচার ও বিদ্রোহ। জমিদারী যুগের জোর-জবরদস্তি ও নিষ্পেষণ (চোর/দীনেশচন্দ্র লোধ), শিল্পাঞ্চলে ডাক্তারের ষড়যন্ত্র (জংলা/সুধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ). চাষী-বউয়ের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন (নীচের সমাজ/পঞ্চানন ঘোষাল), বড়োলোকের ভিখারীদের সাহায্যে রোজগারের মর্মান্তিকতা (পাঁকের পোকা/সুকুমার ভাদুড়ী), অধঃপতিতা জীবনের দুঃসহতা (মোট বারো/প্রেমেন্দ্র মিত্র), অপরাধী চরিত্রের সন্দেহের জ্বালায় স্ত্রীর ওপর নির্যাতন (হিসাবের বাহিরে/ভূপতি চৌধুরী), তৃতীয় পক্ষের মদ্যপ স্বামীর অত্যাচার এবং তা থেকে মুক্তি ও পুনর্বার বিবাহ (আর একটা পথ/নরেন্দ্র দেব), মুসলমান কতৃক হিন্দু বিধবা হরণ (ব্যতিক্রম/শৈলজানন্দ), পরস্ত্রীর প্রতি প্রেম (পরস্ত্রী/রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), পল্লী-সমাজের অত্যাচারে ঘর ভাঙা-গড়ার পালা (আশ্রয়/প্রভাবতী দেবী সরস্বতী), দারিদ্র-পিষ্ট বেশ্যাজীবনের কারুণ্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা (এক টুকরো/সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়) পুরুষের লোভ ও নারীর অত্যাচার (একটা ফিরিস্তি/ভূপতি চৌধুরী), সামাজিক প্রথার অন্যায় ও অবিচার (ঘাস-ফুল/রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়) মদ্যপ পুরুষের অত্যাচারে তার একাধিক স্ত্রীর মৃত্যু ও একজন স্ত্রীর পতিতাতে পরিণত হওয়া (পারুল/ভবানী মুখোপাধ্যায়), সমাজে লম্পট পুরুষের কীর্তিকলাপ (শুভ-বিবাহ/সুবোধ দাশগুপ্ত) নিষ্পিষ্ট বেশ্যা-জীবনের বেদনা (চড়কডাঙ্গার মোড়/চারুচন্দ্র ঘোষ) ইত্যাদি বহু-বিচিত্র সমাজ কথা নবীন-প্রবীণের লেখায় ব্যক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে কোথাও কান্না, কোথাও দীর্ঘশ্বাস, কোথাও ক্ষোভ ও জ্বালা, আবার কোথাও বিদ্রোহের সুর শুনতে পাওয়া যায়। যে যে গল্পে ক্ষোভ ও বিদ্রোহ স্ফূর্তি লাভ করেছে, সেখানে কল্লোলের চারিত্র স্ফুটতর হয়েছে। লক্ষণীয় এই যে, কল্লোলের কাল স্বাধীনতা-সংগ্রাম-মুখর হলেও কল্লোলের গল্পে (এবং কবিতায়) সেই রাজনৈতিক বিদ্রোহের তেমন কোন ছাপ পড়ে নি—পাচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'ছায়া-ছবি', গোকুলচন্দ্র নাগের 'পথিক', রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'ঘাস-ফুল' ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মিছিল' ইত্যাদি কয়েকটি লেখা তার ব্যতিক্রম। 'সমাচার' শীর্ষক ফিচারে রাজনৈতিক আন্দোলনের সংবাদ, দেশবন্ধুর মৃত্যুতে প্রকাশিত একটি বিশেষ সংখ্যার রচনাবলীতে কাল্লোলগোষ্ঠীর কিছু রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় আছে। এ থেকে মনে হয়, কল্লোলগোষ্ঠীর বিদ্রোহ যতটা ছিলো জীবনবাদগত ও সাহিত্যঘটিত ততটা রাজনৈতিক ছিলো না।

এ বিষয়ে তাঁরা যেন অনেকটা নিস্পৃহ ছিলেন।

কল্লোলের গল্প ও প্রবন্ধের চেয়ে কবিতায় বিদ্রোহের কথা বেশি পাই। এবং সে-ক্ষেত্রে নজরুলই অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। সত্য বটে 'বিদ্রোহী'র মতো কবিতায় হাবিলদার কবির চড়া গলায় যে সোচ্চার ধ্বনি শোনা গিয়েছিলা, কল্লোলের কবিতাগুলির মধ্যে সে ধ্বনি অনেকটা খাদে নেমে এসেছে। তবু তাঁর বীর্যকণ্ঠ কল্লোলে অন্তত প্রথম দিকে মাঝে মাঝে অল্প বিস্তর শোনা গিয়েছে—

ঝড় কোথা ? কই ?—
বিপ্লবের লাল ঘোড়া ঐ ডাকে ঐ—
ঐ শোনো শোনো তার হ্রেষার চিকুর,
ঐ তার ক্ষুর-হানা মেঘে !—
না, না, আজ যাই আমি, আবার আসিব ফিরে
হে বিদ্রোহী বন্ধু মোর ! তুমি থেকো জেগে।
তুমি রক্ষী এ রক্ত অশ্বের,
হে বিদ্রোহী অশ্বদেবতা !—শুন শুন মায়াবিনী ঐ ডাকে ফের
পূবের হাওয়ায়—!
যায়—যায়—সব ভেসে যায়—
পূবের হাওয়ায়—
হায় !— —ঝড়।

নজরুলের এই জাতীয় বিপ্লবাত্মক আইডিয়া কোনো কোনো নবীন-প্রবীণ লেখককেও উজ্জীবিত করেছিলো। তাই তাঁরা মাঝে মাঝে বিদ্রোহের সুর তুলেছেন কল্লোলের পৃষ্ঠায়। বিদ্রোহী কবির বলদর্পী মনোভাব ও দৃপ্ত অন্তঃশক্তি হয়তো তাঁরা পুরোপুরি আত্মসাৎ করতে পারেন নি, তবু তাঁদের কম্বুকণ্ঠ আমাদের উচ্চকিত করে তোলে—

ওঠ বীর, মুছে ফেল নিয়তির লিখা
আপন ললাট হ'তে ;
যারা আসে ধেয়ে
পীড়নের আঘাত সহিয়া,
তাহাদের ক্ষতমুখ বাহি
যে শোণিত ঝরে অনিবার,
তব তপ্ত ভালে
সেই রক্ত-চিহ্ন আঁকি লহ। —ওঠ বীর, দীনেশরঞ্জন দাশ।

নূতন ভাঙনে সনাতন পথ গেছে বা কোথাও কাটি ;
মাঝে মাঝে 'লিক্' এমন গভীর, বুকে ঠেকে যাবে মাটি।
তথাপি বন্ধু, হতাশ হয়ো না,—গরুর গাড়ীর গরু,
আওর কাটিয়া পার হতে পারে মরীচিকাহীন মরু।

—কাণ্ডারী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

কে তুমি বিদ্রোহী মোর বক্ষমাঝে থেকে থেকে
করিছ গর্জন,—
যেথা ক্ষুদ্র জীবনের বিচিত্র তরঙ্গগুলি
করিছে নর্তন !
ভৈরব হুঙ্কারে হাঁকি কাঁপায়ে তুলিছ সারা
বুকের পঞ্জর ;
বাসনার অঙ্ক পরি প্রমত্ত তাণ্ডবে রত
হে প্রলয়ঙ্কর,—। —বিদ্রোহী, বিভাবতী দেবী।

বাংলা সাহিত্যে ('বিদ্রোহী' কবিতায়) বিদ্রোহের একটা বিশেষ রূপ রেখেছিলেন নজরুল ইসলাম। সে-বিদ্রোহ উদ্ধত, অবিনীত ও অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু কল্লোলের আর এক কবি সুধীরকুমার চৌধুরী বিদ্রোহের অর্থকে গ্রহণ করলেন ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাঁর চোখে বিদ্রোহ অপ্রতিরোধ্য বটে, কিন্তু বিনয়নম্র ও প্রশান্ত। তিনি বিশ্বাস করেছেন, দ্বিতীয় পর্যায়ের বিদ্রোহ প্রথম পর্যায়ের বিদ্রোহের চেয়ে কম শক্তিমান্ নয়—

আমার বিদ্রোহ সে যে ললাটের পটে আঁকা মম
চির স্থির প্রশান্তির সম,
স্নিগ্ধ শ্বেত চন্দনের রসে।
বিশ্ব-চিত্ত-সরোবরে, কল্যাণের শতদল কোষে
আপনি সে করে বাস,
তাহার সুবাস
দিকে দিকে ধায় মৌনবেগে
অশুভ অশুচি যত শুভ শুচি হ'য়ে ফোটে তার স্পর্শ লেগে।

—বিদ্রোহ।

কল্লোলে বিদ্রোহের সুর ছিলোই যে বিষয়ে যে ভঙ্গিতেই হোক না কেন। সেইজন্যেই 'বিদ্রোহীর ডায়েরী'তে ভূপতি চৌধুরীর বলিষ্ঠ আশাবাদ অপ্রাসঙ্গিক বলে আমাদের মনে হয় না—'কবে, সে দিন কবে হবে, যেদিন আমার এই সব

বন্ধুরা, এই ভণ্ড প্রতারক ছদ্মবেশী অমানুষ ধনী-সমাজের সকল গর্ব, তাদের বিদ্রোহ রথের চাকার তলে ধূলিসাৎ ক'রে দেবে ?'

বঙ্কিমের উপন্যাসে, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যে-সমস্ত রাজারাজড়ার কাহিনী দেখতে পাই তারা বাঙালীর বাস্তবজীবনে দূরে থাক কল্পনার মধ্যেও ছিলো না। যেখানে তিনি বাস্তব মানুষের কথা বলেছেন সেখানেও গোবিন্দলাল ও নগেন্দ্র-নাথের মতো জমিদার-নন্দনদেরই প্রাধান্য—সাধারণ মানুষরা আছে শুধু তাদেরই জীবনের প্রয়োজনে। রবীন্দ্রনাথ সেই উচ্চজীবন-সমাকীর্ণ বাংলা কথা-সাহিত্যকে টেনে আনলেন অধিকতর বাস্তব পটভূমিতে—উচ্চ-মধ্যবিত্ত কিংবা পল্লীবাংলার মাটির মায়ের সন্তানেরা কম-বেশি অগ্রগণ্য ভূমিকা পেলো। শরৎচন্দ্র এসে দাঁড়ালেন একেবারে সাধারণ মানুষের ভেতরের অঙ্গনে—যেখানে বড়ো মানুষ এলো সেখানেও জনসাধারণের সঙ্গে তাদের যোগ দাঁড়ালো অধিকতর অব্যবহিত। অন্যান্য লেখকরাও বাংলা উপন্যাসের পাদপীঠকে বাস্তবান্বিত করার এই ক্রমান্বিত প্রয়াসকে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে গেলেন—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ঔপন্যাসিকেরা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হলেন। এই পটভূমিকায় আবির্ভূত হয়ে কল্লোলগোষ্ঠী শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন না—তাঁরা দাঁড়ালেন জনগণের সপক্ষে, তাদের জীবনের শরিক হয়ে। তাঁদের এই জনাবতরণ কোনো কোনো মহলে বস্তিবিলাস বা শ্রমিকবিলাস বলে নিন্দিত হলেও ইতিহাসের কাছে জনচেতনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের জনসাংকর্যের মুখ্য ভাগ হচ্ছে দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের দল। তারা বর্ণগত ও অর্থগত দুই মানদণ্ডেই অন্ত্যজ শ্রেণী বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু আমাদের সাহিত্যিকদের হাতে এই অন্ত্যজ মানুষেরা এতকাল সুবিচার পায়নি। তাদের সম্পর্কে লেখকদের বিমুখতা না থাক, অপরিচয়ের অজ্ঞতা ছিলোই। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র মনুষ্যত্বের অবমাননা যেখানে দেখেছেন সেখানেই বন্ধনের পীড়ন অনুভব করে সহানুভূতি দেখিয়েছেন, তবু তাঁদের দৃষ্টি মুখ্যত নিবদ্ধ ছিলো সামাজিক কুসংস্কার-পীড়িত জনবিন্যাসের দিকে। তাঁরা সমাজের অন্তেবাসীদের বহুবিচিত্র জীবন-যন্ত্রণার বেদগান রচনা করেননি। কল্লোলীয়রা এই উপেক্ষিত দিগন্তের দিকে চোখ মেলে দাঁড়ালেন, কুলি-মুটে-মজুরের অস্তিত্বের নানা সংকট কাহিনীর বয়নে ব্যক্ত করতে চাইলেন। সুতরাং কল্লোল-গোষ্ঠীর রচনায় জনজীবন যে নতুন তাৎপর্যে অভ্যর্পিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কল্লোলের পৃষ্ঠায় নানা জাতীয় মানুষের ভিড়—ধনী-নির্ধন-মধ্যবিত্ত, জমিদার-

ব্যবসায়ী, কুলি-মজুর-চাষী, হিন্দু-মুসলমান-খৃশ্চান, ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-শূদ্র। এরা সকলেই লেখকদের দৃষ্টি অনুযায়ী স্থান পেয়েছে, তবু সব মিলিয়ে দেখলে মনে হয় ধর্ম-বর্ণ-অর্থগত অন্ত্যজেরাই যেন নতুন অর্থ বহন করে সাহিত্যের অঙ্গনে এসে দাঁড়িয়েছে, নবীন লেখকেরা যেন এই প্রথম শোভাযাত্রা করে জনজীবনের বেনামী বন্দরের দিকে চলেছেন। সেদিক থেকে কল্লোলগোষ্ঠীর জনচেতনার ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক তাৎপর্য আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে। কল্লোলগোষ্ঠীর জনচেতনা দীক্ষিত সমাজ-চৈতন্যের নামান্তর ছিলো না। তাঁরা এ-যুগের সবচেয়ে বৈপ্লবিক সমাজদর্শন মার্কসবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জনজীবনবাদের অবতারণা করেন নি এবং তা করার মতো গভীরতর সমাজবোধ তাঁদের ছিলো না। স্বকালের অবস্থাগত পরিপ্রেক্ষিতে, প্রাক্-বিপ্লব যুগের রুশ সাহিত্য, তারুণ্যের জেদ ইত্যাদির প্রভাবে পড়ে তাঁরা অন্তেবাসীদের দিকে ঝুঁকেছিলেন, ব্যক্তিগত জীবনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বা কোনো রাজনৈতিক শিক্ষার ফলে জনজীবনের শরিক হন নি। তাঁদের জনজীবনবাদ অন্যদিক থেকে যত অর্থবহই হোক না কেন কতকটা সাহিত্যিক 'বিলাস' হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তা অবশ্য পরবর্তীকালে জীবন সত্যে পরিণত হয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস প্রভৃতির লেখায়।

সে যাই হোক, কল্লোলগোষ্ঠীর জনমুখী দৃষ্টি সে-কালে প্রচুর আলোড়ন তুলেছিলো। তার কারণ তাঁদের গল্প উপন্যাস কবিতায় অন্তেবাসীদের যে রূপ ফুটে উঠছিলো তা এ যাবৎ বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় নি। যুবনাশ্বের 'পটলডাঙার পাঁচালী' নামক নাটিকায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে। সে-কাহিনীর চরিত্র হচ্ছে কুঠে বুড়ী, নফর, ফক্‌রে, সদি, গুব্‌রে, হুলো, খেঁদী পিসী। স্থানগত পটভূমিও চরিত্রোপযোগী—পটলডাঙার ভিখিরী পাড়া, প্যাচ্‌পেচে পাঁকের ভেতর ছোটো ছোটো ভাঙা কুঁড়ে, সার সার গায়ে গায়ে লাগানো। দেয়ালে এখানে সেখানে দড়ি টাঙানো, তাতে ছেঁড়া কাঁথা, নোংরা ঝুলি এই সব। জানালা একটিও নেই, দোরে ঝাঁপ-টানা। দোর-গোড়ায় একটা কেরাসিনের ডিবে থেকে মিট্‌মিটে আলোর অনর্গল ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ধোঁয়ার গন্ধ, বাইরের পচা কাদা ও আস্তা-কুঁড়ের গন্ধ;—ঘরের পেছনে দিন দুই হলো একটা কুকুর মরে পচে আছে, তারই গন্ধ, আর কুঠে বুড়ির গলিত ঘায়ের গন্ধ একসাথে ঘরটাকে ভরে রেখেছে। স্যাঁৎসেতে মাটির মেজের ওপর, ছেঁড়া মাদুর, খবরের কাগজ, তালি দেওয়া কাঁথা,—যার যেমন জুটেছে, পেতে, ফক্‌রে ও সদি ছাড়া ঘরের আর বাসিন্দা কটি সার সার পড়ে আছে। বস্তিবাসী দারিদ্র্যপীড়িত নীচুতলার মানুষের এমন মর্মন্তুদ ছবি

যুবনাশ্বের আগে বাংলা সাহিত্যে কেউ লেখেননি।

অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে' উপন্যাসেও আছে 'জীবনের কুৎসিত, বীভৎস, দারিদ্র্য-পিষ্ট, বিদ্রোহক্ষুব্ধ, পাপ-পিচ্ছিল' দিকে লেখকের সোৎসাহ প্রবণতা। অনেকগুলো ছন্নছাড়া মানুষ ও তাদের চালচুলোহীন বিশৃঙ্খল জীবন এই উপন্যাসের বিষয়। চুরি-জোচ্চুরি বদমায়েসি ব্যভিচার ইত্যাদি বেদের জগতের নিত্যকার ঘটনা। সমস্ত চিত্রের মধ্যে দারিদ্র্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে একটা তিক্ত ক্ষুব্ধ ও দ্রোহাত্মক মনোভঙ্গি বিদ্যমান; আহ্লাদি উপাখ্যানে অনাথ আশ্রমে ছোটোখাটো ছেলেদের নিদারুণ কষ্টের জীবন আমাদের তড়িৎস্পৃষ্ট করে তোলে—হয়তো তাতে অতিরঞ্জন আছে, তবু তা সমাজের নীচু মহলের এক মর্মান্তিক ছবি। কোথাও বা কুৎসিত ও অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে একটু সহজ বাতাস ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা আছে। বাতাসীর আখ্যানে বিকলাঙ্গ মুলোর ক্ষণিক মনোভাবে তার পরিচয় পাই—'মুলোর চোখে ঘোর লেগেছে: ছোট্ট ডালিমগাছটার ডগায় একটা ছোট্ট ফুল ফুটেছে—তার দিকেই চেয়ে আছে। গাছটা ওর নিজের হাতে পোঁতা। দু'দিন পর পরই সন্ধ্যেবেলা একটা বাঁশের কাঠি দিয়ে মাপে—এ দুদিনে কতটুকুন্ বড় হল। গাছটা প্রথম যেদিন সরু কাঙাল দুটি ডাল আকাশের দিকে মেলে ধর্‌ল, মুলো আনন্দে গাছটার চার পাশে খোঁড়া পা-টা নিয়ে খুব নেচেছে। দুটি আঙুলে অতি আল্‌গোছে, যেন অতি কষ্টে, সবে-গজানো কচি পাতাগুলি ছুঁয়ে বেড়িয়েছে,—যেন ওদের চোখে ব্যথা লেগে যাবে, এই ভয়। কত ডাগরটি তারপর হ'ল, কত পাতার ঘোমটা টেনে দিল,—আজ বুঝি অরুণিমার আশীর্বাদ লেগে এত দিনে ফুল ফুটেছে। বহু দিনের আলাপী বন্ধুর মতো গাছটা মুলোর দিকে চেয়ে আছে যেন।'

কুলির জীবন নিয়ে অনেক গল্প আছে কল্লোলে। শৈলজানন্দের 'মা'-এ সাঁওতাল ছেলের কয়লাখাদের কুলি হওয়ার এবং কুলি-ধাওড়ার ব্যভিচারী জীবন-যাপনের ছবি পাই। সরলকুমার অধিকারীর 'চৈতী হাওয়া'য় আছে বিলাসপুরের জঙ্গল অঞ্চলের কয়লাখনিতে কুলি-জীবনের অসুস্থ পরিবেশ। রানী সুরুচিবালা চৌধুরাণীর 'কুলির প্রাণ' গল্পে কুলি যুবতীর ব্যভিচারী জীবনের ছবি মেলে। সুধীরেন্দ্রনাথ ঘোষের 'জংলা'-তে রয়েছে আসামের মোতিহারী চা-বাগানের কুলি-জীবনের ছবি। উচ্ছৃঙ্খল শ্রমিক জীবনের কাহিনী পাওয়া যায় তারানাথ রায়ের 'মেশিনের পাশে'-তে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মোট বারো' গল্পে কচুয়ানের পশুসত্তার আলেখ্য রয়েছে। আসল কথা, কল্লোল শ্রমিক-জীবনকে নানা দিক থেকে দেখবার চেষ্টা করেছে।

অন্ত্যজ শ্রেণীর ব্যভিচারের বহু বিচিত্র কাহিনী কল্লোলে স্থান পেয়েছে। বিশেষ

করে পতিতার জীবন অনেক গল্পের উপজীব্য। নারীর পদস্খলনের পেছনে তাঁরা মুখ্যত দেখেছেন সম্ভোগের তাগিদ, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ এবং সামাজিক অত্যাচার ও নিরাশ্রয়তা। ভবানী মুখোপাধ্যায়ের 'পারুল', যুবনাশ্বের 'মন্থ-শেষ', সৌরীন্দ্র-মোহন মুখোপাধ্যায়ের 'এক টুকরো', চারুচন্দ্র ঘোষের 'চড়কডাঙার মোড়', হরিপদ গুহের 'চিঠি', সুনীলকুমার ধরের 'সংস্কার', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে' ইত্যাদি তার উদ্ধারযোগ্য উদাহরণ।

সমাজের নীচুমহলের আনাগোনা কল্লোলের গল্প-উপন্যাসে যতটা, কবিতার ততটা নয়। কারণ কবিতার রাজ্যে প্রেম ও নারীর ভিড়ে সমাজ ও জীবনের অন্যান্য সত্য তেমন জায়গা পায় নি। তবু কিছু কবিতায় কবিদের জনচেতনার স্বাক্ষর আছে। এ দিক থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বেনামী বন্দর' সবচেয়ে উল্লেখ্য কবিতা। কিছু উদাহরণ দিচ্ছি—

সে যে ধরার লক্ষ্মীছাড়া কোন যুগের এ কপাল পোড়া ;
হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে,
ভাগ্য-লেখা মুছে ফেলে,
সব হারাবার জয়টীকা পোরেছে সে কপাল-জোড়া।

—লক্ষ্মীছাড়া, দীনেশরঞ্জন দাশ।

ধুলিরুক্ষ রাজপথে নিরাশ্রয় যারা পরিশ্রমী,
যুগ্মকরে তাহাদেরে নমি :
মরণের স্নেহ যেন,—সর্ব অঙ্গে ঝরিতেছে স্বেদ,
জীবনে ঘুচালো যারা মৃত্যু আর মৃত্তিকার ভেদ,
শির পাতি' লয় যারা একচক্ষু বিধাতার অমোঘ কুঠার,
তাদের জানাই নমস্কার ॥

—সার্বজনীন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই
জগতের যত হতভাগাদের ভীড় ;
মাল ব'য়ে ব'য়ে ঘাল্ হ'ল যারা
আর যাহাদের মাস্তুল চৌচির,
আর যাহাদের পাল পুড়ে গেল

বুকের আগুনে ভাই,
সব জাহাজের সেই আশ্রয় নীড়।

—বেনামী বন্দর, প্রেমেন্দ্র মিত্র।

কিন্তু কল্লোলের এই অন্ত্যজ-প্রীতি ও দারিদ্র্য সম্বন্ধে কল্লোলেই একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি 'বর্তমান গদ্যসাহিত্যে তিনখানি ভাল বই' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, সাহিত্যের উদ্দেশ্য যদি একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তির আভাস দেওয়া হয়, তাহলে দুঃখ-দারিদ্র্যরূপ যে কোনো অবস্থার বর্ণনাতেই সাহিত্যসৃষ্টি হবে না। তবে যদি দারিদ্র্য কিংবা অন্য কোনো রিপুর তাড়নায় মানুষ কী রকম ব্যবহার করে দেখানোই সাহিত্যের উদ্দেশ্য হয় তাহলে ব্যক্তির কোনো ধার না রাখলেও চলে।' তাঁর এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য। কল্লোল দারিদ্র্য এবং মানুষের দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনাংশের ছবি আঁকার দিকেই বেশি দৃষ্টি দিয়েছিলো, দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিরূপ পরিস্ফুটনের দিকে তেমন দৃষ্টি দেয়নি।

কল্লোলের লেখকরা উনিশ-শতকী জীবন-ভাবনা-চক্রে আবর্তিত হতে চান নি—আনন্দসন্ধানী বিশ্বাস ও জীবন্মুক্তিবাদের পোষ্টা ছিলেন না। তাঁরা কতকটা বয়সোচিত কৌতূহল নিয়ে, কতকটা তৎকালবিস্তৃত অভিজ্ঞতার উপকরণের দ্বারা তাড়িত হয়ে জীবনের 'অপর পৃষ্ঠা' দেখতে চেয়েছিলেন। সমাজের যে স্তর থেকে তাঁরা এসেছিলেন তা এ-যাবৎ অল্প-দেখা সেই অপর পৃষ্ঠাকে দেখার বাস্তব দৃষ্টিও জুগিয়েছিলো। ফলে কল্লোলের গল্প-উপন্যাসে দেখি বর্ণগত ও অর্থগত অন্ত্যজ মানুষের আনাগোনা—তাদের দুঃখ দারিদ্র্য, বিকৃতি ব্যভিচার, জরত্ব ও কুসংস্কার এবং বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার মর্মান্তিক ইতিহাস তাতে রচিত হয়েছে। এই ধরনের বিষয় নিয়ে গল্প লেখা কল্লোলীয়দের এমন এক সংক্রামক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছিলো যে, একটা মর্বিডিটির সুর পত্রিকাটির পৃষ্ঠায় 'রুদ্ধশ্বাস আবহাওয়া' জমিয়ে রেখেছে! তরুণ লেখকরা সমাজের নানা মহলের, বিশেষ করে নীচু মহলের ছবি আঁকতে গিয়ে জীবনের কারুণিক প্যাটার্নের দিকে বেশী দৃষ্টি দিয়েছেন। তাঁদের লেখায় আশা ও সুখের কথা ততটা পাই না যতটা পাই হতাশা ও ব্যর্থতার কথা। তাঁদের কাহিনী-লোকের মানুষগুলি সংগ্রাম করে চলেছে—সমাজ, পরিবেশ, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে তারা হেরেছে কিংবা মৃত্যু বরণ করেছে, তাদের জয়ী হতে আমরা প্রায় দেখি না। সমাজের দুর্বলতর অংশ হচ্ছে নারী, তাই তাদের পরাজয় ও গ্লানির ইতিহাসও অধিকতর। চোর (দীনেশচন্দ্র লোধ), জংলা (সুধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ), দা' গোঁসাই (সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়), দেউড়ীর দারোয়ান (নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), ভূখা-ভগবান

(যুবনাশ্ব) ইত্যাদি গল্পে তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তাই কল্লোল সম্পাদক 'ডাকঘরে' এক সময় লিখেছিলেন, যে সমস্ত গল্প প্রকাশের জন্য আসে সে সবই এক ধরনের—জীবন ও প্রেমের হা-হুতাশাই তাদের একমাত্র সুর। বস্তুত সেকালের পাঠকরাও কল্লোলের গল্প বলতে এই ধরনের গল্পকেই বুঝতেন।

জীবনের কারুণ্যকে দেখার এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি কতকটা কালগত অবস্থার ফল। তবে লেখকদের ব্যক্তিগত জীবনের প্যাটার্নও এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে। তাদের অনেকে ছিলেন চালচুলোহীন, দিনান্তে পেট ভরে খাবার সংস্থান সকলের ছিলো না। বেঁচে থাকার তৃষ্ণা অপরিসীম, অথচ সংসার জগদ্দল পাথরের মতো জীবনের ওপর চেপে বসে আছে। শরীর অসুস্থ, অপুষ্টিজনিত যক্ষ্মা ও অন্যান্য রোগে কেউ কেউ আক্রান্ত। সব কিছু মিলিয়ে দেহে ও মনে সরস স্বাস্থ্যের অভাব। এর অনিবার্য পরিণামে লেখকদের যে মেলাংকলিয়া, তার শিকার হয়েছিলো কল্লোলের সাহিত্য।

সুতরাং একথা স্বীকার করতে হবে, কল্লোলে যে নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার সুর আমরা শুনতে পাই তার পেছনে সামাজিক ও জৈবনিক প্যাটার্নের নানা সূত্র কাজ করেছিলো। অবশ্য তরুণ লেখকদের কল্পনাপ্রবণ চিত্তবৃত্তির কাছে সাহিত্যিক নিহিতার্থ হিসেবে রোমান্টিক মেলাংকলির আকর্ষণ ছিলো প্রচুর। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে তার অনেক দৃষ্টান্ত তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁরা মনে করতেন, বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে এই ভাববীজটির নতুন ফসল ফলিয়ে তোলার অনেক সম্ভাবনা আছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবৃত্তে দুঃখের বিচিত্র ঢেউ উঠেছে বটে, কিন্তু পরিণামে দেখা গেছে তিনি পৌঁছে গেছেন সেই সমে যেখানে এসে বলতে পারা যায় 'তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের বন্ধনে।' কিন্তু কল্লোলীয়রা বয়সোচিত জীবনতৃষ্ণা নিয়েও জলের মতো ঘুরে ঘুরে দুঃখের কথাই কইলেন, কারণ তার মধ্যে তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রেতর সুর—নতুন প্রাণের বাণী-সঙ্গীত।

পূর্বে বলেছি, এই নৈরাশ্য ও দুঃখানুভূতি যেমন বাস্তব জীবনবোধ তেমনি রোমান্টিক মনের ভাবুকতা থেকে উৎপন্ন। কল্লোলে বরাবরই অতি বাস্তবতার পাশাপাশি অবাস্তবতার একটা সুর ছিলো; গোকুল নাগের সঙ্গে ছিলেন যুবনাশ্ব। এরই জন্য রিয়ালিজম ও রোমান্টিসিজম দুইয়ের স্রোত কল্লোলে দেখতে পাওয়া যায়। আর রোমান্টিক মনের অন্যতম প্রবণতা যে দুঃখবিলাস বা বিষাদাত্মকতা তা থেকে জন্ম নেয় এক প্রকারের 'অসন্তোষ গান'। কল্লোলের কোনো কোনো কবিতা অসন্তোষ-গান হয়ে উঠেছে—

স্বপনের জাগরণ সমীরণ বহে,—

মনে হয় যেন কার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস !
ডাকে পিক, যেন কার বেদনা উচ্ছ্বাস
স্বর উঠে বাজি আচম্বিতে !

—বসন্ত বিলাপ, দীপঙ্কর ।

আয় তবে আয়,
তামস-গভীর রাত্রি, অজানা দিগদেশ যাত্রী ঝড়,
আমার বক্ষের 'পরে ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ রোষ ভেঙে পড়,
আহত শত্রুর মত ।

—অম্লান পুষ্প, সুধীরকুমার চৌধুরী ।

আমাদেরে যদি কভু পড়ে মনে,
একবিন্দু অশ্রু শুধু এনো ডাকি'
থাকি' থাকি'
নয়নের কোণে ;—
এই শুধু সাধ,
হে সন্তান, তব তরে এই আশীর্বাদ ।

—অনাগত কবি, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ।

বারবার ধুতুরার তিক্ত
নিঃস্ব নীল ওষ্ঠ তুলি নিতেছি চুমিয়া
মোর বক্ষকপোতের কপোতিনী প্রিয়া
কোথা কবে উড়ে গেছে, পড়ে আছে আহা
নষ্ট নীড়,—ঝরা পাতা,—পূবালির হাহা !

—সিন্ধু, জীবনানন্দ দাশ ।

'কাল সে না আসে যদি !' 'যদি আসে, ভালো নাহি বাসে !'
'তেমন না হয় যদি তা'র প্রেম, তোমার যেমন !'
'যদি সে বাসেও তোমা, যত ভালো বাসিতে সে পারে,
তবু তব ভালো নাহি লাগে ।'

—কাল, বুদ্ধদেব বসু ।

বাসুকীর ফণাশীর্ষে ধরণী সে বিষ-দীপ্ত নীলা,
মুগ্ধ করে সত্য, তবু দগ্ধ করা সেই তা'র লীলা ।

কালকূট বহ্নি-তেজে মহাকাশ দগ্ধ হ'য়ে যায়,
মুক্তির মরীচি-তীর্থ বালুতপ্ত মরুভূমি প্রায়।

—রুদ্রলীলা, অজিত দত্ত।

কল্লোল গোষ্ঠীর এই বেদনার বেদ গান—সে দেশী কিংবা বিদেশী, বাস্তব কিংবা রোমান্টিক যে সূত্র থেকেই জন্মলাভ করুক না কেন—বাংলা কাব্যে একটা নতুন সুর। নতুন এই অর্থে যে, জগৎ ও জীবনের আরেক আদলকে তার নিজের মূল্যেই দেখবার এমন সচেতন প্রয়াস—প্রায়-সর্বাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি আগে লক্ষ্য করা যায় নি। রবীন্দ্রনাথের বিষাদ-চেতনা যেমন আনন্দ-চেতনায় উত্তীর্ণ হওয়ার একটা ধাপ মাত্র, এ বিষাদ চেতনা তেমন নয়। কবিদের মনোভূমিতে যে আঁধারের উৎকণ্ঠা তা যৌবন ও প্রেমের উল্লাসের মধ্যেও দুঃখের ঘণ্টা বাজিয়েছে। অজিত দত্ত 'ধরণী' কবিতায় দেখেছেন—'ওগো ধরণী, নীরব ধরণী, ব্যথিত ধরা! / তবু সবুজ আঁচল-আড়ালে বেদনা-ভরা—।' এই বিশ্ববীক্ষায় যে সত্য নিহিত তা তাঁর 'রুদ্রলীলা'য় প্রায় সৃষ্টি-তত্ত্বের আকার নেওয়ার দিকে এগিয়েছে। তবে সে তত্ত্ব পুরোপুরি আকৃতি পেয়েছে কল্লোলের পৃষ্ঠায় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায়।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কিছুকাল আগে থেকে দুঃখবিলাসের মহড়া দিচ্ছিলেন। বাস্তুকার-কবি হিসাবে তিনি পারিপার্শ্বিক সুন্দর নয়—অসুন্দরের অধিষ্ঠান দেখে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুরাগী কবি সমাজের আনন্দবাদী জীবনদর্শনের প্রতিবাদ হিসাবে মরু-আখ্য কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর এই মরুমর্ম কল্লোলের বিষাদচারী তরুণ কবিকুলের মনোহরণ করেছিলো—তাঁরা যেন যতীন্দ্রনাথের কবিতায় শুনেছিলেন নিজেদের তদানীন্তন কণ্ঠস্বর। অগ্রজ কবিও তরুণদের আসরে পেয়েছিলেন সমধর্মা শ্রোতৃবৃন্দ। এই যোগাযোগের ফলে কল্লোলের কূলে ছড়িয়ে পড়লো যতীন্দ্রনাথের মরুর মায়া—'অন্ধকার'-এর রূপকভাষ্যে, 'দুঃখবাদী'র কাব্য-ইস্তাহারে, 'কবির কাব্য'-এর ইতিহাসে দুঃখ সত্য সৃষ্টির সার্বভৌম তত্ত্ব হিসেবে উত্থাপিত হলো। দুঃখবিলাস বাংলা কাব্যে আগেও দেখেছি, কিন্তু তার পরিচ্ছন্ন তত্ত্বরূপ দেখা গেলো এই প্রথম।

তোমাদেরি মাঝে আসে মাঝে মাঝে রাজার দুলাল ছেলে,
পরের দুঃখে কেঁদে কেঁদে যায় শত সুখ পায়ে ঠেলে।
কবি-আরাধ্য প্রকৃতির মাঝে কোথা আছে এর জুড়ি!
অবিচারে মেঘ ঢালে জল, তাও সমুদ্র হ'তে চুরি!
সৃষ্টির সুখে মহাখুসি যারা, তারা নর নহে, জড়;
যারা চিরদিন কেঁদে কাটাইল, তারাই শ্রেষ্ঠতর।

মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন্ সুখ ;
সত্য, সত্য, সহস্রগুণ সত্য,—জীবের দুঃখ।
সত্যদুখের আগুনে বন্ধু, পরাণ যখন জ্বলে,—
তোমার হাতের সুখ-দুখ-দান ফিরায়ে দিলেও চলে।

—দুঃখবাদী, কল্লোল, ফাল্গুন, ১৩৩৩।

তখনকার লেখক ও পাঠক সম্প্রদায় চমকিত হলেন, হলেন দিগ্‌ভ্রান্ত—ধনঞ্জয় শর্মার 'দুঃখবিবাদী' কবিতায় (কল্লোল, আষাঢ় ১৩৩৪) প্রতিবাদও শোনা গেলো। কিন্তু সেই সব আঘাতের প্রতিবাদে যতীন্দ্রনাথ দিলেন ব্যঙ্গের প্রত্যাঘাত—

এবার বুঝিনু খুবই,—
যত মার খাও,—চেঁচিয়ে কান্না বেরসিকী বেয়াদুবী।
মার রহস্য তাঁরি রসিকতা, খাঁটী ভগবদ্‌গীতা,
শক্রর হাতে মিছরির ছুরি, বেত্রহস্তে মিতা।
মোটের উপর জগৎ যখন সুখে হেসে কুটোকুটি,
দুখবাদী-বৈরাগী-আহ্বানে কে আর আসিবে ছুটি?

—প্রাপ্তিস্বীকার, কল্লোল, শ্রাবণ, ১৩৩৪।

কল্লোল-সাহিত্যের প্রকরণগত হাল-চাল তার ভাবগত আদর্শগুলির মতোই সেকালে অনেক উষ্মার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের দরবারে অভিযোগ পেশ করার সময় বলেছিলেন—'(কল্লোল ও কালিকলমের) এই লেখাগুলি দুই আকারে প্রকাশ পায়—কবিতা ও গল্প। কবিতা ও গল্পের যে প্রচলিত রীতি আমরা এতাবৎকাল দেখে আসছিলাম লেখাগুলি সেই রীতি অনুসরণ করে চলে না। কবিতা stanza, অক্ষর, মাত্রা অথবা মিলের কোনো বাঁধন মানে না। গল্পের form সম্পূর্ণ আধুনিক। লেখার বাইরেকার চেহারা যেমন বাধা-বাঁধনহারা ভেতরের ভাবও তেমনি উচ্ছৃঙ্খল।' ইতিহাসের দিক থেকে বলতে পারি, তিনি যেগুলিকে কল্লোল-সাহিত্যের 'দোষ' বলে ধরেছিলেন কালের বিচারে সেগুলিই আজ 'গুণ' বলে বিবেচিত হচ্ছে।

পত্রিকাটিতে স্তবক-অক্ষর-মাত্রা-মিলের সুষম বিন্যাস নিয়ে লিখিত অনেক কবিতা বেরিয়েছিলো। সেগুলি লিখনশৈলীর দিক থেকে প্রচলিত ধাঁচের কবিতা। কিন্তু কল্লোলেই আমরা আরেক ধরনের কবিতা পাই যেগুলিতে রূপ বা ছন্দ মিলের দিক থেকে শৈথিল্য দেখানোর সচেতন চেষ্টা আছে। রবীন্দ্রনাথ ছন্দ-মিল নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে করতে একদিন বলাকা (১৯১৬) লিখেছিলেন, নানা ঢঙে

চরণ ভেঙে সাজিয়েছিলেন পংক্তির আকারে। চরণান্তিক নয়—পর্বান্তিক মিলের এক আশ্চর্য আয়োজনও সেখানে দেখা গিয়েছিলো। তাই বাংলা কাব্যের ছন্দ মুক্তির ইতিহাস রচনায় এক অমূল্য উপকরণ হয়ে আছে বলাকা। এই মহৎ দৃষ্টান্ত ও অন্যান্য কিছু পরীক্ষাত্মক সৃষ্টির প্রভাবে পড়ে এবং পাশ্চাত্য কাব্যকলায় আধুনিক নমুনা দেখে কল্লোলের কোনো কোনো কবি ছোটো বড়ো নানা মাপের পংক্তি বা চরণ নিয়ে কবিতা লিখে চললেন। তার ভাবগত সমর্থন ছিলো এইখানে যে পদ্যের সৌষম্যে পৃথিবী তাঁদের কাছে ধরা দেয় নি। জীবনও ছিলো তাঁদের চোখে ছন্নছাড়া ছেলেটার মতো বিশৃঙ্খল। তাই যে কাব্যলক্ষ্মীর উজ্জীবন মন্ত্র তাঁরা উচ্চারণ করলেন তিনি সুধাপাত্র নয়—বিষভাণ্ড হাতে করেই আবির্ভূতা হলেন। আর সেই কাব্যলক্ষ্মী যে নতুন মূর্তি নিয়ে পাঠকের আসরে এসে দাঁড়াবেন সে তো স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের বলাকায় নানা মাপের পংক্তি-বিন্যাস যতোই চমকপ্রদ হোক চূড়ান্ত বিচারে দেখা যাবে তাতে আছে ছন্দ-লক্ষ্মীর সাভরণা বিচিত্র কঙ্কণ-ঝঙ্কার। কিন্তু কল্লোলের কিছু কবিতায় পংক্তি মাপের যে ব্যভিচার তার কারণ হচ্ছে এ-যুগের আটপৌরে কবিজনবধূর ক্লান্ত জীবনের অসম চরণপাত। শুধু-চরণ-সম্মিতির ক্ষেত্রে নয় স্তবক-অক্ষর-মাত্রার সৌষম্যের ক্ষেত্রেও যে শৈথিল্য এখানে স্বপ্রকাশ, তার নিহিতার্থ যেন ভাবীকালের গদ্য কবিতার জন্ম-সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলছিলো। মনে রাখতে হবে, এইভাবে কল্লোলের (এবং কালি-কলম, প্রগতি ইত্যাদির) পৃষ্ঠায় যে প্রাথমিক আয়োজন হলো প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো কবির হাতে তাই অনতিবিলম্বে রূপ নিলো গদ্য কবিতার (এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথাও স্মরণীয়)।

সাধারণভাবে আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রকরণিক ভিত্তিপ্রস্তর জুগিয়ে এবং বিশেষভাবে কোনো কোনো তরুণ কবির স্বকীয় বাণীবন্ধনকর্মের সূত্রপাত করে কল্লোল এক ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়েছে। নজরুলের দ্রোহাত্মক প্রভাষণ কিংবা-গজল গানের অন্তরঙ্গ ধ্বনি, প্রেমেন্দ্রে মিত্রের গণচেতনার সংহত স্বরায়ণ, বুদ্ধদেব বসুর প্রবৃত্তিবশ্যতার উদ্দাম উচ্চারণ এবং জীবনানন্দ দাশের 'অন্তর্গত রক্তের ভিতরে' নির্জন সংলাপ—এই সমস্তই যৌগিক বিন্যাসে যেমন এক রবীন্দ্রেতর সামগ্রিক স্বরভঙ্গির জন্ম দিয়েছে, তেমনি পৃথক পৃথক নিহিতার্থে এক একটি বাচনিক বলয় রচনা করেছে। আজ আমরা কবিতার কারুকর্মে প্রেমেন্দ্রীয় বা জীবনানন্দীয় বা বুদ্ধদেবী ঢঙ বলতে যা বুঝি তার অবতারণা কল্লোলের কালে এবং পরবর্তী কালে তার পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা। সে-কারণে বাংলা কবিতার আধুনিক পর্যায়ে কল্লোল যে প্রকরণিক মাত্রা নির্দেশ করেছে, তার মর্যাদা অনেক।

কল্লোলের গল্পের রূপকর্মও মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। সত্য বটে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটো গল্পের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ রূপ সঠিকভাবে নির্দেশ করে দিয়ে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিন্ত করে দিয়েছিলেন, তবু কল্লোলের কালে তার যে প্রসার ও বৈচিত্র্য—ভাব ও রূপ উভয় দিক থেকেই—আমাদের আরও আশান্বিত করে তোলে। তরুণ লেখকদের না মানার প্রবণতা, কালি-কলুষের বেসাতি, আদিমতম বৃত্তির পরিপোষকতা ও দারিদ্র্য বিলাস তাঁদের কাহিনীকে উদ্ধত, তাজা জলুস এবং কিছু না পাওয়ার হাহাকারে অস্থির করেই ক্ষান্ত হয় নি, তা বাংলা ছোটোগল্পকে স্থানবিশেষে একটা অনিয়মিত কাঠামো এনে দিয়েছে। এছাড়া তাঁরা দেখেছেন জীবন এক রহস্যপুরী—'তাকে নিয়ে এত আস্ফালন, এত উদ্বেগ এত ব্যস্ততা, কিছুরই মানে হয় না। শেষে ত সেই উদাসীন অন্ধকার অপেক্ষা করে আছে সমস্ত স্ফুলিঙ্গের জন্যে। এত ভাবনা, এত বেদনা, এত ছটফটানি সমস্ত বৃথা' ('বৃষ্টি', প্রেমেন্দ্র মিত্র)। এই রহস্যময়তার দৃষ্টিকোণে জীবনকে দেখার ফলে কল্লোলীয়দের জীবন সমালোচনার প্রণালীও ভিন্নতর হয়ে উঠেছে। তাঁরা জীবনের রহস্যাবগুণ্ঠনের দায়ে গল্পের মধ্যে বিশেষ মানসিক অবস্থা বা বিশেষ ঋতু বা বিশেষ সময়ের নিগূঢ় আভাস দিয়ে 'সাঙ্কেতিকতার অর্ধ-ভাস্বর জ্যোতির্মণ্ডল' রচনা করতে চেয়েছেন। এই সাঙ্কেতিকতার শৈল্পিক পদ্ধতি বাংলা ছোটগল্পে কল্লোলের দান। বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হ'ল উতলা'য় আলো অন্ধকারের প্রসঙ্গে এই সাঙ্কেতিকতার নিদর্শন আছে। দ্বিতীয়ত তাঁরা জীবন ও আত্মার সেই মূলগত রহস্য ধরতে গিয়ে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন। মানুষের বাহ্য আচার-আচরণ ক্রিয়া-কর্মের অন্তরালে যে নিঃসঙ্গ গভীর অতলান্ত মনোজগৎ আছে তা এঁরা কখনও কখনও তীক্ষ্ণাগ্র ভাষা ও সূক্ষ্মতাধর্মী বিশ্লেষণ ভঙ্গির সাহায্যে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। এই মনঃসমীক্ষণের প্রয়াস কতকটা অনিবার্যভাবেই বুদ্ধদেব বসুর 'অভিনয় ও অভিনয় নয়' গল্পে একটা আলোচনা-মূলক ও প্রবন্ধাত্মক রীতি এনে ফেলেছে। কিন্তু মনঃসমীক্ষণের আয়োজন প্রচ্ছন্ন বলেই প্রবোধকুমার সান্যাল ও যুবনাশ্বের গল্পগুলি তাদের গল্পত্ব হারিয়ে ফেলে নি। তৃতীয়ত কোনো কোনো লেখকের গল্পে জীবন-বীক্ষণ কাব্যানুপ্রেরিত হয়ে উঠেছে। চরিত্র পরিকল্পনায়, ঘটনাবিন্যাসে, জীবনের বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত বর্ণনায় এবং প্রকৃতির পরিবেশ রচনায় তাঁরা খুঁজেছেন কবিত্বের অবকাশ। গোকুলচন্দ্র ও সুনীতি দেবীর কথিকা-জাতীয় রচনায় গল্প বলতে কিছু নেই, আছে এক একটি মুড্-এর কাব্য রূপায়ণ। বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হ'ল উতলা' এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'সন্ধ্যারাগ' (বিষয়—যক্ষ্মা-রোগীর কবিত্ব)-এর মতো গল্পে মনস্তত্বের

মোড়কে কবিজনোচিত ভাবোচ্ছ্বাসকে ধরে রাখবার চেষ্টা আছে। চতুর্থত, কল্লোলের পৃষ্ঠাতে আমরা এমন গল্প পাই যাদের মধ্যে লেখকদের জীবন-রস-রসিকতা অর্থবহ সংযত চিত্রে রূপ লাভ করেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও জগদীশ গুপ্তের নাম এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে পড়বে।

এই সবের চেয়েও বড়ো কথা হচ্ছে, কল্লোলের পাতায় বাংলা ছোট গল্প বৃত্তান্ত গঠনের ও চরিত্র সৃষ্টির পূর্বতন সাফল্যকে আত্মসাৎ করে তাকে অতিক্রম করে যেতে চেয়েছে। জীবনের প্রস্থচ্ছেদের (cross-section) মধ্যে অতল-গভীর সমগ্র জীবনের স্বাদ দেওয়ার, নাটকীয় আরম্ভ এবং অতর্কিত অথচ অভ্রান্ত উপসংহারের সীমার মধ্যে জীবন সম্পর্কিত একমুখিন প্রতীতির দ্রুত সঞ্চরণের শিল্পরস উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পাই কল্লোলের ছোট গল্পে।

কল্লোলীয় সাহিত্যের এই হচ্ছে মর্মকথা। বিস্তৃত আলোচনায় দেখা যাবে, আরও অনেক কথা বলার অবকাশ আছে। তবে সেই অনেক কথার মধ্যে একটা বড়ো অংশ হবে গতানুগতিকতা ও পূর্বানুবৃত্তির কথা। কারণ কল্লোল সব বর্তমান জিনিসের মতোই পূর্বতনের জেরও বহন করেছে। তার সাধনায় যেটুকু অভিনব ও নতুন কালের সম্পদ আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে তার মূল্যই বেশি। আমরা সেই নূতনের পুরো হিসেব না নিয়ে কয়েকটি মৌল লক্ষণ নির্দেশ করেছি মাত্র। তা থেকে এইটুকু বোঝাতে চেয়েছি যে কল্লোলের কালে বাংলা সাহিত্য পালা-বদলের মহড়া দিয়েছে। মহড়ার পরের কাহিনী হচ্ছে আসল কথা, সেখানেই সত্যাসত্য যাচাই হয়। তাই কল্লোলের ভূমিকার ঐতিহাসিক মূল্য খুঁজতে হবে শুধু তার সাত বছরের জীবৎকালের মধ্যে নয়, কল্লোলোত্তর বাংলা সাহিত্যের মধ্যেও।

১. প্রমথ চৌধুরী, 'ইউরোপে কুরুক্ষেত্র' (১৩২১) ও 'বর্তমান সভ্যতা বনাম বর্তমান যুদ্ধ' (১৩২১), নানা-কথা (১৯১৯), পৃঃ ১৪৮—১৭৭।

২. 'অভিনয় নয়', কল্লোল, কার্তিক, ১৩৩৬।

৩. 'বনস্পতির মৃত্যু', কল্লোল, শ্রাবণ, ১৩৩৩।

৪. অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র, পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত সনেট-পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা (১৮৮৩ শকাব্দ), পৃ ১৫৬।

৫. রচনাকাল ; ১৯১২।

৬. প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৩০।

৭. অন্নদাশংকর রায়, প্রবন্ধ, পৃঃ ৬৯৯ –৭০০।

পঞ্চম অধ্যায়

কল্লোলের সূচীপত্র ঃ লেখা ও লেখক

প্রথম বর্ষ ঃ ১৩৩০

ক. বৈশাখ : ১ম সংখ্যা : ১৩৩০

১. কল্লোল (কবিতা)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ২. বীণা (গল্প)—সুনীতি দেবী। ৩. মা (গল্প)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৪. কল্লোল (কথিকা)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার। ৫. রিক্তা (গল্প)—কেতকী দেবী। ৬. সংগ্রহ (সুভাষিত সংগ্রহ)। ৭. পুঁটেরাম (গল্প)—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ৮. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৯. ফুলের আকাশ (গল্প) —দীনেশরঞ্জন দাশ। ১০. ভাঙ্গাবাড়ী (গল্প)—অতুলেন্দু সেনগুপ্ত। ১১. বিড়ালের স্বর্গ (অনুবাদ-গল্প)—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় [মূল : Emile Zola]। ১২. বসন্তবিলাপ (কবিতা)—দীপঙ্কর (কালিদাস নাগ)।

খ. জ্যৈষ্ঠ : ২য় সংখ্যা : ১৩৩০

১. সৃষ্টি সুখের উল্লাসে (কবিতা)—নজরুল ইসলাম। ২. মন্দিরে (গল্প) —সুনীতি দেবী। ৩. বেনামী জিনিষ (গল্প)—নাম নেই**। ৪. নারীর মন (গল্প)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৫. পথিক (উপন্যাস)—গোকুল চন্দ্র নাগ। ৬. অশ্রু (কথিকা)—রবীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। ৭. কাজের মানুষ (ব্যঙ্গরচনা)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ৮. কবির মরণ (কথিকা)— প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। ৯. বিড়ালের স্বর্গ (অনুবাদ-গল্প)—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় [মূল : Emile Zola]। ১০. স্বামী (গল্প)—ভবতারণ বসু। ১১. সংগ্রহ (সুভাষিত সংগ্রহ)। ১২. ললিতকুমার দে (পরিচয়লিপি) —সম্পাদক। ১৩. আলোচনা (পুস্তকাদির পরিচয়)—সম্পাদক। ১৪. লক্ষ্মীছাড়া (কবিতা)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৫. সমাচার।

গ. আষাঢ় : ৩য় সংখ্যা : ১৩৩০

১. কল্লোল (কবিতা)—জীবনময় রায়। ২. ফুলের গান (কথিকা)— দীনেশরঞ্জন দাশ। ৩. মায়াবিনী (গল্প)—রেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪. দি টুয়েল্‌ভ্ পাউণ্ড লুক্ (অনুবাদ-নাটক)—মণীন্দ্রলাল বসু [মূল :

J. M. Barrie]। ৫. আমার সান্ধ্যসমিতি (রসরচনা)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার। ৬. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৭. বাজীমাৎ (গল্প)—সান্ত্বনা বসাক। ৮. শেষ অনুরোধ (গল্প)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৯. ধরা ছোঁয়া (কবিতা)—নরেন্দ্র দেব। ১০. সংগ্রহ (সুভাষিত সংগ্রহ) —সম্পাদক। ১১. আলোচনা (পত্র পরিচয় ও নাট্যালোচনা)—সম্পাদক ১২. ফিরিওলার গান (সঙ্গীত)—রচনা : চণ্ডীচরণ মিত্র ; সুর ও স্বরলিপি মোহিনী সেনগুপ্তা। ১৩. সমাচার—সম্পাদক।

ঘ. **শ্রাবণ : ৪র্থ সংখ্যা : ১৩৩০**

১. অভিশাপ (কবিতা)—নজরুল ইসলাম। ২. পথ চাওয়া (গল্প)—সুনীতি দেবী। ৩. ফুলের পূজা (কথিকা)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ৩. স্নেহের ক্ষুধা (কথিকা)—নির্মলচন্দ্র সিংহ। ৫. দি টুয়েল্‌ভ্‌ পাউণ্ড লুক্ (অনুবাদ নাটক)—মণীন্দ্রলাল বসু [মূল : J· M Barrie]। ৬. পথিক (উপন্যাস) —গোকুলচন্দ্র নাগ। ৭. নারীর মন (কথিকা)—লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়। ৮. জুতা-মাহাত্ম্য (রসরচনা)—অগ্নিশর্মা। ৯. ঘাটের পথে (উপন্যাস) —হরিপদ বসু। ১০. বিদ্রোহ (কবিতা)—পুলকচন্দ্র সিংহ। ১১. সংগ্রহ (সুভাষিত সংগ্রহ)—সম্পাদক। ১২. আলোচনা (সাহিত্য-চিন্তা ও পত্রপরিচয়)—সম্পাদক। ১৩. সমাচার—সম্পাদক।

ঙ. **ভাদ্র : ৫ম সংখ্যা : ১৩৩০**

১. হেঁয়ালি (কবিতা)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার। ২. দয়িতা (কথিকা)—নাম নেই। ৩. ছিরে (গল্প)—সুশীলকুমার রায়। ৪. মা (গল্প)—নৃসিংহদাসী দেবী। ৫. কেশর (গল্প)—কৃষ্ণধন দে। ৬. ডায়েরীর একপাতা (কথিকা)—নীলিমা বসু। ৭. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৮. ঘাটের পথে (উপন্যাস)—হরিপদ বসু। ৯. ছুটির দিনে (কথিকা)—অনুপম গুপ্ত [দীনেশরঞ্জন দাশ]। ১০. সংগ্রহ (সুভাষিত সংগ্রহ)—সম্পাদক। ১১. জীবন (কবিতা)—দীপঙ্কর [কালিদাস নাগ]। ১২. আলোচনা (পত্রপরিচয় ও নানাচিন্তা)—সম্পাদক। ১৩. সমাচার —সম্পাদক।

চ. **আশ্বিন : ৬ষ্ঠ সংখ্যা : ১৩৩০**

১. আশান্বিতা (কবিতা)—নজরুল ইসলাম। ২. উপেক্ষিতা (কথিকা) —সুনীতি দেবী। ৩. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৪. বিদ্রোহীর ডায়েরী (কথিকা)—ভূপতি চৌধুরী। ৫. ঘাটের পথে (উপন্যাস)—

হরিপদ বসু। ৬. ঝুমরু (গল্প)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৭. মানসী (গল্প)—কৃষ্ণপদ দাস। ৮. গৌরী (গল্প)—অহল্যা গুপ্ত। ৯. গায়িকা (গল্প)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১০. প্রাচীর (কথিকা)—সোমনাথ সাহা। ১১. সুখের শেষ (গল্প)—রেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২. সংগ্রহ—সম্পাদক। ১৩. অগোচর (কবিতা)—গিরিজাকুমার বসু। ১৪. সমাচার—সম্পাদক।

ছ. কার্তিক : ৭ম সংখ্যা : ১৩৩০

১. শিশু (কবিতা)—সুধীরকুমার চৌধুরী। ২. জয়-পরাজয় (কথিকা)—হরিহর চন্দ্র। ৩. সিদ্ধি (গল্প)—রামকানাই সামন্ত। ৪. আত্মদান (গল্প)—সুরুচিবালা রায়। ৫. চিঠি (কথিকা)—সমরেন্দ্রনাথ রায়। ৬. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৭. পারুল (গল্প)—সুকুমার ভাদুড়ী। ৮. নির্বাণের পথে (গল্প)—হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়। ৯. আঁধারের আশা (গল্প)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১০. ঘাটের পথে (উপন্যাস)—হরিপদ বসু। ১১. সংগ্রহ (সুভাষিত)—সম্পাদক। ১২. আলোচনা (নানাচিন্তা)—সম্পাদক। ১৩. সমাচার—সম্পাদক।

জ. অগ্রহায়ণ : ৮ম সংখ্যা : ১৩৩০

১. শ্রাবণ-শেষে (কবিতা)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ২. বন্ধন (কথিকা)—শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ৩. শেষ বেলা (কথিকা)—মিনতি দেবী। ৪. যাত্রা-পথে (গল্প)—নৃসিংহদাসী দেবী। ৫. ছবি (কথিকা)—ইন্দুলেখা দেবী। ৬. সরাইখানা (গল্প)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ৭. রক্তের বান (কথিকা)—অনিলকুমার ভট্টাচার্য। ৮. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৯. তুমি প্রাণে (কবিতা)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার। ১০. ঘাটের পথে (উপন্যাস)—হরিপদ বসু। ১১. নারী (গল্প)—ভূপতি চৌধুরী। ১২. মরমী (গান)—রচনা : নজরুল ইসলাম ; সুর ও স্বরলিপি—মোহিনী সেনগুপ্তা। ১৩. সংগ্রহ (সুভাষিত)—সম্পাদক। ১৪. সমাচার—সম্পাদক।

ঝ. পৌষ : ৯ম সংখ্যা : ১৩৩০

১. আলতা-স্মৃতি (কবিতা)—নজরুল ইসলাম। ২. ফিরে চাওয়া (কথিকা)—হরিহর চন্দ্র। ৩. তৃষিত (গল্প)—সান্ত্বনা বসাক। ৪. ব্যথা (গল্প)—প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত। ৫. গাঁয়ের মাটি (গল্প)—অনুপম গুপ্ত [দীনেশরঞ্জন দাশ]। ৬. পথের সাথী (কথিকা)—মুরলীধর বসু।

৭. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৮. চিরকুমার (কবিতা—সুধীররঞ্জন রায়চৌধুরী। ৯. কল্যাণী (গল্প)—অহল্যা গুপ্ত। ১০. সংগ্রহ—সম্পাদক। ১১. আলোচনা (নানাচিন্তা)—সম্পাদক। ১২. মানুষ চাই (কবিতা)—বনফুল। ১৩. সমাচার—সম্পাদক।

ঞ. মাঘ: ১০ সংখ্যা: ১৩৩০

১. ওঠ বীর (কবিতা)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ২. মরণ-বরণ (গল্প)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৩. মনস্কামনেশ্বর (গল্প)—সীতাদেবী। ৪. অভিসার (কথিকা)—হিরণকুমার বসু। ৫. কালের গতিক (গল্প)—সুবোধ রায়। ৬. কাহিনী (আরনল্ড্ বেনেট্-এর পরিচয়)—দীনেশ রঞ্জন দাশ। ৭. বিচার (গল্প)—প্রিয়কুমার গোস্বামী। ৮. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৯. বড়দিন (গল্প)—সুকুমার ভাদুড়ী ১০. মার্জনা (গল্প)—প্রবোধকুমার সান্যাল। ১১. সংগ্রহ (সুভাষিতাবলী)—সম্পাদক। ১২. আলোচনা (পুস্তক ও পত্রপরিচয়সহ নানাচিন্তা)—সম্পাদক। ১৩. চিঠি (পাঠকের পত্র)—মুকুন্দপ্রসাদ সিংহ। ১৪. প্রেম (কবিতা)—সুনীতি দেবী। ১৫. চিরন্তন (কথিকা)—রাধাচরণ চক্রবর্তী ১৬. সমাচার—সম্পাদক।

ট. ফাল্গুন: ১১শ সংখ্যা: ১৩৩০

১. বিদ্রোহ (কবিতা)—সুধীরকুমার চৌধুরী। ২. পাগ্‌লা হাওয়া (কথিকা)—সত্যরঞ্জন বসু। ৩. পাষবীণা (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৪. অশোক (গল্প)—অনুপম গুপ্ত। ৫. ভবিতব্য (গল্প)—নৃসিংহদাসী দেবী। ৬. মা-হারা (গল্প)—রবীন্দ্রলাল রায়। ৭. আহ্বান (গল্প)—কৃষ্ণপদ দাস। ৮. উপেক্ষিতা (গল্প)—অমরেন্দ্রনাথ বসু। ৯. কাহিনী (সাহিত্য-চিন্তা)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১০. বকুল (গল্প)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১১. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ ১২. আলোচনা (পত্রিকাচিন্তা)—সম্পাদক। ১৩. সংগ্রহ (সুভাষিতাবলী)—সম্পাদক। ১৪. সমাচার (পত্রিকা ও গ্রন্থ পরিচয়)—সম্পাদক।

ঠ. চৈত্র: ১২শ সংখ্যা: ১৩৩০

১. রৌদ্র-দগ্ধের গান (কবিতা)—নজরুল ইসলাম। ২. মনের দেখা (কথিকা)—সুনীতি দেবী। ৩. অপূর্ণ (গল্প)—সোমনাথ সাহা। ৪. পরিচয় (গল্প)—ভূপতি চৌধুরী। ৫. চম্পা (গল্প)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ৬. ঝড়ের রাতে (গল্প)—সরোজকুমারী দেবী। ৭. গ্রেপ্তার

(গল্প ; ইংরেজী গল্পের ছায়া)—শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ৮. সংসার (গল্প) —মিনতি দেবী। ৯. পাম্ববীণা (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১০. স্মৃতি-চিহ্ন (গল্প)—অনিলকুমার ভট্টাচার্য। ১১. সত্য (নাটিকা) —পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। ১২. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ১৩. কাহিনী (সাহিত্যচিন্তা)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৪. সংগ্রহ (স্থভাষিতাবলী)—সম্পাদক। ১৫. আলোচনা (পত্র-চিন্তা)—সম্পাদক। ১৬. সমাচার—সম্পাদক।

দ্বিতীয় বর্ষ : ১৩৩১

ক. বৈশাখ : ১ম সংখ্যা : ১৩৩১

১. শেষ অর্ঘ্য (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. পারের খেয়া (গল্প) —সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৩. পাম্ববীণা (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৪. চাওয়া (গল্প)—লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়। ৫. বিচ্ছেদ (গল্প)—কুমুদিনীকান্ত কর। ৬. শ্রান্তির শেষ (গল্প)—নৃসিংহদাসী দেবী। ৭. পিয়াসী (অনুবাদ-গল্প)—স্থকুমার ভাদুড়ী [মূল : গর্কী]। ৮. বনফুল (গল্প)—স্থনীতি দেবী। ৯. প্রিন্স (গল্প)—প্রমথ চৌধুরী। ১০. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ১১. ভূতের বোঝা (প্রবন্ধ)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার। ১২. আলোচনা (নানাচিন্তা)—সম্পাদক। ১৩. ছোটগল্প (সমালোচনা)—সম্পাদক। ১৪. কাহিনী (সাহিত্য-চিন্তা)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৫. রূপ (গল্প)—মুরলীধর বসু। ১৬. দুইদিন (গল্প) —স্থধাংশুবিকাশ রায়চৌধুরী। ১৭. সংগ্রহ (স্থভাষিতাবলী)—সম্পাদক। ১৮. বসন্ত—দীপঙ্কর [কালিদাস নাগ]। ১৯. সমাচার—সম্পাদক। অন্যান্য—পরিচয়লিপি, ছবি।

খ. জ্যৈষ্ঠ : ২য় সংখ্যা : ১৩৩১

১. প্রত্যয় (কবিতা)—স্থবোধ রায়। ২. সন্ধিক্ষণ (গল্প)—সত্যেন্দ্র কুমার বসু। ৩. ঝরাফুল (গল্প)—শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ৪. দিদি (গল্প)—প্রবোধকুমার সান্যাল। ৫. পাম্ববীণা (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৬. বরুণা (গল্প)—নীলিমা বসু। ৭. ভুলের শাস্তি (কথিকা)—স্থবোধ দাশগুপ্ত। ৯. ভোলা (গল্প)—হীরেন্দ্রনারায়ণ

আচার্য চৌধুরী। ১০. হারানিধি (গল্প)—হরিসত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। ১১. রঙ্গীন ছবি (ছবি-আলোচনা) নাম নেই। ১২. সংগ্রহ (সুভাষিত) —সম্পাদক। ১৩. নীরব (কবিতা)—শৈলবালা সেন। ১৪. সমাচার (পুস্তক-পরিচয়)—সম্পাদক। অন্যান্য—পরিচয়লিপি, ছবি।

গ. আষাঢ় : ৩য় সংখ্যা : ১৩৩১

১. ঝড় (কবিতা)—নজরুল ইসলাম। ২. খাতা (গল্প)—নৃসিংহদাসী দেবী। ৩. সাগরিকা (গল্প)—প্রমথনাথ বিশী। ৪. আরেক ফাল্গুনে (গল্প)—শিবরাম চক্রবর্তী। ৫. মুকুল (গল্প)—রেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়। ৬. বালুবেলা (গল্প)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ৭. পূজা (গল্প)—সুনীতি দেবী। ৮. পান্থবীণা (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৯. শুদ্ধ-শাসন-প্রচেষ্টা (গল্প)—আনন্দসুন্দর ঠাকুর [প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়]। ১০. বিধবা (গল্প)—অহল্যা গুপ্ত। ১১. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ১২. সংগ্রহ (সুভাষিতাবলী)—সম্পাদক। ১৩. আলোচনা (নানাচিন্তা)—সম্পাদক। ১৪. দুজনে—সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৫. সমাচার—সম্পাদক। অন্যান্য—পরিচয়লিপি, ছবি।

ঘ. শ্রাবণ : ৪র্থ সংখ্যা : ১৩৩১

১. অভাবিত (কবিতা)—সুধীরকুমার চৌধুরী। ২. সংক্রান্তি (গল্প) —প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৩. গুমোট (গল্প)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৪. বাদল বেলা (গল্প)—বিজয় সেনগুপ্ত। ৫. বিধবা (গল্প)—অহল্যা গুপ্ত। ৬. পান্থবীণা (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৭. প্রতীক্ষায় (গল্প)—সুষমা মুখোপাধ্যায়। ৮. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৯. পূবের হাওয়া (কবিতা)—নজরুল ইসলাম। ১০. প্রাপ্ত পত্র (সমালোচনা)—সুশান্ত সেন। ১১. কে লইবে (কবিতা)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১২. নিয়মিত লেখক (প্রবন্ধ)—সম্পাদক। ১৩. সংগ্রহ (সুভাষিত) —সম্পাদক। ১৪. সমাচার (পুস্তক ও পত্রপরিচয়)—সম্পাদক। অন্যান্য—পরিচয়লিপি, ছবি।

ঙ. ভাদ্র : ৫ম সংখ্যা : ১৩৩১

১. অম্লান পুষ্প (কবিতা)—সুধীরকুমার চৌধুরী। ২. চোখের চাতক (গল্প)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৩. পোড়ো বাড়ী (গল্প)—সুকুমার গজুড়ী। ৪. কালো মেয়ে (গল্প)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৫. কাজল-আঁখি দাশনা (গল্প)—প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়। ৬. সিঁদেল চোর (গল্প)—সুবোধ

দাশগুপ্ত। ৭. মেঘদূত (কবিতা)—দীপঙ্কর [কালিদাস নাগ]। ৮. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৯. কাহিনী (সাহিত্যচিন্তা)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১০. পাম্ববীণা (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১১. প্রাপ্ত-পত্র (সমালোচনা)—সুশান্ত সেন। ১২. কোথায় যেন পড়েছি (সংগ্রহ)—সম্পাদক। ১৩. পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়—সম্পাদক ১৪. কল্লোল (গল্প)—হীরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরী। ১৫. সমাচার—সম্পাদক। অন্যান্য—ছবি, পরিচয়লিপি।

চ. আশ্বিন : ৬ষ্ঠ সংখ্যা : ১৩৩১

১. বুড়ো-ঝি (গল্প)—নীলিমা বসু। ২. বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে, বন্দী মোর ভগবান কাঁদে (গল্প)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৩. শীতের নিঃশ্বাস (গল্প)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৪. স্মৃতির খাতা (গল্প)—সুনীতি দেবী। ৫. মেঘের হাসি (গল্প)—ভূপতি চৌধুরী। ৬. দেবতার গ্রাস (গল্প)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৭. ব্যর্থ-অশ্রু (গল্প)—নৃসিংহদাসী দেবী। ৮. পাষাণ-পুরী (গল্প)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ৯. ওস্তাদ-জি (গল্প)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১০ শশী পণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী (গল্প)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

ছ. কার্তিক : ৭ম সংখ্যা : ১৩৩১

১. ভাইফোঁটা (গল্প)—সান্ত্বনা বসাক। ২. আঁধি (গল্প)—বিজয় সেনগুপ্ত ৩. ঝাপট (গল্প)—সুকুমার ভাদুড়ী। ৪. ওরে পথিক (কবিতা)—সুবোধ রায়। ৫. মরুতৃষা (গল্প)—ভূপতি চৌধুরী। ৬. পথিক (উপন্যাস)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৭. বীরপুরুষের লাঞ্ছনা (গল্প)—প্রমথ চৌধুরী। ৮. পাম্ববীণা (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৯. কাহিনী (সাহিত্যচিন্তা)—জসীম উদ্দিন। ১০. সর্বনাশের ঘণ্টা (কবিতা)—নজরুল ইসলাম। ১১. পুস্তক পরিচয়—সম্পাদক।

জ. অগ্রহায়ণ : ৮ম সংখ্যা : ১৩৩১

১. চাষা (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ২. তিলোত্তমা (গল্প)—শান্তা দেবী। ৩. শাস্তি (গল্প)—শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৪. মালা (কবিতা)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার। ৫. অভিমান (গল্প)—নীলিমা বসু। ৬. আশার বাণী (প্রবন্ধ : এইচ. জি. ওয়েলস)—সম্পাদক। ৭. ভূঁই-চাঁপা—প্রবোধকুমার সান্যাল। ৮. আনাতোল ফ্রাঁস—কালিদাস নাগ। ৯. ছোট-গল্পের কথা—কুসুমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০. সংগ্রহ (সাহিত্যকথা)

—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১১. গল্প-সাহিত্যে দুঃসাহস (প্রবন্ধ)—সম্পাদক। ১২. দানব (গল্প)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩. ভাটির মায়া (কবিতা) —জসীম উদ্দিন। ১৪. প্রাণ-প্রতিষ্ঠা (গল্প)—রামনারায়ণ রায়। ১৫. সহযাত্রী (গল্প)—রবীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৬. পাম্ববীণা (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১৭. মনোলোক (সাহিত্যকথা) —সম্পাদক। ১৮. প্রাপ্ত পুস্তক পরিচয়—সম্পাদক।

ঝ. পৌষ : ৯ম সংখ্যা : ১৩৩১

১. অমর সমাধি (কবিতা)—সুবোধ দাশগুপ্ত। ২. পুরুষ (গল্প)—রাধারাণী দত্ত। ৩. কমলা কেবিন (গল্প)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৪. স্নেহের জয় (গল্প) —রমেশচন্দ্র দাশ। ৫. মাটির খেলা (গল্প)—সত্যেন্দ্রকুমার দাস। ৬. রোক্ শোধ (গল্প)—নৃসিংহদাসী দেবী। ৭. কমালী (গল্প)—নরেন্দ্র দেব। ৮. রূপকথা (গল্প)—সোমনাথ সাহা। ৯. ত্যাগ (গল্প ; জাপানী কাহিনী) —রেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়। ১০. গোষ্পদ (গল্প)—যুবনাশ্ব। ১১. মুক্তি-পথে (কবিতা)—সুবোধ রায়। ১২. কাহিনী (William Le Quex-এর জীবন-কাহিনী)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ১৩. প্রকৃতি-সুন্দরী (গান)—অতুলপ্রসাদ সেন। ১৪. সংগ্রহ—সম্পাদক। ১৫. বাংলা সাহিত্যের কথা (অনুবাদ—প্রবন্ধ)—প্রমথ চৌধুরী (অনুবাদ : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়)। ১৬. পাহাড়ের পথে (গল্প)—শৈলবালা ঘোষজায়া। ১৭. সমালোচনা আলোচনা (প্রবন্ধ)—সম্পাদক। ১৮. পাম্ববীণা (উপন্যাস) —শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

ঞ. মাঘ : ১০ম সংখ্যা : ১৩৩১

১. কবি-নাস্তিক (কবিতা)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ২. মুক্তি (নাটিকা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৩. বসন্ত-বেদনা (গল্প)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৪. অন্ধকার (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ৫. বাংলা সাহিত্যের কথা (অনুবাদ প্রবন্ধ)—প্রমথ চৌধুরী [অনুবাদ : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়] ৬. মৃত্যুঞ্জয় (গল্প)—যুবনাশ্ব। ৭. বন্ধ্যা (গল্প)—প্রফুল্লকুমার রায় চৌধুরী। ৮. দুই দিন (গল্প)—নির্মলকুমার রায়। ৯. মানসী (গল্প) —দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০. পাম্ববীণা (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১১. বিদ্যা-বণিক (প্রবন্ধ)—সম্পাদক। ১২. অবস্থান্তর (গল্প)—নৃসিংহদাসী দেবী। ১৩. প্রতীক্ষায় (গল্প)—সুবোধ দাশগুপ্ত। ১৪. রম্যাঁ রলাঁ (প্রবন্ধ)—কালিদাস নাগ। ১৫. পথের আলো (গল্প)

—বিজয় সেনগুপ্ত। ১৬. নিবেদন (জঁা ক্রিসতফ-এর অনুবাদ সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি)

ট. ফাল্গুন : ১১শ সংখ্যা : ১৩৩১

১. অনাগত কবি (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ২. সেথা তুমি পূর্ণ ছিলে (কবিতা)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৩. যৌবন-বিদায় (কবিতা)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ৪. সৃষ্টির প্রথম প্রাতে বিধাতার মনে যে কথাটি ছিল সঙ্গোপনে (কবিতা)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৫. ফাল্গুনের গান (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৬. জঁা ক্রিস্‌তফ্‌ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রম্যঁা রলঁা (অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও গোকুলচন্দ্র নাগ) ৭. কাব্য-কানন (গল্প)—বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮. ন্যূট হামসুন (প্রবন্ধ)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ৯. ফাল্গুন-হাওয়া (গল্প)—বিজয় সেনগুপ্ত। ১০. কালনেমী (গল্প)—যুবনাশ্ব। ১১. ভিখারী (গল্প)—শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ১২. বাংলা সাহিত্যের কথা (অনুবাদ-প্রবন্ধ)—প্রমথ চৌধুরী [অনুবাদ : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়] ১৩. পাম্ববীণা (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১৪. মিলন (গল্প)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৫. অভিনেত্রী (গল্প)—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। ১৬. ভাগ্যবতী (গল্প)—দীনেশচন্দ্র লোধ। ১৭. প্রাপ্ত-পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়—সম্পাদক।

ঠ. চৈত্র : ১২শ সংখ্যা : ১৩৩১

১. অন্ধকার (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. জঁা ক্রিস্‌তফ্‌ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রম্যঁা রলঁা [অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও গোকুলচন্দ্র নাগ] ৩. জীবন-শিয়রে বসি স্বপ্ন দেয় দোল (কবিতা)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৪. অগ্নিশিখা (গল্প)—ভূপতি চৌধুরী। ৬. সাঁঝে (কবিতা)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার। ৬. রাত বিরেতে (গল্প)—যুবনাশ্ব। ৭. ধরাতে চরণ রাখি আকাশেরে লইব মাথায় (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৮. আশা (গল্প)—রামপরায়ণ রায়। ৯. পাম্ববীণা (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১০. ম্যাক্সিম গর্কী (প্রবন্ধ)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১১, নৈয়ায়িক (গল্প)—প্রমথনাথ বিশী। ১২. পাশের বাড়ী (গল্প)—নৃসিংহদাসী দেবী। ১৩. কমলমধু (গল্প)—অনুপম গুপ্ত [দীনেশরঞ্জন দাশ]। ১৪. একটা নিবেদন (সম্পাদকীয় নিবেদন)

তৃতীয় বর্ষ ঃ ১৩৩২

ক. বৈশাখ ঃ ১ম সংখ্যা ঃ ১৩৩২

১. মুক্তি (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. চিঠি (চিঠিপত্র)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩. যাত্রা (কবিতা)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৪. স্মৃতির আলো (উপন্যাস)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৫. রাত্রি (কথিকা)—সুনীতি দেবী। ৬. নববর্ষের গান (কবিতা)—অমিয় চক্রবর্তী। ৭. জাঁ ক্রিস্তফ্ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রমাঁ্যা রলাঁ [অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও গোকুলচন্দ্র নাগ] ৮. উদ্বেলিত যৌবনের সিন্ধুতীরে (কবিতা)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৯. গমের দানা ডিমের মত বড় (অনুবাদ-গল্প)—লিও টলস্টয় [অনুবাদ : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর] ১০. কেয়ার কাঁটা (নাটিকা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ১১. পঞ্চশর (গল্প)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১২. রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য (প্রবন্ধ)—বীরবল। ১৩. পান্থবীণা (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১৪. চৈতী-হাওয়া (কবিতা)—নজরুল ইসলাম।

খ. জ্যৈষ্ঠ ঃ ২য় সংখ্যা ঃ ১৩৩২

১. রেল-ঘুম (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। শরৎচন্দ্র (জীবনী)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৩. সূর্য (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৪. রামলাল (গল্প)—জলধর সেন। ৫. শরৎচন্দ্র (প্রবন্ধ)—গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৬. স্মৃতির আলো (উপন্যাস)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৭. ভুখা ভগবান (গল্প)—যুবনাশ্ব। ৮. দৈবধন (গল্প)—জগদীশচন্দ্র গুপ্ত। ৯. জাঁ ক্রিস্তফ্ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রমাঁ্যা রলাঁ [অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও গোকুলচন্দ্র নাগ]। ১০. নীচের সমাজ (গল্প)—পঞ্চানন ঘোষাল। ১১. কবির উত্তরাধিকারী (গল্প)—সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। [ফরাসী লেখক Andre Godard অনুসরণে]। ১২. পাঁকের পোকা (গল্প)—সুকুমার ভাদুড়ী। ১৩. দীর্ঘ-নিশ্বাস ক্লাব (গল্প)—সুবোধ দাশগুপ্ত।

গ. আষাঢ় ঃ ৩য় সংখ্যা ঃ ১৩৩২

১. আষাঢ়ক মাহ (কবিতা)—সুরেশচন্দ্র ঘটক। ২. বিরহ (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৩. নিশীথ-রাতে (কবিতা)—প্রেমকুমার চক্রবর্তী। ৪. একখানা চিঠি (গল্প)—প্রফুল্লকুমার রায়চৌধুরী।

৫. শরৎচন্দ্র (জীবনী)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৬. কবর (গ্রাম্যকবিতা)—জসীম উদ্দীন। ৭. মহামানব (গল্প)—সুবোধ দাশগুপ্ত। ৮. স্মৃতির আলো (উপন্যাস)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৯. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১০. স্মৃতির পরশ (প্রবন্ধ)—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১১. পঞ্চশর (গল্প)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১২. জাঁ ক্রিস্তফ্ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রমঁ্যা রলাঁ। [অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও গোকুলচন্দ্র নাগ] ১৩. ডাকঘর (পুস্তক পরিচয়)—সম্পাদক। ১৪. মরুর বাতাস (গল্প)—সত্যেন্দ্রকুমার দাস।

ঘ. শ্রাবণ : ৪র্থ সংখ্যা : ১৩৩২

১. রাজর্ষি চিত্তরঞ্জন (প্রবন্ধ)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ২. জীবনাহুতি (প্রবন্ধ : চিত্তরঞ্জন স্মৃতিতর্পণ)—পঞ্চানন মজুমদার। ৩. আজ আমি চ'লে যাই (কবিতা)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৪. দা' গোঁসাই—সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ৫. সুদূর (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৬. শরৎচন্দ্র (জীবনী)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৭. আমার গোয়েন্দাগিরি—বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৮. পান্থবীণা (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৯. মিনতি (কবিতা)—কুসুমকুমারী দেবী। ১০. স্মৃতির আলো (উপন্যাস)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১১. জাঁ ক্রিস্তফ্ (অনুবাদ উপন্যাস)—রমঁ্যা রলাঁ। [অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও গোকুলচন্দ্র নাগ] ১২. ডাকঘর (চিত্তরঞ্জন স্মৃতিতর্পণ)—সম্পাদক। ১৩. রাজ-ভিখারী (গান : চিত্তরঞ্জন)—নজরুল ইসলাম। ১৪. দেশবন্ধু (গান)—নিরুপমা দেবী। ১৫. নবীন বুদ্ধ (কবিতা : চিত্তরঞ্জন স্মৃতিতর্পণ)—বীণাপাণি দেবী। ১৬. বন্ধু-হারা (কবিতা : চিত্তরঞ্জন স্মৃতিতর্পণ)—নরেন্দ্র দেব। ১৭. মহাপ্রয়াণ (গান : চিত্তরঞ্জন স্মৃতিতর্পণ)—বিশ্বপতি চৌধুরী। ১৮. দেশবন্ধু (প্রবন্ধ)—অতুলচন্দ্র গুপ্ত। ১৯. শেষ সাক্ষাৎ (প্রবন্ধ : চিত্তরঞ্জন স্মৃতিতর্পণ)—শৈলেশনাথ বিশী। ২০. চিত্ত-স্মারক (কবিতা : চিত্তরঞ্জন স্মৃতিতর্পণ)—হেমেন্দ্রকুমার রায়। ২১. ভাঙ্গিতে চাই কেন (বক্তৃতা)—চিত্তরঞ্জন দাশ [অনুবাদ : পঞ্চানন মজুমদার] ২২. চিত্ত-তীর্থে (কবিতা : চিত্তরঞ্জন স্মৃতিতর্পণ)—নলিনীকান্ত সরকার।

ঙ. ভাদ্র : ৫ম সংখ্যা : ১৩৩২

১. পান্থ (কবিতা)—মোহিতলাল মজুমদার। ২. কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (প্রবন্ধ)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৩. কবির স্মৃতি (প্রবন্ধ : সত্যেন্দ্র

স্মৃতিতর্পণ)—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ৪, ব্রজগাথা (কবিতা)—সুরেশচন্দ্র ঘটক। ৫. শরৎচন্দ্র (জীবনী)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৬. বেনামী বন্দর (কবিতা)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৭. সাহিত্যে সমস্যা (প্রবন্ধ)—কাজী আবদুল ওদুদ। ৮. চিত্তরঞ্জন দাশ (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৯. আশার ফাঁদ (গল্প)—গিরিজাকুমার বসু। ১০ মেশিনের পাশে (গল্প) —তারানাথ রায়। ১১. পাষাণবীণা (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১২. মুক্তি (গল্প)—হিমাংশুপ্রভা শিকদার। ১৩. জঁা ক্রিসতফ্ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রম্যাঁ রলাঁ [অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও গোকুলচন্দ্র নাগ] ১৪. চড়কডাঙ্গার মোড় (গল্প)—চারুচন্দ্র ঘোষ। ১৫. স্মৃতির আলো (উপন্যাস)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৬. ডাকঘর (পুস্তক পরিচয়) —সম্পাদক।

চ. **আশ্বিন : ৬ষ্ঠ সংখ্যা : ১৩৩২**

১. শেফালি (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. দেউড়ীর দারোয়ান (গল্প)—নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩. শেষের দিক (গল্প)—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। ৪. ব্যথার প্রদীপ (গল্প)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৫. দীর্ঘসূত্রতার পরিণাম (গল্প)—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ৬ স্বপ্ন-শেষ (গল্প)—যুবনাশ্ব। ৭. খাসিয়াদের শারদোৎসব (অনুবাদ : গীতি)—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৮. মোট বারো (গল্প) প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৯. সাদা কালো (গল্প)—জলধর সেন। ১০ জৈতার আত্মত্যাগ (ময়মনসিংহ গাথা)—ভূপেন্দ্রকুমার অধিকারী। ১১. ডাকঘর (কল্লোল প্রসঙ্গ)—সম্পাদক।

ছ. **কার্তিক : ৭ম সংখ্যা : ১৩৩২**

১. ঝটিকা (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ২. ঋণ শোধ (গল্প)—সুকুমার ভাদুড়ী। ৩. বিদ্রোহী (কবিতা)—বিভাবতী দেবী। ৪. শরৎচন্দ্র (জীবনী)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৫. আশাতীত (কবিতা)—সুশীলাসুন্দরী দেবী। ৬ স্রষ্টা (গল্প)—যুবনাশ্ব। ৭. মনে মনে (কবিতা) —রাধাচরণ চক্রবর্তী। ৮. মুর্শীদ্যা গান (প্রবন্ধ)—জসীম উদ্দীন। ৯. গোকুলচন্দ্র নাগের মৃত্যুসংবাদ—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১০. প্রশ্ন (কবিতা) —বিজয়চন্দ্র মজুমদার। ১১. ঝরাফুল (গল্প)—নীলিমা বসু। ১২. স্মৃতির আলো (উপন্যাস)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩. জঁা ক্রিস্তফ্ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রম্যাঁ রলাঁ [অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও গোকুলচন্দ্র

নাগ] ১৪. হিসাবের বাহিরে (গল্প)—ভূপতি চৌধুরী। ১৫. ঘাসফুল (গল্প)—রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

জ. অগ্রহায়ণ : ৮ম সংখ্যা : ১৩৩২

১. গোকুলচন্দ্র নাগ (প্রবন্ধ : স্মৃতিতর্পণ)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ২. ঝরবে না আঁখিজল (কবিতা : গোকুলস্মৃতি)—বুদ্ধদেব বসু। ৩. যৌবনপথিক (কবিতা : গোকুলস্মৃতি)—জগৎবন্ধু মিত্র। ৪. প্রেতপুরী (কবিতা)—মোহিতলাল মজুমদার [মার্কিন-কবি G. S. Viereck-এর অনুভাবে] ৫. ঝরা-ফুল (গল্প)—নীলিমা বসু। ৬. জংলা (গল্প)—সুধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। ৭. স্মৃতির আলো (উপন্যাস)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৮. নিকষ কালো আকাশ তলে (কবিতা)—অজিতকুমার দত্ত। ৯. জাঁ ক্রিস্তফ্ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রমঁ্যা রলাঁ [অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও গোকুলচন্দ্র নাগ] ১০. শরৎচন্দ্র (জীবনী)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১১. দুর্যোগ (গল্প)—যুবনাশ্ব। ১২. মুর্শীদ্যা গান (প্রবন্ধ)—জসীম উদ্দীন। ১৩. গোকুল নাগ (কবিতা : স্মৃতিতর্পণ)—নজরুল ইস্‌লাম। ১৪. ডাকঘর (গোকুল প্রসঙ্গ ও পুস্তক পরিচয়)—সম্পাদক। ১৫. পুরোহিত (গল্প)—কিরীট ঘোষ।

ঝ. পৌষ : ৯ম সংখ্যা : ১৩৩২

১. রলাঁ ও তরুণ বাংলা (প্রবন্ধ)—কালিদাস নাগ। ২. রমঁ্যা রলাঁ (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৩. সে কবে আমার মনে (কবিতা) —প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৪. কপালের লিখন (গল্প)—সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ৫. যৌবন-চাঞ্চল্য (কবিতা)—যতীন্দ্রমোহন বাগচী। ৬. তারপর (কবিতা) —নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত। ৭. স্মৃতির আলো (উপন্যাস)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৮. একটা ফিরিস্তি (গল্প)—ভূপতি চৌধুরী। ৯. জাঁ ক্রিস্তফ্ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রমঁ্যা রলাঁ [অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও গোকুলচন্দ্র নাগ]। ১০. মুর্শীদ্যা গান (প্রবন্ধ)—জসীম উদ্দীন। ১১. সন্ধ্যারাগ (গল্প) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ১২. শরৎচন্দ্র (জীবনী) —সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩. ডাকঘর (রলাঁ-প্রসঙ্গ)—সম্পাদক। ১৪. পোষাকের দাম (গল্প)—বিজয় সেনগুপ্ত [হাঙ্গেরীয় লেখক Koloman Mikszath হইতে]।

ঞ. মাঘ : ১০ম সংখ্যা : ১৩৩২

১. দেবী হয়ে ছিনু বটে (কবিতা)—প্রিয়ংবদা দেবী। ২. এক টুকরো

(গল্প)—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। ৩. আশ্রয় (গল্প)—প্রভাবতী দেবীসরস্বতী। ৪. আর একটা পথ (গল্প)—নরেন্দ্র দেব। ৫. ওরা ভয় পায় (কবিতা)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৬. শরৎচন্দ্র (জীবনী)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৭. পল্লী-ব্যথা (কবিতা)—গোপাললাল দে। ৮. স্মৃতির আলো (উপন্যাস)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৯. জাসিন্তো বেনাভান্তে (প্রবন্ধ)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১০. না (গল্প)—হিমাংশুপ্রভা শিকদার। ১১. মুর্শীদ্যা গান (প্রবন্ধ)—জসীম উদ্দীন। উৎসর্গ (গল্প)—প্রীতি সেন। ১৩. জাঁ ক্রিস্তফ্ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রমাঁ্যা রলাঁ। [অনুবাদ: কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী]। ১৪. মানসী (কবিতা) —হুমায়ুন কবীর। ১৫. ডাকঘর (বেনাভান্তে ও জগদিন্দ্রনাথ রায় প্রসঙ্গ ও পুস্তক পরিচয়)—সম্পাদক। ১৬. গোকুলচন্দ্র নাগ স্মরণে (কবিতা) —জিতেন বক্সী।

ট. ফাল্গুন : ১১শ সংখ্যা : ১৩৩২

১. এস (কবিতা)—বিভাবতী দেবী। ২. রাত্রির অভিযান (গল্প)—নির্মলকুমার রায়। ৩. কোনো এক স্বপ্নে ঢাকা মায়াময় দেশে (কবিতা) —অজিতকুমার দত্ত। ৪. শিল্পের স্বরূপ (প্রবন্ধ)—ইন্দুশোভা দেবী। ৫. বাসর-রাত্রি (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৬. চোর (গল্প) —দীনেশচন্দ্র লোধ। ৭. অন্ধ কবি (কবিতা)—বুদ্ধদেব বসু [আরব কবি Kahlil Gibran-এর কবিতা "The Blind Poet"-এর অনুবাদ।] ৮. শরৎচন্দ্র (জীবনী)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৯. শীতের দুপুরে (কবিতা)—শৈলেন্দ্রনাথ রায়। ১০. উৎসব রাতে (গল্প)—অচ্যুত চট্টোপাধ্যায় [ইটালিয়ান লেখক Masuccio of Salerno-এর "Friends in Love"—অবলম্বনে।] ১১. নীলিমা (কবিতা)—জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। ১২. ক্ষণিকা (প্রবন্ধ)—ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। ১৩. স্মৃতির আলো (উপন্যাস)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৪. দ্বিজেন্দ্র-প্রয়াণ (কবিতা) —গোপাললাল দে। ১৫. জাঁ ক্রিস্তফ্ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রমাঁ্যা রলাঁ [অনুবাদ: কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী।] ১৬. ডাকঘর (কল্লোল ও বিজলী প্রসঙ্গ)—সম্পাদক। ১৭. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্রবন্ধ-স্মৃতিতর্পণ) —নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

ঠ. চৈত্র : ১২শ সংখ্যা : ১৩৩২

১. মরুভূমি (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ২. বিজলী (গল্প)—

বিমলা দেবী। ৩. আখেরী (কবিতা)—নির্মলকুমার ঘোষ। ৪. সুকুমার ভাদুড়ী (প্রবন্ধ : স্মৃতিতর্পণ)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ৫. পড়ে থাকা (কবিতা) —প্রিয়ম্বদা দেবী। ৬. চিঠি (গল্প)—হরিপদ গুহ। ৭. আবোল তাবোল (প্রবন্ধ)—যুবনাশ্ব। ৮. কবি সুকুমার রায় (প্রবন্ধ)—বুদ্ধদেব বসু। ৯. সঞ্চয় (কবিতা)—হুমায়ুন কবির। ১০. কবি (গল্প)—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় [হল্যাণ্ডের লেখক Louis Couperus-এর গল্প অবলম্বনে]। ১১. যৌবন-প্রভাতে (কবিতা)—জ্যোৎস্নানাথ চন্দ। ১২. স্মৃতির আলো (উপন্যাস)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩. ডাকঘর (কল্লোল-প্রসঙ্গ)—সম্পাদক। ১৪, শরৎচন্দ্র (জীবনী)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৫. জাঁ ক্রিস্‌তফ্‌ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রমঁ্যা রলাঁ। [অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী]।

চতুর্থ বর্ষ : ১৩৩৩

ক. বৈশাখ : ১ম সংখ্যা : ১৩৩৩

২. জীবন-নাট্য (গল্প)—সত্যভূষণ সেন। ৩. ধরণী (কবিতা)—অজিতকুমার দত্ত। ৪. স্মৃতি-চিহ্ন (গল্প)—বিমল দত্ত। ৫. ঝড়ের রাত্রি (গল্প)—মায়া বসু। ৬. বেদূঈন (কবিতা)—জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। ৭. পদ্মের পঙ্ক (গল্প)—দেবেন্দ্রনাথ মিত্র। ৭. শরৎচন্দ্র (জীবনী)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৮. দরিয়া (গল্প)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৯. মানবতা (বিদেশী ছায়া-গল্প)—শামসুন্ নাহার। ১০. স্মৃতির আলো (উপন্যাস)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১১. কল্লোল (কবিতা)—সুনীতি দেবী। ১২. জাঁ ক্রিস্‌তফ্‌ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রমঁ্যা রলাঁ [অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী]। ১৩. রুষসাহিত্য ও তরুণ বাঙালী—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৪. ডাকঘর (রবীন্দ্রনাথ, কল্লোল প্রসঙ্গ)—সম্পাদক।

খ. জ্যৈষ্ঠ : ২য় সংখ্যা : ১৩৩৩

১. কবির কামনা (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ (সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ দিলীপকুমার রায়কে লিখিত পত্রসংকলন)। ৩. রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র (বিজলী সাপ্তাহিক থেকে)—সত্যেন্দ্রপ্রসাদ

বসু। ৪. সুকুমার (সুকুমার ভাদুড়ী স্মরণে কবিতা)—প্রিয়ম্বদা দেবী। ৫. মানব (কবিতা)—অজিতকুমার দত্ত। ৬. মানহানির মোকদ্দমা (গল্প)—জগৎবন্ধু মিত্র। ৭. কাক-কোকিল-কথা (কথিকা)—যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য। ৮. রজনী হ'ল উতলা (গল্প)—বুদ্ধদেব বসু। ৯. রূপছায়া (উপন্যাস)—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। ১০. প্রবঞ্চিত (কবিতা) —সুনীলাসুন্দরী দেবী। ১১. জাঁ ক্রিস্তফ্ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রম্যাঁ রলাঁ। [অনুবাদ : কলিদাস নাগ ও শান্তা দেবী]। ১২. আধারের যাত্রী (কবিতা)—জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। ১৩. ডাকঘর (কল্লোল প্রসঙ্গ)— সম্পাদক। ১৪. সেতুবন্ধ (গল্প)—উমা মিত্র।

গ. আষাঢ় : ৩য় সংখ্যা : ১৩৩৩

১. মোর আঁখিজল (কবিতা)—জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। ২. পাথেয় (গল্প) —বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩. গাব আজ আনন্দের গান (কবিতা)— অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৪. ঘেন্নার কথা (গল্প)—জগদীশচন্দ্র গুপ্ত। ৫. রৌদ্র (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগ্‌চী। ৬. স্মৃতির আলো (উপন্যাস) —সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৭. লিপি (কবিতা)—অজিতকুমার দত্ত। ৮. জাঁ ক্রিস্তফ্ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রমঁ্যা রলাঁ [অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী]। ৯. এক টুকরো রুটী (গাথা)—কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়। ১০. নারী (কথিকা)—রাধারাণী দত্ত। ১১. সদর ও অন্দর (কথিকা)—কিরীট ঘোষ। ১২. কবি ওমর খৈয়াম (প্রবন্ধ)— [নাম নেই]। ১৩. ডাকঘর (কল্লোল প্রসঙ্গ)—সম্পাদক। ১৪. রূপ ও আঁখি (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ১৫. হরিসাধন চট্টোপাধ্যায় (জীবনী)—অবনীনাথ রায়।

ঘ. শ্রাবণ : ৪র্থ সংখ্যা : ১৩৩৩

১. স্বপ্নকথা (কথিকা)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ২. জীবনের জয়-যাত্রা (কবিতা)—কালীকিঙ্কর ভট্টাচার্য। ৩. ছিন্নমুকুল (গল্প)—প্রবোধকুমার সান্যাল। ৪. চলার ভাষা (কবিতা)—মোসাম্মৎ সফিয়া খাতুন। ৫. পটলডাঙার পাঁচালী (নাটিকা)—যুবনাশ্ব। ৬. কোন লোভ রাখি না ক' স্মৃতির উপরে (কবিতা)—প্রিয়ম্বদা দেবী। ৭. অগ্নি শুদ্ধি (গল্প)— সুধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। ৮. কল্পনা (গল্প)—অদিতি দেবী। ৯. নাবিক (কবিতা)—জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। ১০, জাঁ ক্রিস্ত্‌ফ্ (অনুবাদ-উপন্যাস) —রমঁ্যা রলাঁ [অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী]। ১১. রবীন্দ্র

নাথের ছোট গল্প (প্রবন্ধ)—শান্তা দেবী। ১২. রবীন্দ্রনাথ ও মাসিক পত্র (প্রবন্ধ)—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ১৩. রূপছায়া (উপন্যাস)—সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়। ১৪. যে যায় কাজে (গল্প)—জগদীশচন্দ্র গুপ্ত। ১৫. বনস্পতির মৃত্যু (গল্প / ভূমিকাসহ)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। (ব্লাডিশ্লাস্ রেমন্ট থেকে) ১৬. পুরাতনী (ঈশ্বর গুপ্তের প্রবোধ প্রভাকর গ্রন্থের ভূমিকাংশ)—সঙ্কলক : নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। ১৭. ডাকঘর (কল্লোলপ্রসঙ্গ)—সম্পাদক।

ঙ. ভাদ্র : ৫ম সংখ্যা : ১৩৩৩

১. অন্ধকার (কবিতা)—অজিতকুমার দত্ত। ২. গানের খাতা (গল্প)—অখিল নিয়োগী। ৩. জজের রায় (গল্প)—শশিভূষণ পাল। ৪. রাজ শক্তি (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগচী। ৫. পিয়াসী (কথিকা)—সৌরীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়। ৬. চরম গোধূলি (কবিতা)—নির্মলকুমার ঘোষ। ৭. অকাজের বাঁশী (তত্ত্বনাটিকা)—হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়। ৮. অধিকার (কবিতা)—সুশীলাসুন্দরী দেবী। ৯. বর্তমান গল্পসাহিত্যে তিনখানি ভাল বই—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : (ক) ঐন্দ্রজালিক : সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। (খ) গড্ডলিকা : পরশুরাম। (গ) অতসী : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১০. জাঁ ক্রিস্তফ্ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রমাঁ্যা রলাঁ। [অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী] ১১. বড় ছোট (কবিতা)—শৈলেশরঞ্জন ঘোষ। ১২ রূপছায়া (উপন্যাস)—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। ১৩. প্রেম (কবিতা)—ভক্তিসুধা হার। ১৪ স্মৃতির আলো (উপন্যাস)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৫. নোগুচি (আলোচনা)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৬. ডাকঘর (কল্লোলপ্রসঙ্গ)—সম্পাদক।

চ. আশ্বিন : ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৩৩৩

১. রাখালী (কবিতা)—জসীম উদ্দীন। ২. কবির বিয়ে (কথিকা)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৩. রক্তসাঁঝে সোনার ফসল এল চাষীর ঘরে (কবিতা)—সুরেশ বিশ্বাস। ৪. মানবলতিকা (গল্প)—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। ৫. কল্যাণী (গল্প)—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। ৬. উজোর ঘরের কান্না (খাসিয়াদের গাথা)—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৭. বেদে (আহ্লাদি) [গল্প]—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৮. যুগল সাহিত্যিক (গল্প)—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। ৯. সমালোচনা (প্রবন্ধ)—প্রমথ চৌধুরী। ১০. ধান্যমঞ্জরী

(কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগচী। ১১. আলো-ছায়া (গল্প)—সুরমা দেবী। ১২. ডাকঘর (কল্লোলপ্রসঙ্গ)—সম্পাদক।

ছ. কার্ত্তিক : ৭ম সংখ্যা ১৩৩৩

১. শাপভ্রষ্ট (কবিতা)—বুদ্ধদেব বসু। ২. আলেয়া (গল্প)—প্রবোধ কুমার সান্যাল। ৩. কাণ্ডারী (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ৪. মাধবীর পত্র (গল্প)—সরোজকুমারী দেবী। ৫. কোহিনূর (কবিতা)—জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। ৬. গান ও স্বরলিপি—কথা, সুর ও স্বরলিপি, দিলীপ কুমার রায়। ৭. গান ও সুর (চিঠি)—দিলীপকুমার রায়। ৮. গোত্রহীনের মা (গল্প)—হেমেন্দ্রলাল রায়। ৯. ঝড় (কবিতা)—রাধাচরণ চক্রবর্তী। ১০. জরশনির গ্রহশুদ্ধি (গল্প)—জগদীশচন্দ্র গুপ্ত। ১১. মাঠের হরফ (কবিতা)—সৈয়দউদ্দীন। ১২. পণ-ভঙ্গ (গল্প)—সুনীতি দেবী। ১৩. নেশার জের (গল্প)—নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ১৪. শারদ সঙ্গীত (কবিতা)—গোপাললাল দে। ১৫. রাতের তারা (গল্প)—পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ১৬. ব্যথার পূজা (কবিতা)—যতীন্দ্রমোহন বাগচী। ১৭. তোমার কথাটি (কবিতা)—প্রিয়ম্বদা দেবী। ১৮. ডাকঘর (নানা প্রসঙ্গ—বাঙ্গালা গল্পের স্থান)—সম্পাদক এবং পঞ্চানন মজুমদার।

জ. অগ্রহায়ণ : ৮ম সংখ্যা : ১৩৩৩

১. দারিদ্র্য (কবিতা)—নজ্‌রুল ইসলাম। ২. অবগুণ্ঠিতা (গল্প)—ভূপতি চৌধুরী। ৩. তোমরা চলিয়া গেছ (কবিতা)—প্রিয়ম্বদা দেবী। ৪. শিবানী (গল্প)—ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৫. অগ্নি (অনুবাদ-কবিতা)—তারাকুমার চট্টোপাধ্যায়। (মূল : হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়)। ৬. পতি (গল্প)—অমলেন্দু বসু। ৭. মৃত্যু-দূত (কবিতা)—ক্ষিতীন্দ্র মোহন সাহা। ৮. ক্ষিদের খোরাক—জগদীশ গুপ্ত। ৯. শুভদিন (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগচী। ১০. আমিনা (গল্প)—পঞ্চানন মজুমদার ১১. পুরাতনী (প্রবন্ধ)—নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। ১২. বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান মহিলা (প্রবন্ধ)—মোহাম্মদ আবদুল হাকীম বিক্রমপুরী। ১৩. পরী-স্থান (কবিতা)—গোপাললাল দে। ১৪. বেদে (উপন্যাস। আস্‌মানী)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ১৫. ব্যবধান (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগচী। ১৬. স্মৃতির আলো (উপন্যাস)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৭. জাঁ (ক্রিস্তফ্‌ (অনুবাদ উপন্যাস)—রম্যাঁ রলাঁ। [অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও —রমা দেবী] ১৮. ডাকঘর (সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ)—সম্পাদক।

ঋ. পৌষ : ৯ম সংখ্যা : ১৩৩৩

১. আদি যুগ আন ফিরাইয়া (কবিতা)—সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু। ২. মা-হারা (গল্প)—নিরুপমা দেবী। ৩. সর্বনাশের সুখ (গল্প)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৪. ছবি দেখা (গল্প)—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। ৫. শ্মশান (কবিতা)—জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। ৬. প্রভুপাদ (গল্প)—সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ৭. রাত্রি (কবিতা)—হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। [মূল ইংরেজী থেকে অনুবাদ : তারাকুমার মুখোপাধ্যায়] ৮. তান্ত্রিকের গান (কবিতা)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। ৯. বেদে (উপন্যাস। বাতাসী)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ১০. স্বর্ণ-তোরণ (কবিতা)—সরোজিনী নাইডু। [মূল ইংরেজী থেকে অনুবাদ : প্রভাতকুমার শর্মা] ১১. গ্রাম্যসঙ্গীত (কবিতা)—ঐ। ১২. ধানকাটার স্তোত্র (কবিতা)—ঐ। ১৩. রবীন্দ্রনাথের ভাবরহস্য (প্রবন্ধ। পূরবীর ভূমিকা)—নীহাররঞ্জন রায়। ১৪. গৈবী (কবিতা। কবীর)—রাধাচরণ চক্রবর্তী। ১৫. নিখিল স্রোত (গল্প)—অনুপম গুপ্ত। [দীনেশরঞ্জন দাশ] ১৬. রম্যাঁ রলাঁ ও হিন্দুদর্শন (প্রবন্ধ)—নাম নেই। ১৭. পুরাতনী (প্রবন্ধ। বড়দিন প্রসঙ্গ)—নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। ১৮. জাঁ ক্রিস্‌তফ্‌ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রম্যাঁ রলাঁ [অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী] ১৯. স্মৃতির আলো (উপন্যাস)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ২০. পুস্তক ও পত্রিকা (পরিচয় লিপি)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় [?] ২১. ডাকঘর (সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ)—সম্পাদক।

এ. মাঘ : ১০ম : ১৩৩৩

১. মহাক্ষুধা (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগচী। ২. মুস্কিল-আসান (গল্প)—সুধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। ৩. বংশী-হারা (কবিতা)—জসীমউদ্দিন। ৪. উৎসব রজনী (গল্প) —বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫. পলাতক (গল্প)—দীনেশ চন্দ্র লোধ। ৬. গজন গান (ভৈরবী-পোস্তা)—নজরুল ইস্‌লাম। ৭. গজল গীতি (গান)—ঐ। টল্‌স্টয়ের স্মৃতি (অনুবাদ-প্রবন্ধ)—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। [মূল : গর্কি] ৯. গান—কল্যাণী ঘোষ। ১০. মৃত্যুর অমৃত (গল্প)—পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ১১. ওরে সোনার পাখী—(কবিতা)—সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। ১২. অভিভাষণ (বক্তৃতা)—জগদীশচন্দ্র বসু। ১৩. ভাল লেগেছিল মোর (কবিতা)—জিতেন্দ্রনাথ বক্সী। ১৪. মহিলা প্রগতি (সংবাদ)—নাম নেই। ১৫. রবীন্দ্রনাথ

(কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ১৬. সভাপতির অভিভাষণ (বক্তৃতা)—প্রমথ চৌধুরী। ১৭. জ'া ক্রিস্তফ্ (অনুবাদ উপন্যাস)—রম্যাঁ রলাঁ। [অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী] ১৮. অশ্রুজল (কবিতা)—সুনির্মল বসু (বায়রণ অবলম্বনে)। ১৯. লিওনিদ্ আন্দ্রিভ্ (প্রবন্ধ)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ২০. পরীক্ষা (কবিতা। সংস্কৃত থেকে)—সারদাচরণ রায়। ২১. ডাকঘর (সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ)—সম্পাদক।

ট. ফাল্গুন : ১১শ সংখ্যা : ১৩৩৩

১. বন্দীর বন্দনা (কবিতা)—বুদ্ধদেব বসু। ২. কবিত্বহীন গল্প (গল্প)—গোকুলচন্দ্র নাগ। ৩. সমাজদ্রোহী (গল্প)—প্রভাবতী দেবীসরস্বতী। ৪. বেদে (উপন্যাস। মুক্তা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৫. অজগর-মণি (একাঙ্ক নাটক)—মন্মথ রায়। ৬. শাক-তুলুনী (কবিতা)—জসীম উদ্দীন। ৭. দুঃখবাদী (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ৮. সভাপতির অভিভাষণ (বক্তৃতা)—প্রমথ চৌধুরী। ৯. রুদ্রলীলা (কবিতা)—অজিত-কুমার দত্ত। ১০. ওমর-গুরু আবু আলি সিনা (প্রবন্ধ)—সুরেশচন্দ্র নন্দী। ১১. গজল গান (সঙ্গীত)—নজরুল ইস্‌লাম। ১২. বীরবল (প্রবন্ধ। প্রমথ চৌধুরী প্রসঙ্গ)—অতুলচন্দ্র গুপ্ত। ১৩. মনের পাগল (কবিতা)—রাধাচরণ চক্রবর্তী। ১৪. স্মৃতির-আলো (উপন্যাস)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৫. গতি (কবিতা)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার। ১৬. কেশবচন্দ্র (প্রবন্ধ)—সত্যানন্দ রায়। ১৭. জ'া ক্রিস্তফ্ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রম্যাঁ রলাঁ [অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী]।

ঠ. চৈত্র : ১২শ সংখ্যা : ১৩৩৩

১. গজল-গান (সঙ্গীত)—নজরুল ইস্‌লাম। ২. পোষ্টাপিস (গল্প)—পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ৩. থাথ্ (গল্প)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৪. ব্যথার তৃপ্তি (গল্প)—নৃসিংহদাসী দেবী। ৫. চালমাৎ (গল্প)—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। ৬. ব্রাহ্মণ (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগচী। ৭. সুবলবেশে রাইমিলন (গাথা)—চন্দ্রকুমার দে [প্রাচীন কীর্ত্তন অবলম্বনে]। ৮. যৌবন-বিদায় (কবিতা ; পুশ্‌কিন)—অজিতকুমার দত্ত। ৯. দিলীপকুমার (মানপত্র) —শুভানুধ্যায়ীবর্গ। ১০. নিবেদন (বক্তৃতা)—দিলীপকুমার রায়। ১১. বিধি-লিপি (কবিতা সংস্কৃত থেকে)—সারদাচরণ রায়। ১২. দরদী

(গান। কথা ও সুর)—নজরুল ইস্‌লাম [স্বরলিপি : দিলীপকুমার রায়]। ১৩. দক্ষিণা (কবিতা)—জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। ১৪. বিনোদিনীর ব্রজ (গল্প)—জগদীশচন্দ্র গুপ্ত। ১৫. লীলা-অভিলাষ (কবিতা)—আব্দুল কাদের। ১৬. চড়ক-সংক্রান্তি (প্রবন্ধ)—'সাধনা' থেকে পুনর্মুদ্রিত। ১৭. জাঁ ক্রিস্‌তফ্‌ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রম্যাঁ রলাঁ [অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী]। ১৮. পুস্তক ও পত্রিকা (পরিচয়লিপি)—কনক রায়। ১৯. বর্ষশেষে নিবেদন (সম্পাদকীয়)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ২০. কবির আত্ম-সমর্পণ (কবিতা)—অজিতকুমার দত্ত।

পঞ্চম বর্ষ : ১৩৩৪

ক. বৈশাখ : ১ম সংখ্যা : ১৩৩৪

১. স্বাক্ষর (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. বাণ (গল্প)—প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। ৩. শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে প্রেম (প্রবন্ধ)—জগৎবন্ধু মিত্র। ৪. কুমারী হুদিয়ের "স্বামী" (অনুবাদ ; গল্প)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর [মূল : Mercel Prevost]। ৫. নববর্ষের গান (কবিতা)—গোপাললাল দে। ৬. যাদুঘর (উপন্যাস)—নরেন্দ্র দেব। ৭. নব-পন্থা (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ৮. মীনকেতন (অনুবাদ উপন্যাস) —অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত [মূল : ন্যুট্ হাম্‌সুন্] ৯. সহজ (সঙ্গীত)—নিরুপমা দেবী। ১০. এম্-এ আর্টিষ্টের প্রশ্নমালা (প্রবন্ধ)—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১১. দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর (কবিতা)—নজরুল ইস্‌লাম। ১২. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৩. অমারে ভুলিও ভাই (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ১৪. বীরবল (প্রবন্ধ ; ঐতিহাসিক) —প্রমথ চৌধুরী। ১৫. কল্লোল (প্রবন্ধ)—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। ১৬. আমি-হারা (কবিতা)—যতীন্দ্রমোহন বাগচী। ১৭. পুরাতনী (সম্বাদ সংগ্রহ)—'প্রচার' পত্রিকা থেকে। ১৮. আগামী কাল (গল্প)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১৯. নীলিমা বসু (স্মৃতিতর্পণ)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ২০. ডাকঘর (কল্লোল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ)—সম্পাদক। ২১. সহজ (গান। কথা)—নিরুপমা দেবী [সুর ও স্বরলিপি : দিলীপকুমার রায়]।

খ. জ্যৈষ্ঠ : ২য় সংখ্যা : ১৩৩৪

১. অ-ধরা (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগচী। ২. লক্ষীছাড়া (গল্প)—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩. সত্যব্রত (গল্প)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ৪. গজল গান (গান)—নজরুল ইস্‌লাম। ৫. অভিমান (গল্প)—বিমলাচরণ বিদ্যারত্ন। ৬. ধর্মঘট (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৭. আমরা ও তাঁহারা (প্রবন্ধ)—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ৮. মাতাল (কবিতা)—রাধাচরণ চক্রবর্তী। ৯. যাদুঘর (উপন্যাস)—নরেন্দ্র দেব। ১০. কবেকার কথা (কবিতা)—প্রিয়ম্বদা দেবী। ১১. জন্মান্তর (গল্প)—পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ১২. সিন্ধু (কবিতা)—জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। ১৩. অলকা (গল্প)—ভূপতি চৌধুরী। ১৪. লেখা (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৫. বুলবুলি (গজলগান। কথা ও সুর)—নজরুল ইস্‌লাম [স্বরলিপি—দিলীপকুমার রায়]। ১৬. পুরাতনী (রবীন্দ্রনাথ লিখিত 'মীমাংসা')—'সাধনা' থেকে পুনর্মুদ্রিত। ১৭. সমালোচক (প্রবন্ধ)—অতুলচন্দ্র গুপ্ত ['কালি-কলম' থেকে পুনর্মুদ্রিত] ১৮. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৯. বৃদ্ধ পরীক্ষক (অনুবাদ-কবিতা)—বুদ্ধদেব বসু [মূল : জাপানী কবি—আজুমি রিয়োসাই] ২০. মীনকেতন (অনুবাদ-উপন্যাস)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত [মূল : ন্যুট্ হামসুন]। ২১. কবি ফেরদৌসী (কবি-কাহিনী)—দীনেশরঞ্জন দাশ (?) ২২. জাঁ ক্রিস্তফ্ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রমঁ্যা রলাঁ [অনুবাদ—কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী]

গ. আষাঢ় : ৩য় সংখ্যা : ১৩৩৪

১. আজি হ'তে শতবর্ষ আগে (কবিতা)—নজরুল ইস্‌লাম। ২. মৃগতৃষ্ণিকা (গল্প)—দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩. মাধুকরী (কবিতা)—অজিতকুমার দত্ত। ৪. বেদে (উপন্যাস। বন-জ্যোৎস্না)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৫. ওগো বিদ্যুল্লতা (কবিতা)—বুদ্ধদেব বসু। ৬. প্রভাকর (গল্প)——জগদীশ গুপ্ত। ৭. দুঃখবিবাদী (কবিতা)—ধনঞ্জয় শর্মা। ৮. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ৯. অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্য (প্রবন্ধ)—অমলেন্দু বসু। ১০. মীনকেতন (অনুবাদ-উপন্যাস)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত [মূল : ন্যুট্ হামসুন] ১১. বাংলার মেয়ে (কবিতা)—সুনীতি দেবী। ১২. লেখা (প্রবন্ধ)—প্রমথ চৌধুরী। ১৩. আগামী কাল

(গল্প)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১৪. সেকালে (কবিতা)—হেমেন্দ্রকুমার রায়। ১৫. জাঁ ক্রিস্তফ্ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রমাঁ্যা রলাঁ। [অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী] ১৬. ডোরা (অনুবাদ-গল্প)—মূল: ম্যাক্সিম গর্কি (অনুবাদকের নাম নেই) ১৭. যাদুঘর (উপন্যাস)—নরেন্দ্র দেব। ১৮. ডাকঘর (সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ)—সম্পাদক।

ঘ. শ্রাবণ : ৪র্থ সংখ্যা : ১৩৩৪

১. সকলি যে তুলিয়াছি (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ২. মরুকুঞ্জ (গল্প)—সুরমা দেবী। ৩. দশবৎসর পরে (গল্প)—হেমেন্দ্রকুমার রায়। ৪. লক্ষ্মী-প্রতিষ্ঠা (গল্প)—হরিপদ গুহ। ৫. আব্দার (কবিতা)—হেমেন্দ্রলাল রায়। ৬. চলে নাগরী কাঁখে গাগরী (গল্প)—সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। ৭. কথা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)—ভবানী ভট্টাচার্য। ৮. প্রাপ্তি-স্বীকার (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ৯. দীপক (উপন্যাস) দীনেশরঞ্জন দাশ। ১০. সঞ্চয় (কবিতা)—হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়। ১১. ভ্রাম্যমানের জল্পনা (ভ্রমণ কাহিনী)—দিলীপকুমার রায়। ১২. মৈত্রেয়ী (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগ্চী। ১৩. মীনকেতন (অনুবাদ-উপন্যাস)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত [মূল : ন্যুট্ হামসুন]। ১৪. প্রবাহ ('গান'—রবীন্দ্রনাথ এবং 'সাহিত্য ও আধুনিক বঙ্গ সাহিত্য'—গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়)—যথাক্রমে 'উত্তরা' ও 'বঙ্গবাণী' থেকে পুনর্মুদ্রিত। ১৫. নারী-আঁখি (কবিতা)—চামেলীপ্রভা ঘোষ। ১৬ যাদুঘর (উপন্যাস) —নরেন্দ্র দেব। ১৭. জমিদার (কবিতা)—কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়। ১৮. প্রার্থনা (কবিতা)—কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়। ১৯. জাঁ ক্রিস্তফ্ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রমাঁ্যা রলাঁ [অনুবাদ-কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী]। ২০. আগামী কাল (গল্প)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ২১. ডাকঘর (কল্লোল ও সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ)—সম্পাদক। ২২. গ্যাব্রিয়েল ড'আনুন্‌ৎসিয়ো (প্রবন্ধ)—গিরিজা মুখোপাধ্যায়।

ঙ. ভাদ্র : ৫ম সংখ্যা : ১৩৩৪

১. গজল (গান)—নজরুল ইসলাম। ২. কলের নৌকা (গল্প)—অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ। ৩. অন্ধের দৃষ্টি (কবিতা)—রাধাচরণ চক্রবর্তী। ৪. আকাশ পাতাল (গল্প)—পরিমল গোস্বামী। ৫. বেলা শেষের আলো (গল্প)—পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ৬. রুদ্ধঘর (কবিতা)—অজিতকুমার দত্ত। ৭. মীনকেতন (অনুবাদ-উপন্যাস)—অচিন্ত্যকুমার

সেনগুপ্ত [মূল : ন্যুট্‌ হামসুন]। ৮. এস (কবিতা)—বিমলা দেবী। ৯. পল্লী-গীতি (ভাটিয়াল সুর)—চিত্তরঞ্জন আচার্য। ১০. যাদুঘর (উপন্যাস) —নরেন্দ্র দেব। ১১. বেদে (উপন্যাস। মৈত্রেয়ী)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ১২. কবির কাব্য (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ১৩. দীপক (উপন্যাস) —দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৪. এইচ্‌ জি, ওয়েল্‌স্‌ (প্রবন্ধ)—হুমায়ুন কবির। ১৫. হরিসাধন চট্টোপাধ্যায় (প্রবন্ধ। স্মৃতিতর্পণ)—অবনীনাথ রায়। ১৬. প্রবাহ (পারস্য-কবি মুয়িজ্জী ও আনোয়ারী মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ)— 'সওগাত' থেকে পুনর্মুদ্রিত। ১৭. অসংলগ্ন (প্রবন্ধ)—কৃত্তিবাস ভদ্র [প্রেমেন্দ্র মিত্র]। ১৮. ডাকঘর (এইচ্‌ জি, ওয়েল্‌স্‌ ও সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৯. ছোটগল্পের কথা (প্রবন্ধ)—বুদ্ধদেব বসু। ২০. পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়লিপি—সম্পাদক।

চ. আশ্বিন : ৬ষ্ঠ সংখ্যা : ১৩৩৪

১. চরকা (একাঙ্ক নাটক)—মন্মথ রায়। ২. ব্যথিত (কবিতা)—বুদ্ধদেব বসু। ৩. স্বপ্নের বিড়ম্বনা (গল্প)—জগৎবন্ধু মিত্র। ৪. চিঠি (গল্প) —উমা দেবী। ৫. সন্ন্যাসী (গল্প)—তারানাথ রায়। ৬. বিধাতার মত ভাই (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৭. জুনাবালী (বিয়ের গান ও কথা)—জসীম উদ্দীন। ৮. ভোরের আলোকে এই বন্দরখানি (কবিতা)—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৯. যাদুঘর (উপন্যাস)—নরেন্দ্র দেব। ১০. অভিসার (কবিতা)—রাধাচরণ চক্রবর্তী। ১১. সমালোচনার কথা (প্রবন্ধ)—মহেন্দ্রচন্দ্র রায়। ১২. দেবতা কোথায় ? (কবিতা)— চামেলীপ্রভা দেবী। ১৩. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৪. ছবি ও মায়া (কবিতা)—ক্ষিতিরঞ্জন মজুমদার। ১৫. মীনকেতন (অনুবাদ-উপন্যাস)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত [মূল : ন্যুট্‌ হামসুন]। ১৬. ভ্রাম্যমানের জল্পনার উত্তর (প্রবন্ধ)—বঙ্গনারী [প্রকৃত নাম : অনিন্দিতা দেবী]। ১৭. ডাকঘর (সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ)—সম্পাদক।

ছ. কার্তিক : ৭ম সংখ্যা : ১৩৩৪

১. আসার আশায় (গল্প)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ২. অনূঢ়া (গল্প) —নরেন্দ্র দেব। ৩. পাষাণ মানব (গাথা)—চন্দ্রকুমার দে [মৈমনসিংহ গীতিকা কেনারামের পালা অবলম্বনে]। ৪. মন্থন (গল্প)—পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ৫. ঠাট্‌-টা (গল্প)—প্রবোধকুমার সান্যাল। ৬. আরবী গল্প (কাহিনী)—আবুল ফজল। ৭. মা (গল্প)—রাধারাণী দত্ত।

৮. সর্পিল পন্থা (গল্প)—ভূপতি চৌধুরী। ৯. কুড়ের বাথান (গল্প)—স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদার। ১০. স্বপ্ন-ব্যথা (গল্প)—শ্রীঅনিন্দিতা দেবী। ১১. মদন ভস্মের পর (গল্প)—দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ. অগ্রহায়ণ : ৮ম সংখ্যা : ১৩৩৪

১. সব পুড়ে' হল ছাই (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ২. বর্ণ-সমস্যা (গল্প)—অমিয়া চৌধুরী। ৩. অন্তরের অন্ধকারে (গল্প)—ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৪. লতাময়ী উর্বশী (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগচী। ৫. ভ্রাম্যমানের জল্পনা (ভ্রমণ-কাহিনী)—দিলীপকুমার রায়। ৬. জ্যাঁ ক্রিস্তফ (অনুবাদ-উপন্যাস)—রমঁ্যা রলাঁ [অনুবাদ : কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী]। ৭. বৈদিশী বন্ধু (গান)—জসীম উদ্দীন [ঘাটুগানের স্থর, মৈয়মনসিংহের ভাষা]। ৮. অপরাধিণী (গল্প)—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। ৯. মাটির টান (কথিকা)—স্থনীতি দেবী। ১০. দরিদ্রের ভগবান (কবিতা)—গোপাললাল দে। ১১. যাদুঘর (উপন্যাস)—নরেন্দ্র দেব। ১২. সংস্কৃত-সাহিত্যে ; কাব্য-সমালোচনা—মনোমোহন ঘোষ। ১৩. মীনকেতন (অনুবাদ-উপন্যাস)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত [মূল : ন্যুট হামস্থন]। ১৪. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৫. শিল্পী দেবীপ্রসাদ (শিল্পী-পরিচয়)—সম্পাদক প্রভৃতি। ১৬. অসংলগ্ন (কথিকা) —কৃত্তিবাস ভদ্র [প্রেমেন্দ্র মিত্র]। ১৭. ভগবানের রাজ্য (গল্প)—কিরণকুমার রায়। ১৮. অশ্রুজল (কবিতা)—সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। ১৯. পুস্তক ও পত্রিকা (পরিচয়লিপি)—সম্পাদক প্রভৃতি। ২০. ডাকঘর (নানা প্রসঙ্গ ; রবীন্দ্রভক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর স্মৃতি-তর্পণ উল্লেখযোগ্য) —সম্পাদক প্রভৃতি ['প্রভৃতি' কথার উল্লেখ এই প্রথম]। ২১. চণ্ডীদাস (প্রবন্ধ)—স্থরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ২২. দূরের বন্ধু (গান)—আবদুল কাদের।

ঝ. পৌষ : ৯ম সংখ্যা : ১৩৩৪

১. রমা (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগচী। ২. ব্যতিক্রম (গল্প)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৩. মাৎস্থয়্যামার আর্শি (জাপানী গল্প)—চিত্তরঞ্জন আচার্য। ৪. ভ্রাম্যমানের জল্পনা (ভ্রমণকাহিনী)—দিলীপকুমার রায়। ৫. দীওয়ান-ই-হাফিজ (কবিতা)—নজরুল ইসলাম। ৬. প্রাচীন ভারতের নাট্যশিল্প (প্রবন্ধ)—হেমচন্দ্র বাগচী। ৭. দেবযাজী (কবিতা) —হেমেন্দ্রকুমার রায়। ৮. রূপসী (গল্প)—সত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত। ৯. যাদুঘর

(উপন্যাস)—নরেন্দ্র দেব। ১০. আর কিছু নাহি সাধ (কবিতা)—বুদ্ধদেব বসু। ১১. মীনকেতন (অনুবাদ-উপন্যাস)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত [মূল : ন্যুট হামসুন]। ১২. ঝরা ফসলের গান (কবিতা)—জীবনানন্দ দাশ [এই প্রথম গুপ্ত নেই]। ১৩. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৪. এলো শীত ঘিরে কুয়াশায় (কবিতা)—প্রিয়ম্বদা দেবী। ১৫. কেমন করে লিখতে শিখি (অনুবাদ-প্রবন্ধ)—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় [মূল : সেল্‌মা ল্যাগারলফ]। ১৬. সেলমা ল্যাগারলফ (প্রবন্ধ)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৭. ডাকঘর (জঁ। ক্রিস্তফ অনুবাদ ও অন্যান্য সাহিত্যপ্রসঙ্গ)—সম্পাদক প্রভৃতি।

ঞ. মাঘ : ১০ সংখ্যা : ১৩৩৪

১. আমার প্রিয়ার ঘরের অতিথি (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ২. মায়ে-পোয়ে (পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প)—ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৩. স্বীকার (পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প)—অনিন্দিতা দেবী। ৪. বাস্তু (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ৫. সাহিত্যিক সংহতি (গল্প)—ভবানী ভট্টাচার্য। ৬. সুরের দুলাল (কবিতা)—নজরুল ইসলাম। ৭. বিগলিত শিলা (গল্প)—জগদীশচন্দ্র গুপ্ত। ৮. পাকা ধানের বিদায় (কবিতা)—জসীম উদ্দীন। ৮. বাঙলা সাহিত্যে দেশানুরাগ (প্রবন্ধ)—ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। ১০. ছন্দের কথা (প্রবন্ধ)—অমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী। ১১. মহাকাল (কবিতা)—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১২. যাদুঘর (উপন্যাস)—নরেন্দ্র দেব। ১৩. প্রাচীন ভারতে নাট্যশিল্প (প্রবন্ধ)—হেমচন্দ্র বাগ্‌চী। ১৪. বাদলের দিন (রম্য রচনা)—এস্. ওয়াজেদ আলি। ১৫. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৬. নীলার বারমাস্যা (গান)—মহম্মদ মনসুর উদ্দীন [সংগ্রাহক]। ১৭. মীনকেতন (অনুবাদ-উপন্যাস)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত [মূল : ন্যুট হামসুন]। ১৮. টমাস হার্ডি (পরিচয়)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৯. পুস্তক ও পত্রিকা (পরিচয় লিপি)—সম্পাদক প্রভৃতি। ২০. ডাকঘর [লেখক সম্প্রদায় ও কল্লোল প্রসঙ্গ]—সম্পাদক প্রভৃতি।

ট. ফাল্গুন : ১১শ সংখ্যা : ১৩৩৪

১. মানুষ (কবিতা)—হেমেন্দ্রকুমার রায়। ২. রসকলি (গল্প)—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩. দেবী-দর্শন (গল্প)—পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ৪. পরস্ত্রী (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫. লীলাকমল (কবিতা) —হেমচন্দ্র বাগ্‌চী। ৬. যাদুঘর (উপন্যাস)—নরেন্দ্র দেব। ৭. আমার

মেঘনা নদী (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৮. নহেক প্রথমতম (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৯. স্বপ্নমানের কল্পনা (গল্প)—প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। ১০. ফেরদৌসির অগ্রদূত কবি দকিকী—মহম্মদ মনসুর উদ্দীন। ১১. মীনকেতন (অনুবাদ-উপন্যাস)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত [মূল : ন্যুট্ হামসুন]। ১২. আদিম (কবিতা)—জীবনানন্দ দাশ। ১৩. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৫. পুস্তক ও পত্রিকা (পরিচয় লিপি)—সম্পাদক প্রভৃতি। ১৫. বয়সের বহ্বাড়ম্বর—মৃত-জীবিত কশ্চিৎ বৃদ্ধ। ১৬. তেপান্তর মাঠে (গল্প)—সুবোধ দাশগুপ্ত। ১৭. ডাকঘর (শৈলজানন্দ ও সাহিত্য-প্রসঙ্গ)।

ঠ. চৈত্র : ১২শ সংখ্যা : ১৩৩৪

১. খেজুর বাগান (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ২. কমলি (গল্প) —কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য। ৩. আগ্-ছাপ (গল্প)—প্রবোধকুমার সান্যাল। ৪. বিধির বিদ্রূপ (গল্প)—নৃসিংহদাসী দেবী। ৫. অন্ধকারের অন্ধকূপে (গল্প)—ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৬. পাহাড়িয়া (কবিতা)—জসীম উদ্দীন। ৭. বাঁধন না মুক্তি (প্রবন্ধ)—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। ৮. রোগশয্যায় একা শুয়ে আছি (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৯. যাদুঘর (উপন্যাস) —নরেন্দ্র দেব। ১০. অন্তর পারাবার (কবিতা)—নিরুপমা দেবী। ১১. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১২. অতি আধুনিক বাঙ্লা সাহিত্য (প্রবন্ধ)—বুদ্ধদেব বসু ['প্রগতি' থেকে পুনর্মুদ্রিত] ১৩. অসময়ে (কবিতা)—বীণাপাণি রায়। ১৪. মীনকেতন (অনুবাদ-উপন্যাস)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত [মূল : ন্যুট হামসুন] ১৫. দোল-পূর্ণিমা (গান)—নজরুল ইসলাম। ১৬. শিল্পী যামিনী রায় (পরিচয়)—বিশ্বপতি চৌধুরী।

ষষ্ঠ বর্ষ : ১৩৩৫

ক. বৈশাখ : ১ম সংখ্যা : ১৩৩৫

১. নূতন (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. আলো ও আলেয়া (গল্প) —ভবানী ভট্টাচার্য। ৩. হারানো সুর (গল্প)—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪. অপরূপ (উপন্যাস)—প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। ৫. আরণ্যক (কবিতা)—হেমেন্দ্রকুমার রায়। ৬. নীড় (গল্প)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৭. যদি কোন দিন (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৮. যাদুঘর (উপন্যাস)—নরেন্দ্র দেব। ৯. অস্ফুট স্মৃতির সুর (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগচী। ১০. ছায়াপথ (গল্প)—পান্নালাল অধিকারী। ১১. ডাক-পিওন (বড় গল্প)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১২. আমি কেন নীরব (প্রবন্ধ)—প্রমথ চৌধুরী। ১৩. কাক জ্যোৎস্না (গল্প)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ১৪. ছায় (কবিতা) —বুদ্ধদেব বসু। ১৫. 'দেবদাস'-এর জন্মেতিহাস (প্রবন্ধ)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৬. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৭. ডাকঘর (কল্লোলপ্রসঙ্গ)—সম্পাদক।

খ. জ্যৈষ্ঠ : ২য় সংখ্যা : ১৩৩৫

১. তবু তোমা ভুলি নাই (কবিতা)—বুদ্ধদেব বসু। ২. তোমারে বেসেছি ভালো (কবিতা)—বুদ্ধদেব বসু। ৩. আলোর নীচেয় (গল্প)—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ৪. দুনিয়াদারি (গল্প)—সরোজকুমার রায়চৌধুরী। ৫. বন্দনা (কবিতা)—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬. রস ও নীতিধর্ম (প্রবন্ধ)—মহেন্দ্রচন্দ্র রায়। ৭. প্রশস্তি (কবিতা)—জগৎ মিত্র। (কল্লোলের নতুন প্রচ্ছদের সঙ্গে বোধ হয় ভাবের মিল আছে। দ্রঃ ঘোষণা) ৮. স্বাগত (গল্প) —পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ৯. অপরূপ (উপন্যাস)—প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। ১০. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১১. * "তোমার ঐ ঝরণাতলার নির্জনে (কবিতা)—রাধারাণী দত্ত। *২১৯ পৃষ্ঠা সংশোধন আছে একটি ছত্রের। ১২. ডাক-পিওন (বড় গল্প)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১৩ মন্বন্তর (কবিতা)—চামেলীপ্রভা ঘোষ। ১৪. যাদুঘর (উপন্যাস) নরেন্দ্র দেব। *১৫. কবি শশাঙ্কমোহন (আলোচনা)—ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। *২১৯ পৃষ্ঠায় সংশোধন। ১৬. গজল গান—কথা, সুর ও স্বরলিপি—নজরুল ইসলাম। ১৭. ডাকঘর (বঙ্কিম-সম্মেলন, বীণাপাণি রায় ও পত্র-পত্রিকা)—সম্পাদক। ১৮. পুস্তক-পরিচয় (মরুশিখা—যতীন্দ্রনাথ, পদ্মরাগ—মিসেস আর এস হোসেন)—অচিন্ত্য সেনগুপ্ত (?)

গ. আষাঢ় : ৩য় সংখ্যা : ১৩৩৫

১. গজল গান—নজরুল ইসলাম। ২. চব্বিশ ঘণ্টা (গল্প)—অচিন্ত্য-

কুমার সেনগুপ্ত। ৩. মুশাফির (গল্প)—অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ। ৪. বিবর্তন (গল্প)—বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫. প্রথম বারিধারা (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগচী। ৬. শিল্পের আদর্শ (নন্দলাল বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার)—ইন্দ্রকুমার চৌধুরী। ৭. সিঁদুরের বেসাতি (কবিতা)—জসীম উদ্দীন। ৮. যাদুঘর (উপন্যাস)—নরেন্দ্র দেব। ৯. ডাক-পিওন (বড়গল্প)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১০. বহুরূপী (কবিতা)—সুকুমার সরকার। ১১. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১২. শেলী (Andre Maurois-এর পদাঙ্ক অনুসরণে)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৩. ডাকঘর (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, শরৎচন্দ্র-সম্বর্ধনা, গোকুল নাগ, প্রবাসী প্রসঙ্গ)। ১৪. বৈশাখী পূর্ণিমা (কবিতা)—বুদ্ধদেব বসু। ১৫. প্রবাহ (উপন্যাসের ধারা আলোচনা) —মৃত্যুঞ্জয় রায়। ১৬. অভিভাষণ (শান্তিপুর সাহিত্য সম্মিলনী)—প্রমথ চৌধুরী। ১৭. পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়লিপি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপনিষৎ, সত্যের সন্ধানে, ইসলাম ও তাহার প্রেরিত মহাপুরুষ, স্বামীর পত্র, চরকাবুড়ী, উলট পালট, রূপতৃষ্ণা-খগেন্দ্র মিত্র, আরতি, ফুল্লরা, বাংলার বাণী)—নাম নেই।

ঘ. **শ্রাবণ : ৪র্থ সংখ্যা : ১৩৩৫**

১. সব বুঝি যায় (কথিকা)—আনন্দসুন্দর ঠাকুর [প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়] ২. সমাজ ও মাসিক সাহিত্য (প্রবন্ধ)—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ৩. নারী (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৪. স্থলপদ্ম (গল্প)—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫. ভুলের মূল্য (গল্প)—নৃসিংহদাসী দেবী। ৬. অনাগত প্রিয়া (কবিতা)—জ্যোতি সেন। ৭. পাতানো মা (গল্প) —রাধারাণী দত্ত। ৮. সে শুধু চাহিয়াছিল (কবিতা)—সুকুমার সরকার। ৯. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১০. উৎসর্গ (কবিতা)—বুদ্ধদেব বসু। ১১. যাদুঘর (উপন্যাস)—নরেন্দ্র দেব। ১২. শেলী (Andre Maurois-এর পদাঙ্ক অনুসরণে)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৪. ডাকঘর (পত্র-প্রসঙ্গ)—সম্পাদক।

ঙ. **ভাদ্র : ৫ম সংখ্যা : ১৩৩৫**

১. রূপায়ণ (প্রবন্ধ)—মহেন্দ্রচন্দ্র রায়। ২. শরৎপ্রশস্তি (কবিতা)—জগৎ মিত্র। ৩. বাতাস দিল দোল (গল্প)—প্রবোধকুমার সান্যাল। ৪. সেদিন হারায়ে গেছে, স্বপ্ন যদি সত্য হোত (দুটি কবিতা)—জ্যোৎস্নাময়ী দত্ত। ৫. শেলী (Audre Maurois-এর পদাঙ্ক অনুসরণে)—

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ৬. মহিলা মজলিস (প্রবন্ধ; গল্প)—কপিল প্রসাদ ভট্টাচার্য। ৭. চিত্ত ও চিত্র (গল্প)—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ৮. কবির মুক্তি (কবিতা)—প্রফুল্লশঙ্কর গুহ। ৯. যাদুঘর (উপন্যাস)—নরেন্দ্র দেব। ১০. আমি যে প্রবাসী ভাই (কবিতা)—কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়। ১১. সাহিত্যে অশ্রদ্ধার অপরাধ (প্রবন্ধ)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৩. ডাক-পিওন (উপন্যাস*)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। *এই সংখ্যা থেকে 'উপন্যাস' বলা হচ্ছে। ১৪. ডাকঘর (বিভিন্ন প্রসঙ্গ)—সম্পাদক।

চ. **আশ্বিন : ৬ষ্ঠ সংখ্যা : ১৩৩৫**

১. জেরোম কে. জেরোম ও তাঁহার সাহিত্য (প্রবন্ধ)—বুদ্ধদেব বসু। ২. আজ শরতে (কবিতা)—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৩. ডাক্তারের ফাঁড়া (গল্প)—শচীন্দ্রনাথ মজুমদার। ৪. গরীবের প্রেম (গল্প)—দীনেশচন্দ্র লোধ। ৫. দীপান্বিতা (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগ্‌চী। ৬. সাহিত্যে অনাচার (প্রবন্ধ)—পৃথ্বীসিংহ নাহার। ৭. যাদুঘর (উপন্যাস)—নরেন্দ্র দেব। ৮. বিজলী (কবিতা)—মহমুদ হোসেন। ৯. দীপক (উপন্যাস) —দীনেশরঞ্জন দাশ। ১০. ধরণী (কবিতা)—সুকুমার সরকার। ১১. শেলী (Andre Maurois-এর পদাঙ্ক অনুসরণে প্রবন্ধ)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১২. নিজের ও পরের (গল্প)—জগদীশ গুপ্ত। ১৩. দোসরা আশ্বিন (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ১৪. ডাকঘর (গোকুল নাগ, অতি আধুনিক সমালোচনা ইত্যাদি প্রসঙ্গ)—সম্পাদক। ১৫. ডাক-পিওন (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১৬. পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয় লিপি : [বিনোদিনী—জগদীশ গুপ্ত, বসুধারা—নরেন্দ্র দেব, কালের ডায়েরী, মাতৃস্নেহ, সুরধনী, স্মৃতির আলো, মানুষ-গড়া, নারীর কেশ (গল্প), বেদে, মোয়াজ্জিন (পত্র), মেঘদূত (পত্র), উপাসনা (পত্র)]—নাম নেই। ১৭. শরৎচন্দ্র-সম্বর্ধনা (বিবরণ)—নাম নেই। ১৮. টলস্টয় (জীবনী)—নাম নেই। ১৯. আপন মনে (প্রবন্ধ)—বিষ্ণু দে।

ছ. **কার্তিক : ৭ম সংখ্যা : ১৩৩৫**

১. নীড়ের মায়া (গল্প)—সুরমা দেবী। ২. বড়বাবু ছোটবাবু (গল্প) —সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৩. বারোয়ারি পূজা (গল্প)—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। ৪. সুখ-দুঃখের বোঝা (গল্প)—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। ৬. নায়ক-নায়িকা (গল্প)—প্রবোধকুমার সান্ন্যাল। ৭. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশ-

রঞ্জন দাশ। মাতৃ-মূর্তি (ঝাটিকা)—মন্মথ রায়। ৯. বি. এন. ডবলিউ আর (গল্প)—সুবোধ দাশগুপ্ত। ১০. পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয় লিপি—সম্পাদক প্রভৃতি।

জ. অগ্রহায়ণ : ৮ম সংখ্যা : ১৩৩৫

১. শরৎচন্দ্রের নারী-চিত্র (প্রবন্ধ)—বিপিনচন্দ্র পাল। ২. বিন্দুর ছেলে (প্রবন্ধ)—অবনীনাথ রায়। ৩. তোমার লাগিয়া (কবিতা)—প্রিয়ম্বদা দেবী। ৪. ডাক-পিওন (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৫. পাহাড়ের বুকে (গল্প)—কিশোরীমোহন ভট্টাচার্য। ৬. ছায়া-ছবি (গল্প)—পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ৭. দুঃখের পার (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ৮. চৈতী হাওয়া (গল্প)—সরলকুমার অধিকারী। ৯. তোমারে ভুলিয়া গেছি (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ১০. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১১. শরতের বিদায় (কবিতা)—জসীম উদ্দীন। ১২. শেলী (জীবন-কথা)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৩. সহজ প্রেম (কবিতা)—সুকুমার সরকার। ১৪. মাসিক সংবাদ—······ ১৫. চয়নিকা—······ ১৬. মিছিল (উপন্যাস)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১৭. ডাকঘর (নানা প্রসঙ্গ) —সম্পাদক প্রভৃতি।

ঝ. পৌষ : ৯ম সংখ্যা : ১৩৩৫

১. ভদ্রলোকের এক কথা (গল্প)—সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ২. তব মুখ পানে (কবিতা)—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৩. ভৈরবী চক্র (গল্প) —ভূপতি চৌধুরী। ৪. প্রেম প্রশস্তি (কবিতা)—রাধারাণী দত্ত। ৫. ছেলেমানুষী (গল্প)—বুদ্ধদেব বসু। ৬. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। সিন্ধুকূলে (কবিতা)—বিজয়চন্দ্র মজুমদার। ৮. শেলী (জীবন-কথা)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ৯. কামনা (কবিতা)—জ্যোৎস্নাময়ী দত্ত। ১০. পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়—নাম নেই। ১১. রুবাই ছন্দের জন্মকথা (প্রবন্ধ)—সুরেশচন্দ্র নন্দী। ১২. মিছিল (উপন্যাস)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১৩. চয়নিকা—নাম নেই। ১৪. শ্মশানচারী (কবিতা)—সন্ন্যাসী সাধু খাঁ। ১৫. মাসিক সংবাদ—অজিতকুমার সেন। ১৬. দিব্‌ আন-ই-হাফিজ (অনুবাদ)—মৌলভী মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন [মূল : ফার্সী]। ১৭. ডাকঘর (নানা প্রসঙ্গ)—সম্পাদক প্রভৃতি। ১৮. ঘুম (গল্প)—অমলেন্দু বসু।

ঞ. মাঘ : ১০ম সংখ্যা : ১৩৩৫

১. চতুর্দশপদী কবিতা (প্রবন্ধ)—বুদ্ধদেব বসু। ২. গৌরবান্বিত (কবিতা) —অজিতকুমার দত্ত। ৩. দৃষ্টির দোষ (গল্প)—নৃসিংহদাসী দেবী। ৪. গান—আবদুল কাদের। ৫. ডাক-পিওন (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৬. পারুল (গল্প)—ভবানী মুখোপাধ্যায়। ৭. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ৮. বিরহ-মিলন (কবিতা)—সুকুমার সরকার। ৯. মিনতি (কবিতা)—কনকলতা ঘোষ। ১০. চয়নিকা—...... ১১. সভাপতির অভিভাষণ—জলধর সেন। ১২. মাসিক সংবাদ— —অজিতকুমার সেন। ১৩. শেলী (জীবন-কথা)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৪. দিব্-আন-ই-হাফিজ (অনুবাদ)—মৌঃ মুঃ মনসুরউদ্দীন [মূল : ফার্সী]। ১৫. দীপান্বিতা (সমালোচনা)—বুদ্ধদেব বসু। ১৬. পৌষ-পার্বণ (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগ্‌চী। ১৭. ডাকঘর—সম্পাদক প্রভৃতি। ১৮. শুভবিবাহ (গল্প)—সুবোধ দাশগুপ্ত।

ট. ফাল্গুন : ১১শ সংখ্যা : ১৩৩৫

১. বাঙলার পল্লী-সঙ্গীতে লীলাবাদ (প্রবন্ধ)—আবদুল কাদের। ২. ফাল্গুন-মাধুরী তার চরণের মঞ্জীরে মঞ্জীরে (কবিতা)—রাধারাণী দত্ত। ৩. গিল্‌টি (গল্প)—প্রবোধকুমার সান্যাল। ৪. পত্রলেখা (কবিতা)—বিশ্বেশ্বর দাশ। ৫. ময়ূরপুচ্ছের নূতন কাহিনী (গল্প)—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ৬. জবা (কবিতা)—সরোজবালা ঘোষ। ৭. কাল সে আসিবে (কবিতা)—জসীম উদ্দীন। ৮. চতুর্দশপদী কবিতা (প্রবন্ধ)—বুদ্ধদেব বসু। ৯. তখনও তুমি আস নাই ভাই (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ১০. ভুলে যাওয়া (গল্প)—জাহাঙ্গীর ভকীল। ১১. শান্তিজল (গল্প)—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২. কল্পনা (কবিতা)—নিকুঞ্জমোহন সামন্ত। ১৩. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৪. মাসিক সংবাদ—অজিতকুমার সেন। ১৫. পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয় লিপি—সম্পাদক প্রভৃতি। ১৬. মিছিল (উপন্যাস)—প্রেমেন্দ্র মিত্র।

ঠ. চৈত্র : ১২শ সংখ্যা : ১৩৩৫

১. নবীন সাধক (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. শব (গল্প)—ফণীন্দ্র পাল। ৩. বাঙলার পল্লী-সঙ্গীতে লীলাবাদ (প্রবন্ধ)—আবদুল কাদের। ৪. একখানি হাসি (কবিতা)—জসীম উদ্দীন। ৫. সংস্কার (গল্প)—সুনীলকুমার ধর। ৬. টমাস হার্ডি (কবিতা)—সারদাচরণ রায় চৌধুরী।

৭. ডাক-পিওন (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৮. বিরাজ-বৌ (প্রবন্ধ)—অবনীনাথ রায়। ৯. তুমি কাঁদো আর আমি কাঁদি (কবিতা) —কুমুদ ভট্টাচার্য। ১০. দিব্-আন্-ই হাফিজ (অনুবাদ)—মৌঃ মুঃ মনসুরউদ্দীন [মূল : ফার্সী]। ১১. রক্ত কবরী (কবিতা)—জগৎবন্ধু মিত্র। ১২. কুলির প্রাণ (গল্প)—রাণী সুরুচিবালা চৌধুরাণী। ১৩. স্মরণ (কবিতা)—প্রণব রায়। ১৪. দীপক (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৫. প্রিয়-সন্দর্শনে (কবিতা)—কনকলতা ঘোষ। ১৬. ভবিতব্য (গল্প) —হরিহর চন্দ্র। ১৭. মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (স্মৃতিতর্পণ)—সম্পাদক। ১৮. বর্ষ শেষের নিবেদন—সম্পাদক।

সপ্তম বর্ষ : ১৩৩৬

ক. বৈশাখ : ১ম সংখ্যা : ১৩৩৬

১. তুষার (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. রবীন্দ্রাদিত্য (প্রবন্ধ)— অন্নদাশংকর রায়। ৩. পত্র ('বেদে' উপন্যাস সম্পর্কে)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪. শীতের সিন্ধু (কবিতা)—নজরুল ইসলাম। ৫. অতি-আধুনিক ইংরেজী কবিতা (প্রবন্ধ)—অভিনব গুপ্ত। ৬. ওপিঠ (গল্প)—সরোজ-কুমার রায় চৌধুরী। ৭. 'প্রাণেশ্বর' (গল্প)—পান্নালাল অধিকারী। ৮. আকাশেরে ভাষা দাও কবি (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগ্‌চী। ৯. প্রকাশ ও প্রচ্ছন্নের রূপ-মাধুর্য (সমালোচনা)—রাধারাণী দত্ত। ১০. আরব কবিতা (অনুবাদ-আলোচনা)—বিষ্ণু দে। [মূল : খলিল জিব্রান]। ১১. পাখীরা (কবিতা)—জীবনানন্দ দাশ। ১২. অভিনয় (গল্প)— বুদ্ধদেব বসু। ১৩. পূরবী (গল্প)—প্রবোধকুমার সান্যাল। ১৪. প্রবাহ (নীতিমূলক সমালোচনা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

খ. জ্যৈষ্ঠ : ২য় সংখ্যা : ১৩৩৬

১. নবধর্মের প্রতীক্ষায় (প্রবন্ধ)—মহেন্দ্রচন্দ্র রায়। ২. সার্বজনীন (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৩. রাইকমল (গল্প)—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪. ও ওষ্ঠের জ্যোৎস্না এক কণা (কবিতা)—ভবানী ভট্টাচার্য। ৫. মিছিল (উপন্যাস)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৬. কীর্তন (গান) —নজরুল ইসলাম। ৭. ডাক-পিওন (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

৮. অভিভাষণ (প্রবন্ধ)—বিপিনচন্দ্র পাল। ৯. সৌন্দর্য-পিপাসা (কবিতা) —অন্নদাশংকর রায়। ১০. রাতের বাসা (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১১. মুক্তি-নির্ভর (কবিতা)—অমিয় চক্রবর্তী। ১২. পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয় লিপি—সম্পাদক প্রভৃতি। ১৩. কৃচ্ছ্রসাধন (গল্প)—ভূপতি চৌধুরী। ১৪. প্রবাহ (অশ্লীলতা সম্বন্ধে আলোচনা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ১৫. পূর্ণমনস্কাম (কবিতা)—অন্নদাশংকর রায়।

গ. আষাঢ় : ৩য় সংখ্যা : ১৩৩১

১. স্বপ্ন ও সত্য (প্রবন্ধ)—কালিদাস রায়। ২. অখ্যাত (কবিতা)—জগৎ মিত্র। ৩. একটি মুহূর্ত (গল্প)—প্রণব রায়। ৪. জ্যোতির্বিদ ওমরখৈয়ামের পঞ্জিকা সংস্কার (প্রবন্ধ)—সুরেশচন্দ্র নন্দী। ৫. আড়াল (কবিতা)—নজরুল ইসলাম। ৬. রাতের বাসা (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ৭. দূর (কবিতা)—অন্নদাশংকর রায়। ৮. নারায়ণ (গল্প) —প্রবোধ সান্যাল। ৯. ডাক-পিওন (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১০. কাল (কবিতা)—বুদ্ধদেব বসু। ১১. পত্রোত্তর (গল্প)—দেবকীকুমার বসু। ১২. প্রবাহ (সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ)—সু। ১৩. মিছিল (উপন্যাস)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১৪. এত ঘৃণা করি তবু (কবিতা)—ভবানী ভট্টাচার্য। ১৫. অদৃশ্য ক্ষত (গল্প)—সুধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। ১৬. চলচ্চিত্র (প্রবন্ধ)—ডি. আর. [দীনেশরঞ্জন দাশ]। ১৭. সাহিত্য-সংবাদ—...... ১৮. পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয় লিপি—প। ১৯. কালের প্রতিভা (গল্প) —সরল সেন [দীনেশরঞ্জন দাশ]।

ঘ. শ্রাবণ : ৪র্থ সংখ্যা : ১৩৩৬

১. গান—নজরুল ইসলাম। ২. নাটকের স্বরূপ (প্রবন্ধ)—বিজনবিহারী বসু। ৩. তুইটি স্বপ্ন (গল্প)—পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ৪. লেখাপড়া (কবিতা)—মৈত্রেয়ী দেবী। ৫. সঙ্গীত-স্বরলিপির মর্যাদা (প্রবন্ধ)—নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। ৬. সমাপ্তি (কবিতা)—অন্নদাশংকর রায়। ৭. রাতের বাসা (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ৮. শাশ্বত (কবিতা)—সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। ৯. নৃত্য করে নটরাজ—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১০. দ্বীপান্তরের আসামী (গল্প)—সুধীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ১১. তারুণ্য (কবিতা)—নরেন্দ্র দেব। ১২. স্রোতের মুখে (গল্প)—তারা মুখোপাধ্যায়। ১৩. কাল সে আসিয়াছিল (কবিতা)—জসীম উদ্দীন। ১৪. চলচ্চিত্র (প্রবন্ধ)—ডি. আর. [দীনেশরঞ্জন দাশ]। ১৫. অসংলগ্ন (আলোচনা)

—কৃত্তিবাস ভদ্র [প্রেমেন্দ্র মিত্র]। ১৬. নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু—... ১৭. প্রবাহ (নানা প্রসঙ্গ)—সু। ১৮. বিবিধ সংবাদ।

ঙ. **ভাদ্র : ৫ম সংখ্যা : ১৩৩৬**

১. লীলাকীর্তন (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ২. পতন অভ্যুদয়—বীরেশ্বর সেন। ৩. সাবিত্রী (কবিতা)—অন্নদাশংকর রায়। ৪. ডব্লউ, আর-এর, ব্রাঞ্চ লাইন (গল্প)—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ৫. শৈশব (কবিতা)—বিমলা দেবী। ৬. গান—নজরুল ইসলাম। ৭. পাহাড়ী নদী (গল্প)—মায়া দেবী। ৮. কালো চোখে এত আলো (কবিতা)—ভবানী ভট্টাচার্য। ৯. বর্তমান রুষ-সাহিত্যে আইভান বুনিন্ (প্রবন্ধ)—সত্যেন্দ্র দাস। ১০. তেপাটি (কবিতা)—বিষ্ণু দে। ১১. রাতের বাসা (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১২. মায়ামৃগ (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ সেন। ১৩. প্রবাহ (নানা প্রসঙ্গ)—সু। ১৪. পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয় লিপি—অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল। ১৫. যতীন্দ্রনাথ দাস (স্মৃতিতর্পণ)—সু।

চ. **আশ্বিন : ৬ষ্ঠ সংখ্যা : ১৩৩৬**

১. সৃষ্টি-স্থিতি (গল্প)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ২. ষড়-রত্ন (গল্প)—বিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়। ৩. পাস্থাবাস (কবিতা)—যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী। ৪. নূপুর (গল্প)—প্রবোধকুমার সান্যাল। ৫. গ্রীক কবি কোষ্টিস পালামাস (প্রবন্ধ)—সুশীলচন্দ্র চক্রবর্তী। ৬. অকারণ (গল্প)—পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ৭. তির্যক রেখা (গল্প)—ভূপতি চৌধুরী। ৮. আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্য (প্রবন্ধ)—ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ। ৯. খোলা দরজা (গল্প)—সুবোধকুমার দাশগুপ্ত। ১০. এ সুন্দর ধরণীরে লাগিয়াছে ভাল (কবিতা)—জিতেন্দ্র বক্সী। ১১. সেই ঘর মরি খুঁজিয়া (আলোচনা)—গিরিজা মুখোপাধ্যায়।

ছ. **কার্তিক : ৭ম সংখ্যা : ১৩৩৬**

১. আবিষ্কার (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ২. পৌরাণিক প্রশাখা (গল্প)—বিষ্ণু দে। ৩. গ্রামের মায়া (গল্প)—সুবোধ দাশগুপ্ত। ৪. স্বজন (কবিতা)—সুকুমার সরকার। ৫ রাতের বাসা (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ৬. অভিনয় নয় (গল্প)—বুদ্ধদেব বসু। ৭. চতুরঙ্গে শরচ্চন্দ্র (আলোচনা)—ফণীভূষণ চন্দ। ৮. অচেনা (কবিতা)—কার্তিকচন্দ্র শীল। ৯. ওমর খৈয়াম (গীতি-কাব্য)—হীরেন্দ্রকুমার বসু। ১০. প্রবাহ (গলদওয়ার্দি, সুধীন্দ্র ঠাকুর প্রসঙ্গ)—সত্যেন্দ্র দাস।

জ. অগ্রহায়ণ ঃ ৮ম সংখ্যা ঃ ১৩৩৬

১. গন্ধ (গল্প)—প্রণব রায়। ২. দুটি কথা (কবিতা)—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৩. ভূতের বোঝা (গল্প)—কল্যাণী পাল। ৪. রামধনু (গল্প)—সত্যেন্দ্র দাস। ৫. ঝপ্‌ঝপের দহ্‌ (কবিতা)—বন্দে আলী মিয়া। ৬. প্রবাহ—(ক) শিবরাম চক্রবর্তীর কবিতা—লীলাময় রায়। (খ) টমাস মান্‌—সত্যেন্দ্র দাস। ৭. যোগ্যতা (কবিতা)—অন্নদাশংকর রায়। ৮. রাতের বাসা (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ৯. পাটের ক্ষেতের মায়া (কবিতা)—মনোজ বসু। ১০. চলচ্চিত্র (আলোচনা)—ডি-আর। ১১. ডায়েরী (গল্প)—পরিমল গোস্বামী। ১২. মাসিক-সংবাদ (সাহিত্যিক প্রসঙ্গ)। ১৩. পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয় লিপি—প্র. সত্যব্রত ইত্যাদি।

ঝ. পৌষ ঃ ৯ম সংখ্যা ঃ ১৩৩৬

১. সঙ্কেতময়ী (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ২. ব্যঙ্গ (গল্প)—পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ৩. মালা (কবিতা)—নীলিমা রায়। ৪. কাজললতা (বড় গল্প)—প্রবোধকুমার সান্যাল। ৫. ভিক্ষুক (কবিতা)—হেমচন্দ্র বাগ্‌চী। ৬. চরিত্রহীন (প্রবন্ধ)—অবনীনাথ রায়। ৭. মানব (কবিতা)—শিশির ঘোষ। ৮. তোমাকে (কবিতা)—প্রণব রায়। ৯. রাতের বাসা (উপন্যাস)—দীনেশরঞ্জন দাশ। ১০. ভবিষ্যৎ (কবিতা)—অন্নদাশংকর রায়। ১১. চলচ্চিত্র (আলোচনা)—ডি-আর। ১২. প্রবাহ (নাটক ও কালিদাস নাগ প্রসঙ্গ)—সত্যেন্দ্র দাস। ১৩. পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয় লিপি। ১৪. গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট বিশেষ নিবেদন—দীনেশরঞ্জন দাশ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কালি-কলমের দিন ঃ বাংলা সাহিত্যে পালাবদল

জন্মলগ্ন থেকেই কল্লোল তরুণ লেখকদের কাগজ বলে পরিচিত ছিলো। মুখ্যত নতুন লেখকদের আনকোরা গল্প-কবিতা নিয়ে কাগজটির প্রত্যেক সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করতো। পুরোনো লেখকরাও কেউ কেউ ছিলেন বটে, কিন্তু কল্লোলের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁদেরও নতুন হয়ে উঠতে হতো। ভাবতে অবাক লাগে, যতীন্দ্রমোহন বাগচীর মতো রবীন্দ্র-লালিত কবিও তরুণ কবিদের ঢঙে ভুটিয়া যুবতীর 'আপেলের মতো মুখ' ও 'আপেলের মতো বুক' দেখেছেন, মোহিতলাল মজুমদারও নতুনদের ভিড়ে ঢুকে পড়ে হাল আমলের দেহতৃষ্ণার খর করতাল বাজাতে শুরু করেছেন। শুধু কল্লোলের পৃষ্ঠায় নয়, কল্লোলের আড্ডায়ও তরুণদের সমাদর ছিলো অব্যাহত। পাঠকসমাজের খবর নিলে দেখা যায়—কাছে-দূরে, শহরে-গঞ্জে সর্বত্র কল্লোল ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে। পাঠকদের সেই সব ফোরাম কাগজটির ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথাই মনে করিয়ে দেয়। বস্তুত একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কল্লোল পত্রিকা তরুণ লেখক ও পাঠকসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে উঠেছিলো। আর সেই কারণেই যেদিন দীনেশরঞ্জন দাশ কল্লোল পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দিলেন সেদিন অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন উদীয়মান তরুণ লেখক বুদ্ধদেব বসু।

এই যেখানে পরিস্থিতি ছিলো, যেখানে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে কল্লোলের জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠা ছিলো ক্রমবর্ধমান, সেখানে কল্লোল গোষ্ঠীরই একাংশের পৃথক্ হয়ে গিয়ে কালি-কলম পত্রিকা প্রকাশের কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিলো কিনা, সেটা ভেবে দেখতে হবে। আসলে কল্লোল গোষ্ঠীর এই ভাঙনের মূলে কোনো আদর্শগত বিরোধ ছিলো না। কেননা কল্লোলের যেমন কোনো নির্ধারিত লক্ষ্যের কথা কখনও ঘোষণা করা হয় নি, তেমনি কালি-কলম প্রতিষ্ঠার সময়ও ঘোষণা করা হয়নি কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের কথা। দুটি কাগজেরই প্রকাশিত সংখ্যাগুলি পড়লে মনে হয়, কালক্রমে সমাজে ও মানসে যে সমস্ত নতুন সংশয়, সংকট ও অনুভব এসে পড়েছে, তা স্পষ্ট ও সংহত করে তোলা—প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের নতুন মানুষের দেহমনের আরেক চেহারা ফুটিয়ে তোলা দুটি কাগজের লেখকদেরই উদ্দেশ্য ছিলো। সুতরাং যে ধরনের আদর্শগত সংঘাত থেকে সাধারণত এক পত্রিকাগোষ্ঠী ভেঙে

আরেক পত্রিকাগোষ্ঠীর জন্ম হয়, কল্লোলগোষ্ঠী ভেঙে সেইভাবে কালি-কলমগোষ্ঠীর জন্ম হয়নি। আদর্শগত বিরোধ থেকে ভাঙন এলে সঙ্গত কারণেই জোড়া লাগার সম্ভাবনা বিশেষ থাকে না। কিন্তু কল্লোল থেকে বেরিয়ে এসে যাঁরা কালি-কলম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাততম দুই তরুণ লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র আবার কল্লোলে ফিরে গিয়েছিলেন, একথা মনে রাখতে হবে। সুতরাং কালি-কলম প্রতিষ্ঠার পেছনে কল্লোল থেকে ভিন্নতর কোনো আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রণোদনা ছিলো, একথা মনে করার কোনো কারণ নেই।

আসলে সংঘাতটা ছিলো ব্যক্তিত্বের। এবং আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে স্বার্থের। স্বপ্নবিলাসী 'যৌবন-পথিক' গোকুল নাগ যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন ব্যক্তিস্বার্থের স্পর্ধিত অহমিকা কোনো আকারেই মাথা তুলবার অবকাশ পায় নি। কেননা গোকুল নাগের শিল্পিত স্বভাব অস্বীকার করার উপায় ছিলো না। তিনি ছিলেন শিক্ষিত শিল্পী, ভালো ছবি আঁকতে পারতেন। তিনি ছিলেন সম্ভাবনাময় লেখক—ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনায় তাঁর মুন্সীয়ানার কিছু পরিচয় তাঁর স্বল্পস্থায়ী জীবনেই পাওয়া গেছে। কিন্তু দীনেশরঞ্জন দাশ মানুষ হিসেবে আকর্ষণীয় হলেও সাহিত্যের জগতের বড়ো মানুষ হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে জন্মান নি, একথা কারও কাছে অস্পষ্ট ছিলো না। সত্য বটে, তিনি সারাজীবন ছবি এঁকেছেন, কবিতা লিখেছেন, গল্প রচনা করেছেন, নাটক লিখেছেন। তবু বড়ো দরের লেখক হওয়ার মতো সৃষ্টিক্ষম পুরুষার্থ তাঁর ছিলো না। অথচ তাঁরই নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশে চলতে হচ্ছে নবীন লেখকদের। বয়স যতই কম হোক্, তরুণ কবি ও গল্পকাররা নিজেদের সৃষ্টিক্ষমতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। সকলে না হোন, কেউ কেউ তো বটেই। আর সে-কারণেই কল্লোলের সম্পাদক দীনেশরঞ্জনের খবর্দারি নিয়ে কিছু চাপা অসন্তোষ কোনো কোনো আত্মবিশ্বাসী নবীন লেখকের মধ্যে ছিলো। তবে দীনেশরঞ্জন কল্লোলগোষ্ঠীর মধ্যে এই ভাঙন একেবারেই চান নি। তিনি কল্লোলের পৃষ্ঠায় দুঃখ করে বলেছেন, সম্প্রতি কোনো কোনো বন্ধু আমাদের ছেড়ে গেছেন। ঘটনাটা সত্যিই বেদনাদায়ক।

দীনেশরঞ্জনের কর্তৃত্ব সম্পর্কে এই চাপা অসন্তোষ ছাড়া টাকাকড়ির ব্যাপারেও কোনো কোনো নবীন লেখকের মনে কিছু ক্ষোভ ছিলো। তাঁরা দেখতে পাচ্ছিলেন কল্লোলের প্রচার দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, নিয়মিত গ্রাহকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর অর্থ কল্লোলের আয় আর কম নয়। অথচ দীনেশরঞ্জন তরুণ পাপ্য দক্ষিণা থেকে বঞ্চিত করে রাখছেন। এখানে মনে রাখতে হবে, খোপাধ্যায় সেই অল্পবয়সেই বিবাহিত ছিলেন। তাই তাঁর অর্থের

প্রয়োজন ছিলো খুব বেশি। সেই কারণে দীনেশরঞ্জন লেখার বাবদে তাঁকে মাঝে মাঝেই দশ / পাঁচ টাকা দিতেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রেরও অর্থের প্রয়োজন ছিলো, তাঁকেও দীনেশরঞ্জন কখনও কখনও অল্প কিছু দিতেন বলে শুনেছি। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সে-সবই এত অল্প টাকা যে, তাতে তাঁদের অভাব মিটতো না। অথচ এঁরা দুজনেই ছিলেন কল্লোলের তরুণ লেখকদের মধ্যে অগ্রগণ্য, নবীন লেখকদের মুখপত্র হিসেবে কল্লোলের যা কিছু খ্যাতি তাতে এঁদের দান অনস্বীকার্য। এই অবস্থায় বরদা এজেন্সীর মালিক শিশরকুমার নিয়োগীর কাছ থেকে যখন কালি-কলমের সম্পাদক ও লেখক হওয়ার ডাক এলো তখন তরুণ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের পক্ষে সেই ডাকে সাড়া দেওয়াই স্বাভাবিক ছিলো। তাছাড়া প্রকাশক-সংস্থা হিসেবে বরদা এজেন্সীর তখন খুব রমরমা অবস্থা। তাই ভবিষ্যতে বই প্রকাশের সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রেখে বরদা এজেন্সীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলার ইচ্ছাটা সঙ্গত বলেই মনে হয়। মনে রাখতে হবে, বিশ ও তিরিশের দশকে তরুণ লেখকদের গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে ডি. এম. লাইব্রেরী, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, বরদা এজেন্সী ও কাত্যায়নী বুক স্টলের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিলো। সব থেকে বড়ো জলপাইগুড়ির সচ্ছল নিয়োগী বাড়ির সন্তান ও বরদা এজেন্সীর একমাত্র মালিক শিশিরকুমার নিয়োগীর কাছ থেকে আশু অর্থপ্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি ছিলো। আর সেই কারণে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র কিছুকালের জন্য কল্লোলের চেনা ঘাট থেকে কালি-কলমের অচেনা ঘাটে গিয়ে পৌঁছেছিলেন।

কিন্তু সেকালের এই ইতিহাসে আরও কিছু ঘটনা ও রটনা আছে। সেই সব হচ্ছে মুরলীধর বসুকে নিয়ে। তিনি ছিলেন সাউথ সুবার্বণ স্কুলের টিচার, অচিন্ত্য-কুমার প্রেমেন্দ্র মিত্রের শিক্ষক। বয়সে সকলের চেয়ে বড়ো। তিনি কখনও নিজে লেখেননি বটে, তবু কল্লোলগোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী নীলিমা বসু ছিলেন লেখিকা। তাঁর বেশ কয়েকটি ছোট গল্প ও কথিকা-জাতীয় রচনা কল্লোলে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি কখনও নিজের লেখার মধ্যে অতি সাহসেরও পরিচয় দিতেন। তাঁর একটি গল্পে দেখি, সমকামিতা হচ্ছে বিষয়বস্তু। মুরলীধর বসু মনে করতেন, তাঁর স্ত্রী একজন সুলেখিকা। তবু যে নীলিমা বসুর গল্প যথেষ্ট পরিমাণে কল্লোলে প্রকাশিত হচ্ছে না, তার জন্য দায়ী দীনেশরঞ্জন দাশ। সেইজন্য দীনেশরঞ্জন ও কল্লোলের ওপর মুরলীধর বসুর বেশ ক্ষোভ ছিলো। কিন্তু কল্লোলের ফাইল দেখলে বোঝা যায় নীলিমা বসু তেমন উঁচুদরের লেখিকা ছিলেন না। তবু তাঁর কয়েকটি লেখা কল্লোলে প্রকাশ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, নীলিমা বসুর অকাল মৃত্যুর পর দীনেশরঞ্জন তাঁর যে স্মৃতিচারণা করেছেন, তাতে আন্তরিক

বেদনাবোধের পরিচয় আছে। সেই যা-ই হোক, প্রেমেন্দ্র মিত্ররা যে একসময় কল্লোল ছেড়ে গিয়েছিলেন তাতে একটা বড়ো ভূমিকা নিয়েছিলেন মুরলীধর বসু। তিনি কালি-কলমের অন্যতম সম্পাদকও হয়েছিলেন।

এই যে কল্লোলগোষ্ঠী ভেঙে কালি-কলমগোষ্ঠী তৈরি হলো, কল্লোলের এক হাঁড়ি ভাগ হয়ে কল্লোল ও কালি-কলমের দুই হাঁড়ির পত্তন হলো তার জন্য দায়ী কে, এই নিয়ে সেকালের লেখকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। আলিপুর কোর্টের উকিল বৃদ্ধ সুরেশানন্দ মুখোপাধ্যায় কল্লোলের লেখক ছিলেন। তিনি আমার লিখিত 'কল্লোলের কাল' পড়ে অযাচিতভাবে আমাকে জানিয়েছেন যে, কল্লোলের ভাঙন ও কালি-কলমের জন্মের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর চিঠি পড়ে আমার মনে হয়েছে, এ-ব্যাপারে তিনি স্থির মত পোষণ করতেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও মনে করতেন, কল্লোলগোষ্ঠীতে ভাঙন ও কল্লোলের প্রতিদ্বন্দ্বী কালি-কলমের আত্মপ্রকাশের যা কিছু দায়িত্ব তা হচ্ছে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের। এ কথা তিনি নিজে আমাকে বলেছিলেন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে আমি বিষয়টি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, সেই তরুণ বয়সে তিনি যা ভালো বুঝেছেন তা-ই করেছেন। একটা পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। এতে অপরাধটা কোথায়? প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছেও একদা বিষয়টি উত্থাপন করে দেখেছি, তিনিও কোনো অপরাধবোধের দ্বারা পীড়িত নন। শুধু তা-ই নয়, এক বছরের জন্য তাঁর কালি-কলমের সম্পাদক হওয়াকে তিনি কল্লোলের সঙ্গে বিচ্ছেদের ব্যাপার বলে মনে করেন না। সে যা-ই হোক্, নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক হিসেবে আমার মনে হয়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দিক্ থেকে কালি-কলমের আত্মপ্রকাশ কোনো প্রকার ক্ষতির কারণ না হয়ে বরং লাভেরই কারণ হয়েছে। পত্রিকাটির লেখক-তালিকা এবং লেখার বিষয় ও ভঙ্গি প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের বাংলা সাহিত্যকে সব দিক্ থেকে সমৃদ্ধ করেছে। তারচেয়ে বড়ো কথা, পত্রিকাটির গুণাগুণ বিচার করলে তাকে কল্লোলের প্রতিস্পর্ধী বলে মনে না হয়ে বরং পরিপূরক বলে মনে হয়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রগতি সম্পর্কেও ঠিক একথাই বলা চলে। মনে রাখতে হবে, ঐতিহাসিক বিচারে কল্লোল, কালি-কলম ও প্রগতি নিয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কল্লোল যুগ সম্পূর্ণ।

২.

কালি-কলম মাসিক-পত্র হিসেবে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ সনের বৈশাখ মাসে। তার সাইজ ছিলো প্রবাসীর মতো ডবল ক্রাউন। সেকালে ওটাই ছিলো

মাসিক-পত্রের স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ। কালি-কলম সম্পর্কে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক খবর আছে প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠার নিম্নলিখিত বিবরণের মধ্যে—

বৈশাখ ১৩৩৩

কালি-কলম

—সম্পাদক—

মুরলীধর বসু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্র

বার্ষিক সডাক ৩ ।।. বরদা এজেন্সী প্রতি সংখ্যা ।।.

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

প্রথম সংখ্যার ভেতরের আখ্যাপত্রে অতিরিক্ত সংবাদ আছে তিনটি—

কালি-কলম

সচিত্র মাসিক-পত্র

—কর্ম-সচিব—

শিশিরকুমার নিয়োগী

প্রথম বর্ষ

১৩৩৩ সাল, বৈশাখ হইতে চৈত্র।

এই তো গেলো প্রথম বছরের কালি-কলম সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য তথ্য। মাসিক-পত্রটির দ্বিতীয় বছরের প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠা থেকে সম্পাদকমণ্ডলীর কিছু পরিবর্তনের সংবাদ পাওয়া যায়। কালি-কলমের দ্বিতীয় বর্ষের কভার-পেজের বিবরণ হচ্ছে এই রকম—

কালি-কলম

সচিত্র মাসিক-পত্র

—সম্পাদক—

মুরলীধর বসু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় বর্ষ

১৩৩৪ সাল, বৈশাখ হইতে চৈত্র।

বরদা এজেন্সী

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

বার্ষিক সডাক ৩।।. প্রতিসংখ্যা ।।.

এই বিবরণে প্রথম লক্ষণীয় হচ্ছে সম্পাদকমণ্ডলী থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিদায় গ্রহণ। এর কারণ কী, এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠবে। কেউ কেউ আমাকে বলেছেন—তাঁদের মধ্যে দুজন হচ্ছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও সুরেশ চক্রবর্তী—

প্রেমেন্দ্র মিত্রকে অর্থপ্রাপ্তি ও কর্তৃত্ব প্রয়োগের যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুরলীধর বসু ও শিশিরকুমার নিয়োগী কালি-কলমে নিয়ে এসেছিলেন, তা তাঁরা ঠিকমতো পালন করেন নি। তাই ক্ষোভে অভিমানে এক বছর পর তিনি কালি-কলম ছেড়ে আবার কল্লোলে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র আমাকে বলেছেন, তিনি ১৩৩৪ সালে কলকাতা ছেড়ে বারাণসী অঞ্চলে গাজীপুর, মীর্জাপুর ইত্যাদি জায়গায় কিছুদিন ছিলেন, তারপর শ্রীনিকেতনে চলে যান কৃষিবিজ্ঞান পড়তে। সুতরাং কালি-কলম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বিরোধের কোনো প্রশ্নই ছিলো না। তবে ১৩৩৩ সালে কালি-কলমের সম্পাদনার দায়িত্ব পালনে তাঁর শৈথিল্য নিয়ে কিছু বিরুদ্ধ প্রচারণা নিশ্চয়ই ছিলো। তা না হলে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কৈফিয়ৎ হিসেবে ১৩৩৪ সালের বৈশাখ সংখ্যা কালি-কলমে এই চিঠিটি প্রকাশিত হতো না—

কালি-কলম

২য় বর্ষ বৈশাখ, ১৩৩৪ ১ম সংখ্যা

পত্র

১০৩/২ লেক রোড,
ঢাকুরিয়া
৭ই এপ্রিল, ১৯২৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

'কালি-কলমে'র এক বছর সম্পূর্ণ হ'ল। এই এক বছর নামে সম্পাদক থাকলেও শরীরের অসুস্থতা ও অন্য নানা-কারণে আমি কলকেতায় উপস্থিত থেকে 'কালি-কলমে'র কোন কাজ দেখতে পারিনি। তার জন্যে সত্যিই আমি লজ্জিত। আমি ভেবে দেখলাম যে এ বছরও আমার কলকেতায় থাকা সম্ভব হবে না। সুতরাং কোন কাজ না করে শুধু নামে সম্পাদক থাকতে আমি ইচ্ছা করি না। আসছে বছর থেকে তাই জন্যে সম্পাদক হিসাবে 'কালি-কলমে' থাকতে চাই না। তবে 'কালি-কলমে'র আমার টান এর জন্যে কমে গেছে ভাববেন না। আমার যথা সাধ্য আমি 'কালি-কলম'কে সেবা করব। আমার মনে হয় আগের বছর নামে সম্পাদক হয়ে কাজে কিছু করতে না পারায় মনে যে সঙ্কোচের কাঁটা ছিল সেটা দূর হয়ে যাওয়ায় আরো ভালো করেই কাজ করতে পারব। আপনারা আমার এ পদ-ত্যাগের ভিন্ন অর্থ করবেন না ও অন্য কোন গুজব শুনলে বিশ্বাস করবেন না। সম্পাদকী ও অন্যান্য সমস্ত সর্ত থেকে মুক্তি চাইলেও আমাকে কালি-কলম'কে নিজের কাগজ মনে করতে দিতে আপনাদের বোধ হয় আপত্তি নেই। নমস্কার—

বিনীত
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই চিঠি, আমার অনুমান, মুরলীধর বসুকে লেখা। শিক্ষক মশায়কে তিনি যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' বলে সম্বোধন করেছেন। শিশিরকুমার নিয়োগী মালিক হলেও কালি-কলমের সীনিয়র সম্পাদক ও আসল কর্তা ছিলেন মুরলীধর বসু। এই চিঠি থেকে চারটি বিষয় জানা যাচ্ছে—১. ১৩৩৩ সালে প্রেমেন্দ্র মিত্র কালি-কলমের একজন সম্পাদক থাকলেও বিশেষ কিছু কাজ করেন নি। তিনি নামে-মাত্র অন্যতম সম্পাদক ছিলেন ; ২. কালি-কলমের সঙ্গে তিনি কতকগুলি শর্তে আবদ্ধ ছিলেন ; ৩. কালি-কলমের সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পর্ক নিয়ে কিছু বিরুদ্ধ প্রচার ও গুজব প্রচারিত ছিলো ; ৪. কালি-কলমের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও এটিকে নিজের কাগজ বলে মনে করার প্রতিশ্রুতি প্রেমেন্দ্র মিত্র এখানে দিয়েছেন।

প্রথম পয়েণ্ট সম্পর্কে যা স্পষ্ট করে বলা যায় তা হচ্ছে কালি-কলমের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর থেকেই প্রেমেন্দ্র মিত্র কোনো মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ছিলেন না। কারণ তিনি রীতিমাফিক সম্পাদকী কর্তৃত্ব ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আর্থিক সুবিধা পান নি। ফলে কালি-কলমের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা কখনওই দৃঢ় হয় নি। শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতটা একটা কথার কথা মাত্র। দ্বিতীয় পয়েণ্ট সম্পর্কে খোলাখুলি কিছু বলতে গেলে বলতে হয়, যতদিন কালি-কলমের সঙ্গে সম্পাদকী-সূত্রে জড়িত থাকবেন ততদিন কল্লোলে তিনি লিখতে পারবেন না, এই কড়ার তাঁকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া হয়েছিলো। আর সে কারণেই ১৩৩৩ সালের কল্লোলে তাঁর কোনো লেখা প্রকাশিত হয়নি। তৃতীয় পয়েণ্ট সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, তিনি আবার কল্লোলে ফিরে যাচ্ছেন, এই গুজব সর্বত্র প্রচারিত ছিলো। সেই গুজব যে ভিত্তিহীন ছিলো না, তার প্রমাণ আছে ১৩৩৪ সালের কল্লোলের পৃষ্ঠায়। তখন আবার প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা সেখানে ছাপা হতে শুরু করেছে। চতুর্থ পয়েণ্ট সম্পর্কে জোরের সঙ্গে বলা যেতে পারে যে, তাতে প্রেমেন্দ্র মিত্র যে সদিচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তাতে সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই। মনে রাখতে হবে, সম্পাদকের পদ থেকে বিদায় নেওয়ার পর ১৩৩৪ সালে কালি-কলমে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ২০টি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য ১৩৩৫ সালের ১২টি সংখ্যার মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি লেখাও মুদ্রিত হয়নি। সে যাই হোক্, ১৩৩৪ সালের কালি-কলমের সবচেয়ে বড়ো খবর হচ্ছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার ঘটনা।

তৃতীয় বর্ষে কালি-কলমের সম্পাদকীয় দপ্তরে আবার পরিবর্তন ঘটে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় অন্যতম সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন। পত্রিকাটির তৃতীয় বর্ষের কভার-পেজে নিম্নলিখিত বিবরণ মুদ্রিত আছে—

কালি-কলম

সচিত্র মাসিক-পত্র

—সম্পাদক—

মুরলীধর বসু

তৃতীয় বর্ষ

১৩৩৫ সাল, বৈশাখ হইতে চৈত্র।

বার্ষিক সডাক ৩৷৷৹ প্রতি সংখ্যা ৷৷৹

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কালি-কলমের তৃতীয় (এবং শেষ) বর্ষে পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব গিয়ে পড়লো সেই মুরলীধর বসুর ওপর যিনি আদপেই সাহিত্যিক ছিলেন না। সেকালের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ও সম্ভাবনাপূর্ণ দুই তরুণ লেখকের সঙ্গে কালি-কলমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অবসান এইভাবে সংঘটিত হয়ে গেলো। মুরলীধর বসু কোনো রকমে এক বছর পত্রিকাটি চালালেন। তারপর কালি-কলম বন্ধ হয়ে গেলো। মনে রাখতে হবে, পত্রিকাটির স্থায়িত্বকাল মোট তিন বছর, ১৩৩৩ সালের বৈশাখ থেকে ১৩৩৫ সালের চৈত্র পর্যন্ত।

কালি-কলমের দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে কেন তৃতীয় বর্ষের শুরুতে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পাদকীয় দায়িত্বভার ত্যাগ করলেন, এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। প্রশ্নটা তাঁর কাছে রাখতেই তিনি স্পষ্ট জবাব দিয়েছিলেন — 'আমার তখন সংসার ছিলো, পারিবারিক দায়দায়িত্ব ছিলো। শিশির নিয়োগী বছর দুই কোনোরকমে তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। তারপর তাঁর হাতের মুঠো প্রায় বন্ধ হতেই আমার আর পোষালো না। তাই সব ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে চলে এলাম।' এখানে মনে রাখতে হবে যে, কালি-কলমের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগের তিনি আবার লেখক রূপে কল্লোলে ফিরে এসেছিলেন। সেদিক থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মিল আছে।

সু-সম্পাদিত কাগজ হওয়া সত্ত্বেও কালি-কলম না চলার কারণ ছিলো। সেই সময় প্রবাসী ও ভারতবর্ষের চাহিদা ছিলো সবচেয়ে বেশি। শিক্ষিত পাঠক এ দুটি কাগজের মধ্যে একটি কিনতো। কল্লোল প্রকাশিত হওয়ার পর অতি-আধুনিক সাহিত্যের কিছু পাঠক তৈরি হয়। তারা সংখ্যায় খুব বেশি ছিলো না, বলাই বাহুল্য। কত সামান্য পুঁজি নিয়ে পত্রিকাটি শুরু হয়েছিলো তা যথাস্থানে বলেছি। সাত বছর ধরে বহু কষ্টে দীনেশরঞ্জন দাশ কল্লোল চালিয়েছিলেন। তিনি ঋণ

ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই অবস্থা চলাকালে যখন কালি-কলম প্রকাশিত হলো তখন স্বভাবতই অতি আধুনিক সাহিত্যের মুষ্টিমেয় পাঠকসমাজও দুইভাগে ভাগ হয়ে গেলো। সেই সীমিত গ্রাহক-সংখ্যা নিয়ে কালি-কলমের পক্ষে সচ্ছল অবস্থায় থাকা সম্ভব ছিলো না। ফলে কাগজটি চালাতে গিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে শিশিরকুমার নিয়োগী ও প্রতিষ্ঠানগতভাবে বরদা এজেন্সী ফতুর হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পারিবারিক সূত্র থেকে জেনেছি, তিনি অতঃপর কষ্টের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। তাছাড়া সম্পাদক মুরলীধর বসুর নতুন পাঠক আকর্ষণ করার যোগ্যতাও ছিলো না। এই সমস্ত কারণে কালি-কলম ভালো কাগজ হওয়া সত্ত্বেও তিন বছরের বেশি চলে নি।

৩.

কল্লোলের মতো কালি-কলমেরও মুদ্রণের ইতিহাস বিচিত্র। তিন বছরের আয়ুষ্কালে প্রেসের বদল হয়েছে বেশ কয়েকবার। ১৩৩৩ সালের বারোটি সংখ্যার হিসেব দিচ্ছি। বৈশাখ সংখ্যা ছাপা হয়েছে ২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা তাই। শ্রাবণ সংখ্যা ওই ব্রাহ্ম মিশন প্রেস থেকে ছাপা হওয়ার পর ভাদ্র সংখ্যায়ও তারই পুনরাবৃত্তি হয়েছে। প্রথম প্রেস-বদল ঘটে আশ্বিন সংখ্যা থেকে। ৯ নন্দকুমার চৌধুরী ২য় লেনের এমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে পর পর ছাপা হয় আশ্বিন, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যা। পৌষ সংখ্যা থেকে আবার প্রেস বদল করা হয়। ১ এ রামকিষণ দাসের লেনস্থ নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস থেকে মুদ্রিত হয় পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা। এক বছরের মধ্যে তিনবার প্রেসের পরিবর্তন সত্ত্বেও ছাপার মান ছিলো বেশ উৎকৃষ্ট। ছাপার ভুল তাতে থাকতো না বললেই চলে। সেদিক থেকে কালি-কলমকে কল্লোলের চেয়ে উন্নততর সাময়িক পত্রিকা বলা যেতে পারে। পত্রিকাটি কল্লোলের মতো অনিয়মিত ছিলো না, প্রতি-মাসে মোটামুটি সময়মতো বেরুতো।

কল্লোলের কোনো সংখ্যাতেই যেমন সাময়িক পত্রটির আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে কোনো ঘোষণা নেই, তেমনি কালি-কলমেরও আদর্শ ও লক্ষ্যের কথা কোথায়ও স্পষ্ট করে বলা হয়নি। আসলে কোনো নির্ধারিত বা স্থিরীকৃত উদ্দেশ্য সামনে রেখে কালি-কলমের কর্তৃপক্ষ পত্রিকা প্রকাশে অগ্রসর হন নি। সুতরাং এ-ব্যাপারে কালি-কলম যে কল্লোলেরই পদাংক অনুসরণ করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য তাতে সব পাঠক ও লেখক খুশি হন নি। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের (১৩৩৭ বঙ্গাব্দের) ফেব্রুয়ারী মাসে অন্নদাশংকর রায় কালি-কলম সম্পাদক মুরলীধর বসুকে তা-ই লিখেছিলেন—'কোথায় (তরুণ) সাহিত্যিকদের ম্যানিফেস্টো?'[১] তবে

সাময়িক পত্রটি সম্পাদনার রীতি-পদ্ধতি, লেখক তালিকা ও লেখার সূচি খুঁটিয়ে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়, কল্লোলের অনুসৃত ও প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাদর্শই কালি-কলম গ্রহণ করতে চেয়েছে। আরও সুস্পষ্টভাবে, পরিচ্ছন্নভাবে।

অবশ্য অল্পস্বল্প নূতনত্বও আছে। কল্লোলে যেমন 'সংগ্রহ', 'আলোচনা', 'সমাচার', 'পরিচয় লিপি', 'ডাকঘর', 'কাহিনী' ইত্যাদি ফিচার ছিলো তেমনি কালি-কলমে ফিচার ছিলো 'অসংলগ্ন', 'বিচিত্রা','সংগ্রহ','সাহিত্য-প্রসঙ্গ' ইত্যাদি। সেই সব ফিচা-রের বক্তব্য ও উপস্থাপনা রীতির মধ্যে কিছুটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, গান ও স্বরলিপি প্রকাশের ওপর কল্লোলের চেয়ে বেশি জোর দিয়েছে কালি-কলম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলপ্রসাদ সেন, নজরুল ইসলাম, রমা মজুমদার, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান বা গানের স্বরলিপি বা গানের সংগ্রহ সমাদরের সঙ্গে পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়েছে। কালি-কলমের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রস-রচনা ও রঙ্গ-ব্যঙ্গের ওপর গুরুত্ব আরোপ। বলা দরকার, এদিকে কল্লোলের তেমন দৃষ্টি পড়ে নি। বিরূপাক্ষ শর্মা ছদ্মনামে একজন রস-রচনা 'বেতালের বৈঠক', 'পঞ্চরত্ন' ইত্যাদি লিখেছেন, জুনিয়র্ জলধর ছদ্মনামে আরেকজন লিখেছেন 'গরমিলের ঘর', 'নবকৃষ্ণের আত্মকাহিনী' ও 'ভৈরব মুখুজ্জিয়া' শীর্ষক ব্যঙ্গচিত্র, পরশুরাম লিখেছেন 'রস ও রুচি'। রস-সাহিত্য ও ব্যঙ্গ-সাহিত্যের ওপর কালি-কলমের এই অনুকূল দৃষ্টিপাতের মূল্য আছে। এছাড়া পত্রিকাটিতে আরেক রকমের লেখা দেখা যায়। সম্পাদকেরা তার নাম দিয়েছেন 'চিত্র'। গোকুলচন্দ্র নাগ এক-একটি ভাব নিয়ে কল্লোলে যেমন রম্য রচনা লিখেছেন, এই চিত্রই হচ্ছে অনেকটা সেই জাতীয় রচনা। তাতে কোথায়ও কোথায়ও গল্পেরও কিছু মিশেল আছে। নিরুপম গুপ্তের 'সুরের রাখী', 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে', 'রেলপথে' ও 'রাতের পথ', প্রবোধকুমার সান্যালের 'উল্কির মেলা', বিরূপাক্ষ শর্মার 'হাসি-কান্না', মণীন্দ্রলাল বসুর 'জলপথে' চিত্র শিরোনামে কালি-কলমে প্রকাশিত হয়েছে। কল্লোল প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিলো গল্প-মাসিক রূপে, পরে তা সাহিত্য-মাসিকে পরিণত হয়। কিন্তু কালি-কলম প্রথম থেকেই সাধারণ মাসিকপত্র রূপেই প্রচারিত হয়—গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, রম্য রচনা, ব্যঙ্গ-রচনা, সমা-লোচনা, সমাচার ইত্যাদি সবকিছুই তাতে স্থান পায়। শুধু নাটক সম্পর্কে কালি-কলমের আগ্রহের কোনো পরিচয় নেই। কল্লোলে প্রবন্ধ থাকতো বটে, তবে তার ওপর খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো না। কিন্তু কালি-কলমে প্রবন্ধ-সাহিত্য সম্পর্কে সম্পাদকদের বিশেষ সচেতনতা দেখা যায়।

কালি-কলমের প্রচ্ছদপটে তাকে সচিত্র মাসিকপত্র বলা হয়েছে। সে-জন্যই

চিত্র-মুদ্রণে পত্রিকাটির আগ্রহ দেখা যায়। সেকালে প্রবাসী ভারতবর্ষের মতো পত্র-পত্রিকায় যে ধরণের রঙিন ছবি ছাপা হতো, কালি-কলমে সে-ধরনের বহুবর্ণ রঙিন ছবি ছাপা না হলেও একরঙা ছবি অবশ্যই ছাপা হতো। প্রথম বছরের কালি-কলম থেকে তার কিছু বিবরণ দিচ্ছি। ১৩৩৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় আছে স্বাক্ষরসহ শরৎচন্দ্রের ছবি, ভাদ্র সংখ্যায় আছে শিল্পী চারুচন্দ্র রায়ের আঁকা ছবি, কার্তিক সংখ্যায় আছে 'প্রতীক্ষায়' শিরোনামে দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর আঁকা ছবি, অগ্রহায়ণ সংখ্যায় আছে 'প্রিয়ের সমাধি' শীর্ষক সারদাচরণ উকিলের ছবি, পৌষ সংখ্যায় আছে 'ধান্যোৎসব' শিরোনামে সারদাচরণ উকিলের ছবি, ফাল্গুন সংখ্যায় আছে 'হোলি' শীর্ষক সারদাচরণ উকিলের ছবি এবং চৈত্র সংখ্যায় আছে 'বিদায়' শিরোনামে লর্ড লেটনের (লীটনের) আঁকা ছবি। আধুনিক কালের বাঙালির সংস্কৃতির ইতিহাসে দেখা যায়, আধুনিক সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক শিল্পেরও চর্চা হয়েছে। সারদাচরণ ও বরদাচরণ উকিল, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, যামিনী রায়, চারু রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ইত্যাদির কথা এ-প্রসঙ্গে স্বভাবতই আমাদের মনে পড়ে। গোকুলচন্দ্র নাগ ও দীনেশরঞ্জন দাশ শিল্পী ছিলেন, চিত্র-মুদ্রণে তাঁদের আগ্রহ থাকা ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু কালি-কলমের তিন সম্পাদকের কেউ চিত্রশিল্পী ছিলেন না, শিল্প-রসিক হিসেবেও তাঁদের কোনো পরিচিতি নেই। তৎসত্ত্বেও কালি-কলমে যে এতগুলি ভালো ছবি ছাপা হয়েছে তাতে মাসিকপত্রটির প্রশংসা করতে হয়। এ-ব্যাপারে সম্পাদকেরা রস-বোধের পরিচয় দিয়েছেন।

৪.

কল্লোলের আড্ডার খ্যাতি আছে। তার সুন্দর ইতিহাস রচনা করেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ভূপতি চৌধুরী ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। নানা সূত্র থেকে নির্ভর-যোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে আমিও কল্লোলের আড্ডার একটা রূপচিত্র এই গ্রন্থের অন্যত্র নির্মাণ করেছি। কিন্তু কালি-কলমের আড্ডার কোনো বিবরণ সেকালে কিংবা একালে কেউ রচনা করেন নি। অবশ্য তার কিছু কিছু বর্ণনা শুনেছি নানা জনের কাছে। নিত্য সন্ধ্যায় বরদা এজেন্সীর দোকানে কালি-কলমের আড্ডায় উপস্থিত থাকতেন মুরলীধর বসু ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকতেন তৃতীয় সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্র। যাঁরা নিয়মিত আড্ডায় আসতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নলিনীকিশোর গুহ, প্রবোধকুমার সান্যাল, মণীন্দ্রলাল বসু, সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু, সুবোধ হড়, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্দ্র বাগচী, প্রমথনাথ বিশী, পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও শিশিরকুমার নিয়োগী। আড্ডায় কয়েকবার এসেছেন শৈলজানন্দের

বন্ধু নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, দিলীপকুমার রায়, জগদীশ গুপ্ত, কালিদাস রায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি। সেই সব সান্ধ্য আসরে বেশির ভাগ সময়েই সমসাময়িক সাহিত্যের আলোচনা হতো, কল্লোলের প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত হতো, শনিমণ্ডলের বিরোধিতা নিয়ে করা হতো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। দুই আড্ডাতেই গিয়েছেন এমন ব্যক্তির কাছে শুনেছি, কল্লোলের মতো সাহিত্যিক মনের রসায়ন কালি-কলমের আড্ডায় হতো না। কালি-কলমের আড্ডা ছিলো কল্লোলের তুলনায় জনবিরল ও স্বল্পস্থায়ী। তবু তাতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কোনো বাতাবরণ সৃষ্টি হয় নি, একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে।

কালি-কলমের আড্ডাধারীদের সঙ্গে তার লেখকগোষ্ঠীর কথা আলোচনা করা যেতে পারে। কল্লোলে পুরনো আমলের লেখকদের অল্পস্বল্প লেখা প্রকাশিত হলেও জোরটা ছিলো নতুন লেখকদের ওপর। ডাকযোগে অজ্ঞাত ও নতুন লেখকদের যে সমস্ত লেখা পাওয়া যেতো, পাঠযোগ্য মনে হলে কল্লোল তা প্রকাশ করতো। আনকোরা লেখকদের তরতাজা লেখার মান অনেক সময়েই উৎকৃষ্ট হতো না। কিন্তু কালি-কলম অপরিচিত লেখকদের রচনা প্রকাশ করেননি বললেই চলে। পত্রিকাটি মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত লেখকদের কাছে লেখার আমন্ত্রণ পাঠাতো। তার লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা স্বনামধন্য ব্যক্তি। যেমন অরবিন্দ ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলপ্রসাদ সেন, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, নলিনীকান্ত গুপ্ত, নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী, প্রমথ চৌধুরী (এবং বীরবল), মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, শশাঙ্কমোহন সেন, শান্তা দেবী, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কালিদাস রায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, পরশুরাম, নলিনীকিশোর গুহ, প্রিয়ম্বদা দেবী, মণীন্দ্রলাল বসু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সরোজকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ইত্যাদি। আর নতুন লেখকদের মধ্যে ছিলেন অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র (এবং কৃত্তিবাস ভদ্র, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছদ্মনাম), জগদীশ গুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ (গুপ্ত), ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নীলিমা বসু, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী, প্রবোধকুমার সান্যাল, মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, মনিবজ্র ভারতী, মুরলীধর বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (এবং লেখরাজ সামন্ত, শৈলজানন্দের ছদ্মনাম), শ্রীকুমার বন্দ্যো-

পাধ্যায়, সুবোধ রায়, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্দ্র বাগচী, অখিল নিয়োগী, আনন্দসুন্দর ঠাকুর (প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম), সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হুমায়ুন কবির, অন্নদাশংকর রায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইত্যাদি। লক্ষ্য করার নিশ্চয় এই যে, কালি-কলম যদিও নবীন লেখকদের মুখপত্র ছিলো এবং পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্বও ছিলো তিন তরুণের ওপর (অবশ্য মুরলীধর বসু অন্য দুজন অপেক্ষা বয়স্ক ছিলেন), তবু এই পত্রিকায় প্রবীণ ও নবীনের একটা যুক্তি-সম্মত সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা দেখা যায়। সেজন্য কালি-কলমে প্রকাশিত লেখাগুলির সামগ্রিক মান কল্লোলে প্রকাশিত লেখাগুলির চেয়ে উন্নততর ছিলো। সেইজন্য সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কালি-কলমের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে, নানা অ্যাকাডেমিক মহলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পত্রিকাটির প্রশস্তি উচ্চারণ করেছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্নদাশংকর রায়ও একবার আমাকে বলেছেন, কল্লোলের ঐতিহাসিক মূল্য যদিও অসাধারণ তবু কালি-কলমের সাহিত্যিক মান অধিকতর। কল্লোলের কাল থেকে কম-বেশি ষাট বছরের দূরত্বে আমরা যাঁরা দাঁড়িয়ে আছি, তাঁদের কাছে অবশ্য কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতি ও ধূপছায়ার ভালোমন্দ মিলেমিশে একটা ঐতিহাসিক যুগের সম্পূর্ণতা। কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যও এই মত পোষণ করতেন।

৫.

কালি-কলম : প্রথম বর্ষের সূচিপত্র

১৩৩৩ সাল, বৈশাখ থেকে চৈত্র

অরবিন্দ ঘোষ

কর্মযোগীর আদর্শ—৫৪৯, কর্মযোগ—৬২১, উভয়তঃ—৬৮৩, ভারতের অন্তরপুরুষের জাগরণ—৭৪৭।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঋতুমঙ্গল—৪০৩, আর্টের সহজপথ—৫২২, সাহিত্যে শুচি-বিকার—৭১৫, আপন কথা-পদ্মদাসী—৭৭৫।

অতুলপ্রসাদ সেন

শৈলবনের সরসী তটে (গান) ৪৪৩, গান—৫২২, গান—৬৭৫, গান—৭১৬, মুসাফের:—৫১৬।

অমিয়া চৌধুরী

স্থানচ্যুত (গল্প) ৬৪।

অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

তিল (কবিতা)—১৭১।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দু-মোসলেম প্যাক্ট—৮৬, স্কন্ধকাটা সমাজ—১৫৫, গোঁজামিল—২৯০।

ওচিৎলাল

সাবিত্রী (গল্প)—৭৯২।

কালিদাস রায়

প্রাবৃট (কবিতা)—২৩৭,

কৃত্তিবাস ভদ্র

১. অসংলগ্ন—৬১৪, ২. অসংলগ্ন—৬৭৯।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবলুভি (গল্প)—৫৯১, ৬৯৬, ৭৫৫, পেনসনের পর (রস-রচনা) ৭৭৮।

জগদীশ গুপ্ত

১ পুরাতন ভৃত্য (গল্প)—১২৩ ২. ভরাসুখে (গল্প)—২৬৮ ৩. জহর (গল্প)—৩৪৪ ৪. যৌবন-যজ্ঞের কবি (গল্প)—৪৩০ ৫. প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠী (গল্প)—৪৯৭ ৬. স্বপ্ন যখন হঠাৎ সত্য হয় (গল্প)—৫৩৭ ৭. নিষ্ঠুর গরজী (গল্প)—৫৭৮ ৮. চুনচুন্ স এ হমারে মরী ঐ (গল্প)—৬২৮ ৯. বুড়োর সুখ (গল্প)—৭১৭।

জীবনানন্দ দাশগুপ্ত

১. পতিতা (কবিতা)—৯৮ ২. মরীচিকার পিছে (কবিতা)—১৪৩ ৩. শেষ শয্যায় (কবিতা)—২০২ ৪. বেদিয়া (কবিতা)—২৯৩ ৫. কিশোরের প্রতি (কবিতা)—৩০২ ৬. নব-নবীনের লাগি (কবিতা)—৪৫২ ৭. ওগো দরদিয়া (কবিতা)—৭০৩ ৮. সুদূর-বিধুর কবি (কবিতা)—৭৭০।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—১৮৯, স্বরলিপি—২৫৪, স্বরলিপি—৩২৫।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আমাদের এই কুঁড়ে ঘরখানি (কবিতা) ৫৯৯।

নজরুল ইসলাম

১. মাধবী প্রলাপ (কবিতা)—৫১ ২. অ-নামিকা (কবিতা)—৩৫৭ ৩. গোপন প্রিয়া (কবিতা)—৪০৭ ৪. সিন্ধু (কবিতা)—৪৮৫ ৫. সিন্ধু (কবিতা)—৫৫৫ ৬. সিন্ধু (কবিতা)—৬২৫ ৭. গান—৩৯২ ৮. স্বরলিপি —৩৯৩।

নলিনীকিশোর গুহ

বিচিত্রা—১১৭, ১৯১, ৩৮২, ৩৯৯, ৪৮২, ৭৪০, ৮১৩

নলিনীকান্ত গুপ্ত

কর্মযোগীর আদর্শ—৫৪৯, কর্মযোগ—৬২১, উভয়তঃ—৬৮৩, ভারতের অন্তর-পুরুষের জাগরণ—৭৪৭।*

নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী

বিচিত্রা—২৬১।

নীলিমা বসু

গোপনধারা (গল্প)—১৫৮, ভাঙা কম্পাস (গল্প)—২৯৭।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বনস্পতির মৃত্যু (গল্প)—২৪৯, নোগুচি—৩৮৬, লিওনিদ্ আন্দ্রিভ্—৬৭৫।

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

অতৃপ্ত (কবিতা)—১৭৫।

প্রমথনাথ বিশী

১. বসন্তসেনা (কবিতা)—২৭২ ২. চার্বাক—৫০৩।

প্রবোধকুমার সান্যাল

খাঁচার জীবন একটানা (গল্প)—২২০, মাটির ঢেলা (গল্প)—৩৮১, একটি কাহিনী (গল্প)—৪৩৬, মাটি আর পাথর (গল্প)—৫২৫, বৎসহারা কোন্ সাহারা (গল্প)—৬৪৬, রূপান্তর (গল্প)—৭৬০।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মগের মুলুক (কবিতা)—১৯, মানুষের মানে চাই (গদ্য-কবিতা)—৫০, নমো নমো নমো (কবিতা)—৯০, ফের যদি ফিরে আসি (কবিতা) ১২১, সার্সিতে জল-

* আসলে এর কোনোটিই নলিনীবাবুর লেখা নয়। সবগুলিই অরবিন্দ ঘোষের লেখার নলিনীবাবুর কৃত অনুবাদ। দ্রষ্টব্য অরবিন্দ ঘোষের লেখার সূচী। অনুবাদক হিসেবে নলিনী-বাবুর নাম আছে।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

সিন্ধুতীরে (কবিতা)—৭৫৩।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্য-সম্মিলন—৮৪, জন্মোৎসব দিনে (কবিতা)—৮৮, রায়তের কথা—১৪৫, গান—১৮৮, ২৫৪, ৬১৯, ৭১৪, বৈকালী—২২৫, ২৮৮, ধর্ম ও জড়তা—২২৬, গীত পঞ্চক—৫১৫, গান ও স্বরলিপি—৭৩৪, দান (গান)—৭৭৫।

রমা মজুমদার

স্বরলিপি—২৫৪, ৩২৫।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

সমাজের ভাবান্তর—১৫০।

লেখ্‌রাজ সামন্ত

বেনামি বন্দর (গল্প)—১৪, ৩১৩।

শশাঙ্কমোহন সেন

সূর্য জাগে (কবিতা)—৭৮।

শান্তা দেবী

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প—২২৭।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

মহাযুদ্ধের ইতিহাস (বড় গল্প)—১, ৫৫, ১৫০, ২১৫, ২৭৪, ৩৬২, ৪১০, বানভাসি (বড় গল্প)—৪৬৬, ৪৯১, ৬০৫, ৬৫৭=চার সংখ্যায়। মাটির রাজা (বড় গল্প)—৭৩৬, ৭৭১,=মোট দুই সংখ্যায়। সংগ্রহ—৭৩৬, ৭৭১, জোহানের বিহা (গল্প)—৩২, বেনামি বন্দর—জনি ও টনি (গল্প)—১০৫, সেয়ানে সেয়ানে (গল্প)—১৭৬, ধোঁয়া (গল্প)—২৮২, বোল্‌সলাফ্‌ (গল্প)—৩৭৫, চক্ষুদান (গল্প)—৫০৬, কেলেঙ্কারী (গল্প)—৫৫৯, মারণ-মন্ত্র (গল্প)—৮০৫, বন্ধুর উদ্দেশে (হাফেজ হইতে)—৫৩৬, প্রার্থনা (হাফেজ হইতে)—৫৪২, সর্বনাশা (হাফেজ হইতে)—৫৮২, মনের আগুন (হাফেজ হইতে)—৫৩২, পিয়াসী (হাফেজ হইতে)—৬৯৫, মৃত্যুজয়ী (হাফেজ হইতে)—৭৮৬।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিচিত্রা—৫৪৫।

সতীশচন্দ্র সেন

বিচিত্রা—৫৪৭।

কালি-কলম : দ্বিতীয় বর্ষের সূচিপত্র

১৩৩৪, বৈশাখ থেকে চৈত্র

সরোজকুমারী দেবী

চেনা-অচেনা (গল্প) [পৃষ্ঠাসংখ্যা পাণ্ডুলিপিতে ছিল না। প্রকাশক]।

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বেদনাময়ী (কবিতা)—৬৮৩।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রবহা (উপন্যাস)—১, ৮৬, ১৫০, ২৩৪, ২৮৬, ৩৫৬, ৪২৩, ৪৮৫, ৫৬৮, ৫৯৯, ৬৬৫, ৭৩৮।

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

রাজু-পণ্ডিত (উপন্যাস)—২৪, ১১৯, ২৫৯, ৩২০, ৩৮৯, এর পর সমাপ্ত। খোকা আয়! খোকা আয় (গল্প)—২৭৯, অঙ্গারং শত ধৌতেন (গল্প)—৪১৭, হুকুমের কিস্মত (গল্প)—৪৫৭, মুক্তো (গল্প)—৫৪১, গীত-সুধা (গল্প)—৫৯৩, রহ কুণ্ঠাহীন (কবিতা)—৩৬৮, ক্ষীরোদপ্রসাদ (স্মৃতি-কথা)—৬৭৬, ৭৫৫, শনিবারের চিঠি—৭০০।

সুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

জীবন-মাধবী (কবিতা)—৪৫৫।

সুবোধ রায়

সমর্পণ (কবিতা)—৭৫২, পুঁথি-পত্র—৭০৫।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাউলের গান (সংগ্রহ)—৩৯।

হিরন্ময় ঘোষাল

সংগ্রহ—৫৩।

হুমায়ুন কবির

স্বপ্ন (কবিতা)—৫০৯।

হেমচন্দ্র বাগচী

মাটি (কবিতা)—২৬৭, শরৎ-প্রশস্তি (কবিতা)—৩১১, পথ-মায়া (কবিতা)—৫৩৯, মক্ষিরাণী (কবিতা)—৬২৯, কবি ভবভূতি (কবিতা)—৬৫৩, শীর্ণ শুভ্র পথরেখা (কবিতা)—৭০৫।

কালি-কলম : তৃতীয় বর্ষের সূচিপত্র

১৩৩৫ সাল, বৈশাখ থেকে চৈত্র

দিলীপকুমার রায়

নজরুল ইস্‌লাম

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

প্রমথ চৌধুরী

প্রমথনাথ বিশী

প্রবোধকুমার সান্যাল

বনবিহারী মুখোপাধ্যায়

প্রিয়ম্বদা দেবী

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহেন্দ্রচন্দ্র রায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মনের কথা (প্রবন্ধ)—২৯৫।

সত্যসন্ধ সিংহ

আধুনিক সাহিত্যের লক্ষণ (প্রবন্ধ)—১১৩, আর্ট, রস ও খিচুড়ি (প্রবন্ধ) •—১৭৫।

সরোজকুমার রায় চৌধুরী

একলা পথিক (গল্প)—৫৪৮।

সুবোধ রায়

সাহিত্য-প্রসঙ্গ—৫৪, দান-প্রতিদান (কবিতা)—১৯৯, তরুণ শিল্পী মনীষী দে—৪১২, জিজ্ঞাসা (কবিতা)—৪৫১, রূপান্তর (কবিতা)—৪৮৬।

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস লিখন পদ্ধতি (প্রবন্ধ)—৭, স্বদেশ (উপন্যাস)—৩৩, ১০৮, ১৬৬, ২১৭, ২৬৯, ৩৩৮, ৩৮৪, ৪২২, ৪৯৮, ৫৬৯, ৬১৭, ৬৬৭, সাহিত্যে আত্মহত্যা (প্রবন্ধ)—১৩৯, ছি-ই ছি-ই (গল্প)—১৮৫, ভেলি (প্রবন্ধ)—২৩৭, অকিঞ্চিতের গীতা (কবিতা)—৩৪৪, নবযৌবন (গল্প)—৩৬৯।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

রিনি রিনি রিনি রিনি ঝিনি ঝিনি (কবিতা)—৩৭৪, অনুসন্ধান (কবিতা) —৫৭৬।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

অধ্যাপক (গল্প)—৪৭, পূজার বাজার (গল্প)—৪০৬।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মাসিক সাহিত্য—১১৭, দীপান্বিতা (সমালোচনা)—৬২৫, মণিলাল-স্মৃতি —৬৭৬।

হেমচন্দ্র বাগচী

বৈজয়ন্তী (কবিতা)—৪১, জন্মান্তর (কবিতা)—৯৭, কদম কুসুমে আজি (কবিতা)—২১৫, জীর্ণ কাব্য তুমি বিধাতার ? (কবিতা)—৪১৯, একদিন এসেছিলে পরাণে আমার (কবিতা)—৫২৫, চঞ্চলা (কবিতা)—৬০৬, দু'খানি কবিতার বই (সমালোচনা)—৬৬৫।

কালি-কলমের লেখকক্রমে লেখার পূর্ণ সূচি সংকলিত হলো। কিন্তু পত্রিকাটির প্রতিটি সংখ্যা কেমন হতো বোঝাবার জন্য প্রথম তিনটি সংখ্যার বিবরণ নিচে দিলাম—

বৈশাখ, ১ম সংখ্যা, ১ম বর্ষ : ১৩৩৩

১. মহাযুদ্ধের ইতিহাস (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ২. নাগার্জুন (কবিতা)—মোহিতলাল মজুমদার। ৩. বেনামী বন্দর (গল্প : দিগ্বিদিক) —লেখ্‌রাজ সামন্ত [প্রেমেন্দ্র মিত্র]। ৪. মগের মুল্লুক (কবিতা)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৫. সংগ্রহ (In the world থেকে)—ম্যাক্সিম গর্কি। ৬. পাঁক (উপন্যাস : দ্বিতীয় পর্ব)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৭. ন্যাট হামসুন (অনুবাদ)—সুবোধ রায়। ৮. জোহানের বিহা (গল্প)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৯. বন্দিনী (কবিতা)—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১০. মানুষের মানে চাই (কবিতা)—প্রেমেন্দ্র মিত্র।

জ্যৈষ্ঠ, ২য় সংখ্যা, ১ম বর্ষ : ১৩৩৩

১. মাধবী প্রলাপ (কবিতা)—নজরুল ইসলাম। মহাযুদ্ধের ইতিহাস (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৩. স্থানচ্যুত (গল্প)—অমিয়া চৌধুরী। স্বর্গ জাগে (কবিতা)—শশাঙ্কমোহন সেন। পঞ্চতত্ত্ব (ব্যঙ্গ-রচনা) —বিরূপাক্ষ শর্মা। চয়নিকা (সংকলন)—রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহিতলাল মজুমদারের লেখা থেকে। ৭. পোনাঘাট পেরিয়ে (গল্প) —প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৮. পতিতা (কবিতা)—জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। ৯. সংগ্রহ (ইয়োহান বোয়ের থেকে)—অনুবাদ : মহেন্দ্রচন্দ্র রায়। ১০. বেনামী বন্দর (গল্প : জনি ও টনি)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১১. পাঁক (উপন্যাস)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১২. বিচিত্রা (নানা প্রসঙ্গ)—নলিনীকিশোর গুহ।

আষাঢ়, ৩য় সংখ্যা, ১ম বর্ষ : ১৩৩৩

১. ফের যদি ফিরে আসি (কবিতা)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ২. পুরাতন ভৃত্য (গল্প)—জগদীশ গুপ্ত। ৩. নারী-বন্দনা (কবিতা। বোদলেয়ার অনুসরণে) —মোহিতলাল মজুমদার। ৪. মহাযুদ্ধের ইতিহাস (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৫. সাহিত্যে পতিতা (প্রবন্ধ)—মহেন্দ্রচন্দ্র রায়। ৬. মরীচিকার পিছে (কবিতা)—জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। ৭. চয়নিকা (সংকলন) —রবীন্দ্রনাথ, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে। ৮. গোপনধারা (গল্প)—নীলিমা বসু। ৯. আস্তন শেহভ্‌ (গর্কি থেকে)—অনুবাদ : মুরলীধর বসু। ১০. পাঁক (উপন্যাস)—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১১. অতৃপ্ত (কবিতা)—প্যারীমোহন সেনগুপ্ত। ১২. তিল (কবিতা)—অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়। ১৩. সেয়ানে সেয়ানে (গল্প)—

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১৪. গান (নটীর পূজা থেকে)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৫. বিচিত্রা—মুরলীধর বসু, নলিনীকিশোর গুহ।

৬.

কালি-কলমের যে লেখকানুক্রমিক সূচিপত্র সংকলিত হলো তা থেকে পত্রিকাটির আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি ও মান সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে। বোঝা যাচ্ছে, অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মুখপত্র হিসেবে কল্লোলের যে ঐতিহাসিক ভূমিকা, কালি-কলম তার অংশীদার। সত্য বটে, বাহ্যত কল্লোলগোষ্ঠী ভেঙে গিয়ে কালি-কলম-গোষ্ঠীর পত্তন হয়েছে এবং কালি-কলমের জন্মমূলেই একটা বিচ্ছিন্নতার ভাব কাজ করেছে। তবে তলিয়ে দেখলে স্পষ্টতই মনে হয়, কালি-কলম কল্লোলেরই সহযোগী ও সহকর্মী। কেননা এ দুটি পত্রিকা কখনও‌ই পরস্পরকে আক্রমণ করে নি, বরং একে অন্যের অল্পবিস্তর প্রশংসাই করেছে। মাঝে মাঝে কালি-কলমের পৃষ্ঠায় কল্লোলের অনুকূল মন্তব্য শুনতে পাই। কিছু লেখক ছিলেন যাঁরা দুই পত্রিকাতেই লিখতেন। সব মিলিয়ে বিচার করলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, কল্লোলের মতোই অতি-আধুনিক সাহিত্যের পোষকতা করা কালি-কলমের ঐতিহাসিক ভূমিকার প্রধান কথা। অতি-আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে কালি-কলমের দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যে পত্রিকাটির বিভিন্ন সংখ্যা থেকে কিছু কিছু মন্তব্য উদ্ধৃত করছি—

[ক] আমাদের বাঙলা সাহিত্যে যে "আধুনিকতার উপদ্রব" দেখা দিয়েচে তা অনেকাংশেই পাশ্চাত্য সাহিত্য ও শিল্পের—(যেমন সিনেমা)—প্রভাবে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তবে আরও কয়েকটি আনুষঙ্গিক কারণ এই প্রভাবকে আরো প্রবল ক'রে তুলেচে।

আমাদের দেশে যে-সাহিত্য গড়ে উঠেচে তা হচ্চে নাগরিক সাহিত্য।··· নাগরিক জীবনে মানুষের মধ্যে যৌন-কামনার অত্যন্ত প্রাবল্য হওয়ার বৈজ্ঞানিক কারণ আছে।···বর্তমান ইউরোপে যৌন-সমস্যার প্রাবল্যের কারণ সম্বন্ধে চিন্তাশীল মনস্বী ডাক্তার য়ুঙ্ যা বলেচেন তা থেকে অল্প একটু শুনিয়েই নিরস্ত হব।

'The rapid development of the towns, coupled with the methods of work brought about by the extraordinary division of labour, the increasing industrialisation of the country, and the growing security of life combine to deprive humanity of many of expending emotional energy'···'The denial of procreation and begetting, for which purpose nature has endoused us

with great energy; the unending monotony of our highly developed modern methods of "division of labour", which excludes any interest in the work itself; above all our effortless security againet war, lawlessness, robbery, epidemics, infant and woman mortality,—all this gives a sum of surplus energy which must needs find an outlet". Dr. Jung, Analytical Psychology, ch. XIV, pp. 369-70.

…নাগরিক জীবনে মানুষ নানা দিক দিয়ে তার এই কামশক্তিকে প্রকাশ করতে বাধা পাচ্চে বলেই সে ফিরে এসে আবার যৌন-কামনার মধ্যেই উগ্রভাবে আপনার তৃপ্তির সন্ধান করতে আরম্ভ করেচে। ডাক্তার য়ুঙের বলবার আসল কথাটা এই। তার ওপর আমাদের সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে যে-সব বিধি-নিষেধ যৌন-কামনাকে সংযত এবং অনেক স্থলে অন্যায়ভাবে অবরুদ্ধ ক'রে রাখে, নাগরিক জীবনে সেই সব বিধি-নিষেধ অনেকখানিই শক্তিহীন। নগরে সমাজ-শক্তির চাপ না থাকার ফলে যৌন-কামনা আরও প্রবল হয়ে উঠেচে। তারপর যদি ডাক্তার য়ুঙের কথার মূল্য থাকে তা' হলে একথাও স্বীকার করতে হবে যে আমাদের নাগরিক জীবনে ধর্মাচরণের—ধার্মিক ক্রিয়াকর্ম পূজাপদ্ধতির—প্রতি অবিশ্বাসের ফলেও আমাদের অনেকখানি কামশক্তি আমাদের মধ্যে কর্মহীন হয়ে যাওয়াতে সেই শক্তিও আমাদের যৌনতৃষ্ণার পথ দিয়ে তৃপ্তি পাবার চেষ্টা করেচে। এই সমস্ত কারণে, আধুনিক সাহিত্যে মানবের মনের কামতৃষ্ণা যে উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করচে, তাকে নাগরিক জীবনের সত্যতার প্রকাশ ব'লে স্বীকার করতে হয়।…

…আধুনিক সাহিত্যে—কাব্যে এবং গল্পে—'জীবন' বলতে অতিমাত্রায় দেহাত্মবাদ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। যেখানে দুদিনের এই দেহটাকেই চরম সত্য এবং এই দেহের মধ্যে কামতৃষ্ণাটাই একমাত্র প্রেরণা সেখানে নারীমাত্রই যে "ক্ষণিকের প্রিয়া" বলে গণ্য হবে তাতে বিচিত্র কি! আধুনিক সাহিত্যকে গালাগালি যাঁরা করেন তাঁদের সবাই এই সাহিত্যকে নোংরা ব'লে গালাগালি করবেন। কিন্তু এই সাহিত্য যে আদর্শকে সামনে রেখে চলেচে সেই আদর্শকে নাগরিক জীবন থেকে দূর করবার কথা ভাবেন না। জীবন থেকে এই বিকারকে দূর না করতে পারলে এই সাহিত্যকেও রূপান্তরিত করা সম্ভব হবে ব'লে মনে হয় না।

—জীবন ও আধুনিক সাহিত্য, মহেন্দ্রচন্দ্র রায়। বৈশাখ, কালি-কলম, প্রথম সংখ্যা, ১৩৩৫।

[খ] …আজকাল দেশে একদল তথাকথিত সমালোচক সাহিত্যের ব্যক্তিগত অধিকার কাড়িয়া লইয়া তাহাকে দলের সম্পত্তি করিবার চেষ্টায় আছেন, সাহিত্যের নিজস্ব রূপ মুছিয়া ফেলিয়া তাহাতে দলের ছাপ মারিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন ! ইদানীং যে সমস্ত লেখা বিশেষতঃ কথাসাহিত্য প্রকাশিত হইতেছে তাঁহারা তাহার 'তরুণ-সাহিত্য' 'অতি-আধুনিক সাহিত্য' 'সবুজ-সাহিত্য' ইত্যাদি অর্থহীন নামকরণ করিয়া সাহিত্যিক মামলার একতরফা ডিক্রী ডিশ্‌মিশ্‌ করিতেছেন। 'তরুণ-সাহিত্য' 'সবুজ-সাহিত্য' ইত্যাদি যেমন কখনও কোন দেশে হয় নাই, তেমনি এদেশে নাই। এযুগের লেখকগণের বিচার করিতে হইলে সাহিত্যের চিরন্তন আদর্শের মাপকাঠি দিয়াই করিতে হইবে। শৈলজানন্দের লেখার জন্য শৈলজানন্দই দায়ী, প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনার দোষগুণ সম্পূর্ণ প্রেমেন্দ্র মিত্রেরই। যাঁহারা জানিয়া শুনিয়া সাহিত্যকে দলের মধ্যে টানিয়া আনিতেছেন, হঠাৎ ধর্মের মুখোস্‌ পরিয়া সাহিত্যকে হিন্দুসভার পাণ্ডাগিরির মন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেছেন…তাঁহারা দেশহিতের ছলে একান্ত অহিত সাধনই করিতেছেন। তাঁহারা সাহিত্যের বন্ধু নহেন, তাঁরা সাহিত্যের শত্রু।…

…কোন্‌টা সাহিত্য নয় তাহা প্রাণপণে প্রমাণ করিবার চেষ্টা না করিয়া, এ যুগের লেখকগণের রচনার মধ্যে কোথায় সত্যসত্যই সাহিত্য সৃষ্টি হইতেছে তাহার আবিষ্কারের জন্য তাঁহারা নিজের দৃষ্টি ও শক্তি নিয়োজিত করুণ—তাঁহাদের প্রতি আমার এই সবিনয় অনুরোধ।

—সাহিত্য-প্রসঙ্গ, সুবোধ রায়। বৈশাখ, প্রথম সংখ্যা, কালি-কলম, ১৩৩৫।

[গ] ·· আমাদের সাহিত্য সমালোচকরা নিশ্চিত লেখকদের লইয়া যে বিচার করেন তাতেও তাঁরা যে সব দোষ বাহির করেন, সাহিত্যের প্রকৃত বিচারে তা'র সমগ্র ওজন হয় তো এক কাঁচ্চারও বেশী হইবে না। বাকীটা খাঁটি রসবস্তু কিনা সে বিচার তাঁরা করেন না। হইতে পারে যে অনুসন্ধান করিলে হয় তো সবটাই মেকী সাব্যস্ত হইবে, কিন্তু সে অনুসন্ধানের জন্য তাঁরা ব্যস্ত নন—তাঁরা ঐ এক কাঁচ্চা লইয়া মশগুল হইয়া আছেন। যদি পোনেরো ছটাক তিন কাঁচ্চা রসবস্তু এসব রচনায় থাকে তবে তাঁদের এ সমালোচনায় ব্যস্ত হইবার কোনও হেতু নাই।

—হরিদাসী বৈষ্ণবী, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় সংখ্যা, কালি-কলম, ১৩৩৫।

[ঘ] কল্লোল-বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। বিনা অর্থবলে নানা বিরুদ্ধতার সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করিয়াও পাঁচ বৎসরে এই মাসিক যে-কৃতিত্ব দেখাইয়াছে তাহা সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য। ইতিমধ্যেই কাগজখানি বাংলার মাসিক পত্রিকার আসরে নিজের

আসন সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছে। 'কল্লোল' নিছক সাহিত্য-পত্রিকা, অতিকায় মাসিকের মত জগাখিচুড়ি নহে। অদ্যাবধি একাধিক শক্তিশালী নবীন লেখকের পরিচয় আমরা এই কাগজের কল্যাণে পাইয়াছি। সুখের কথা, বর্তমান বৎসরেও সে-ধারা অক্ষুন্ন আছে।

বৈশাখ-সংখ্যার 'হারানো সুর' উৎকৃষ্ট গল্প। লেখকের নাম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। চৈত্রের কাগজেও এঁর একটি গল্প পড়িয়াছিলাম, নাম 'রসকলি'। ছোট গল্পে তেমন অনবদ্য রসসৃষ্টি অধুনা বিরল হইয়াছে। বুদ্ধদেব বসুর 'ছায়া' ও 'তবু তোমা ভুলি নাই' কবিতা-দুটি সুন্দর। নবীন লেখকদের মধ্যে ইঁহারই সত্যিকার কবি-প্রতিভা আছে। অনর্থক সাহিত্যিক লাঠালাঠিতে যোগ দিয়া শক্তির অপচয় না করিয়া শান্তচিত্তে একাগ্র সাধনা করিলে ইনি কাব্য-রচনায় নিঃসন্দেহে যশস্বী হইবেন। আমরা নবীন কবিকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি। হেমচন্দ্র বাগচীর 'অস্ফুট স্মৃতির সুর' কবিতার শান্ত স্নিগ্ধ সুরটি উপভোগ্য।... প্রেমেন্দ্র মিত্র কাটখোট্টা Propaganda-সাহিত্যের বিপথ ছাড়িয়া আবার রস-সাহিত্যের পথে লেখনী ফিরাইয়াছেন দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম। 'নীড়' গল্পটি উচ্চাঙ্গের রচনা না হইলেও সুখপাঠ্য।

উত্তরা—চৈত্র ও বৈশাখ। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় নিন্দা ও প্রশংসা দুই-ই আছে। যেমন জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখা 'মেয়েদের রচনায় স্ত্রী-চরিত্র'। সঙ্গে দীর্ঘ উদ্ধৃতি। মহেন্দ্রচন্দ্র রায়ের তিনটি রচনা একই সংখ্যায় ছাপানোয় নিন্দা। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'আলেয়া' কবিতায় অসতর্ক শব্দ ব্যবহারে দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ। ধূর্জটিপ্রসাদের 'জল্‌সা' নামক রচনা সম্পর্কে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ। আর আছে —কেদার-বাবু, শৈলজা-বাবু ও জগদীশবাবুর লেখা চলিতেছে—নূতন পরিচয় অনাবশ্যক।

—মাসিক সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় সংখ্যা কালি-কলম, ১৩৩৫।

[ভ] অতি আধুনিক সাহিত্যিকেরা সুলেখক কিনা সে বিষয়ে এখনও সন্দেহ আছে; কিন্তু তাঁরা যে শক্তিমান লেখক সে বিষয়ে সন্দেহ করবার আর বিশেষ অবসর নেই। ওঁদের লেখা যে শুধু তরুণ-বয়স্কদেরই মাথা খারাপ করেছে তা' নয়, অনেক প্রবীণ বয়স্কদেরও বিকৃত-মস্তিষ্ক করে' তুলেছে। এই রকম একজন ক্ষিপ্ত-প্রায় প্রবীণ ব্যক্তি বৈশাখের "মাসিক বসুমতী"তে বর্তমান সাহিত্য সম্বন্ধে বিলাপ আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রধান অভিযোগ যে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে আধুনিক সাহিত্য রচিত হ'চ্ছে না! আমাদের মনে হয়, সমস্ত সাহিত্যিকদের

বাধ্যতামূলক আইন ক'রে রামকৃষ্ণ মিশন বা হিন্দুসভার সভ্য করে' দিলেই সম্ভবতঃ এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার হতে পারে।

...জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর "সেপাইঝোরা"র সমালোচনা-প্রসঙ্গে গুপ্ত মহাশয় 'কালি-কলম' ও কল্লোল'-এর প্রতি অকারণ, অনাবশ্যক ও অন্যায় কটাক্ষপাত ক'রেছেন। 'প্রবাসী' ও 'শনিবারের চিঠি' যে সম্পর্কে মাসতুত ভাই এঁদের কল্যাণে তা' প্রমাণিত হতে বেশী দেরী হবে না।

—সাহিত্যের আটচালা, বিরূপাক্ষ শর্মা। জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় সংখ্যা, কালি-কলম, ১৩৩৫।

[চ] 'শনিমণ্ডল বিনামূল্যে উপাধি-বিতরণ শুরু করেছেন। মেটারলিঙ্ক সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় মেটারলঙ্কীয় মহেন্দ্রচন্দ্র হয়েছেন, হরিদাসী বৈষ্ণবী নামে প্রবন্ধ লিখে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত হরিদাসী বৈষ্ণবী-নরেশচন্দ্র হয়েছেন! উপন্যাসের নায়িকার মুখের একটা কথার জন্য শরৎচন্দ্রকেও 'আজন্ম ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী" শরৎচন্দ্র বলা হয়েছে।...হালুমবুড়ো-প্যারীমোহন এবং কচি ও কাঁচা-সজনীকান্ত দলের উপযুক্ত যুক্তিই বটে।

কিন্তু মোড়লদের একটা ভুল হয়ে গেছে। উপাধি বিতরণ উপলক্ষে কবিগুরুকে তাঁরা ভুললেন কেন? এর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা যেন ভবিষ্যতে নষ্টনীড়-রবীন্দ্রনাথ নামে অভিহিত করেন।

ত্র্যহস্পর্শ

বাজারে গুজব যে শনিমণ্ডল থেকে একটা Extention Lecturer-এর ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। প্রথম বক্তা নাকি ওয়েলফেয়ার সম্পাদক শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়। তিনি পরপর তিনটি লেক্‌চার দেবেন ব'লে শোনা যাচ্ছে। বিষয়—(১) বক্সিং, (২) ক্লাসিক্যাল মিউজিক, (৩) চাইনিজ্ হোটেল।

—সাহিত্যের আটচালা, বিরূপাক্ষ শর্মা। আষাঢ়, তৃতীয় সংখ্যা, কালি-কলম, ১৩৩৫।

[ছ] 'শনিবারের চিঠি' বাংলার সমাজ ও সাহিত্যনীতির একটা আদর্শ ঠিক করে দেবার জন্য আসরে নেমেছেন। তাঁদের ধরণ-ধারণ দেখে মনে হয়, শুধু কলমের জোরে নয়, এইবার থেকে সেই সঙ্গে গায়ের জোরেও সাহিত্যিক শক্তির পরীক্ষা দিতে হ'বে। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে তো তাঁরা গালাগাল দিয়ে ও এক রকম ধাক্কা মেরে বাঙলা সাহিত্যের আসর থেকে বের ক'রে দিতে চান। বাজারে জোর গুজব, তাঁদের প্রতিষ্ঠিত এই পন্থার demonstration হিসাবে তাঁরা একটা টাগ্-অফ্-ওয়ার' ম্যাচের আয়োজন করেছেন। প্রথমেই তিনটি নিম্নলিখিত

প্রতিযোগিতা হয়েছে ব'লে শোনা যাচ্ছে :—(১) নজরুল ইস্‌লাম বনাম মোহিতলাল মজুমদার, (২) নরেন্দ্রদেব বনাম কান্তিচন্দ্র ঘোষ, (৩) নীরদচন্দ্র চৌধুরী বনাম হেমেন্দ্রকুমার রায়।

—সাহিত্যের আটচালা, বিরূপাক্ষ শর্মা। শ্রাবণ, চতুর্থ সংখ্যা, কালি-কলম, ১৩৩৫।

[জ] ...'শনিবারের চিঠি'র হট্টগোলের হাট থেকে 'মণিমুক্তার' হঠাৎ অন্তর্দ্ধানের হেতু কি? রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে' বাঙলার সকল সাহিত্যিকের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁরা এতদিন এটা বন্ধ করেন নি। তাই সন্দেহ হয় যে বাহিরের টিপ্পনীর ফলে নয়, হয়তো কোন রকম অন্তরটিপুনির ফলে তাঁদের "মণি-মুক্তা"র ব্যবসায় বন্ধ করতে হ'ল।

কিন্তু ওই ব্যবসাটাই ছিল যে লাভজনক। 'মণিমুক্তাবিহীন "শনিবারের চিঠি" যে মাটির দরে বিকুবে, কেউ কিনবে কি? ভূতের মুখে রাম নাম শুনতে অপরের যতই ভাল লাগুক, ভূতের পক্ষে তো সেটা বিশেষ সুবিধার নয়।

—সাহিত্যের আটচালা, বিরূপাক্ষ শর্মা। ভাদ্র, পঞ্চম সংখ্যা, কালি-কলম, ১৩৩৫।

[ঝ] ১. 'কল্লোল' সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ অকুতোভয়ে 'স্বদেশী বাজার'-এর সংবাদদাতাকে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে interview দান করেছেন।...নিজের পাঁঠা যেদিকে ইচ্ছা কাটা যায়, তাতে নাকি দোষ নেই। এই হিসাবে মাসের পর মাস দীনেশবাবু 'ডাকঘরে' যা' দিবেন তার অর্থ ও প্রয়োজনীয়তা তিনি ছাড়া আর কেউ যদি না বোঝে তাতে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু 'স্বদেশী বাজার' অপরের, interview দেবার সময়ে দরদী দীনেশবাবু সে কথাটা ভুলে ভাল করেননি।

...২. সাহিত্যে অভিনব সৃষ্টি! দেখতে চান? তা' হ'লে আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে Realistic কবি শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'কুক্কুট' কবিতা পড়ুন।

আজ পর্যন্ত কুক্কুট প্রকাশ্যে এবং গোপনে অনেককেই যোগান দিয়েছে, কিন্তু সকলেই সেই রস বেমালুম গাপ্‌ করে' গেছেন। এতদিনে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'কুক্কুট' সম্বন্ধে রসোদ্ধার করে' সেই সুচিরসঞ্চিত ঋণের পরিশোধকল্পে যে অমানুষিক চেষ্টা করেছেন সেজন্য তিনি সকলের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

—সাহিত্যের আটচালা, বিরূপাক্ষ শর্মা। আশ্বিন, ষষ্ঠ সংখ্যা, কালি-কলম, ১৩৩৫।

[ঞ] কিছুদিন পূর্বে 'শনিবারের চিঠি' 'পাঠার পাঠশালায়' পড়া বর্ণপরিচয় আউড়েছিলেন। এবারে তাঁরা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও কবি নজরুল ইস্‌লাম সম্বন্ধে সেই পাঠশালায় লেখা শিশুশিক্ষা আউড়েছেন। নীতি-বিশারদ রামানন্দ-বাবুর সম্পাদিত 'প্রবাসী'র মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত সজনী দাস প্রচারিত এই শিশুশিক্ষা পড়ে' বাঙলার বালক-বালিকারা অচিরেই রামরাজ্যে উপযুক্ত সাধুচরিত্র হয়ে উঠ্‌বে, সন্দেহ নেই।

—আর্টের আটচালা, বিরূপাক্ষ শর্মা। কার্তিক, সপ্তম সংখ্যা, কালি-কলম, ১৩৩৫

সপ্তম অধ্যায়

প্রগতির দিন ঃ বাংলা সাহিত্যে পালাবদল

বিশ শতকের বিশের দশক। সময়টা ছিলো স্বদেশিয়ানা নিয়ে বড়োই সরগরম। সেই তপ্ত রাজনৈতিক হাওয়া গিয়ে পৌঁছেছিলো কলকাতা থেকে অনেক দূরে—ঢাকা শহরেও। সেখানেও ভরন্ত কিশোর আর দুরন্ত যুবকেরা গায়ে এক গনগনে আঁচ অনুভব করতেন, স্বপ্ন দেখতেন দেশোদ্ধারের। ব্রহ্মচর্য পালন, আত্মোৎসর্গের সংকল্প গ্রহণ ও নিত্য গীতা পাঠ—এই তিন ব্রত নিয়ে ছিলো তাঁদের জীবনবৃত্ত। কোনো-না-কোনো রকমের রাজরোষের আওতায় পড়েনি, এমন উঠ্‌তি তরুণ ঢাকা শহরে দেখা যেতো না।[১]

ঢাকা শহরের কিশোর ও যুবক সমাজে এই পরিস্থিতি যখন চলছে তখন নোয়াখালি থেকে অসুস্থ দাদামশায় চিন্তাহরণ সিংহকে নিয়ে সেখানে এলেন এক বালক। তাঁর নাম বুদ্ধদেব বসু। সেটা ১৯২১ সালের কথা। বুদ্ধদেবের বয়স তখন তেরো, তিনি কোনো স্কুলে পড়তেন না। কিন্তু স্কুলের আনুষ্ঠানিক পড়াশুনোর সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও তাঁর দাদামশাই তাঁকে ইংরেজী ও বাংলা ভালোই পড়িয়েছিলেন। ছেলেবেলা থেকে বুদ্ধদেব নিরলস সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ বোধ করে এসেছেন। সেই তেরো বছর বয়সেই তাঁকে বেশ সাহিত্যপ্রেমিক বলে মনে হতো। শুধু তাই নয়, তিনি একজন খুদে লেখকও হয়ে উঠেছিলেন।

১৯২২ সালে বুদ্ধদেব ভর্তি হলেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে। ক্লাস এইট-এ। অজিত দত্ত তখন ক্লাস নাইন-এ পড়েন। এর আগে, ১৯২১ সালেই বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে অজিত দত্তের পরিচয় হয়। পরিচয় করিয়ে দেন উভয়েরই বুদ্ধ্‌দা—প্রভুচরণ গুহ ঠাকুরতা—অজিত দত্তের মামাতো দাদা এবং বুদ্ধদেবেরও সম্পর্কিত দাদা। এই পরিচয় ও বন্ধুত্ব, ভাঙচুরের কিছু চিহ্ন—উত্থান-পতনের কিছু লক্ষণ সত্ত্বেও সেই ১৯২১ সাল থেকে বুদ্ধদেবের জীবনাবসানের দিন পর্যন্ত বজায় ছিলো। তাঁদের পরস্পরের সম্বোধনের ভাষার মধ্যে অন্তরঙ্গতার সুর শোনা যেতো।

ঢাকাবাসের আদি পর্বে বুদ্ধদেবেরা বাস করতেন ফরাসগঞ্জ অঞ্চলে। সেখানে আড্ডা দেওয়ার মতো জায়গা ছিলো না। তাই বুদ্ধদেবই নিয়মিত আসতেন অজিত দত্তের বাড়িতে—আড্ডা দিতে।[২] তারপর কিছুদিন গেণ্ডারিয়া ও লালবাগে থাকার পর যখন বুদ্ধদেব তার দাদামশায় ও দিদিমাকে নিয়ে স্থায়িভাবে বাস করতে

লাগলেন সেগুনবাগানের এক টিনের বাড়িতে, তখন সেই বাড়ি হয়ে উঠলো এক বিখ্যাত সাহিত্যিক আড্ডার ও নতুন সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রস্থল। সেটা ১৯২৪ সালের কথা। সেগুনবাগানের টিনের বাড়ির সেই নতুন ঠিকানা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখ্য হয়ে আছে—৪৭ নং পুরানো পল্টন, রমনা, ঢাকা। যেমন উল্লেখ্য হয়ে আছে বুদ্ধদেব বসুর আরেক ঠিকানা—কবিতা ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। সে যাই হোক্, পুরানো পল্টনের সেই টিনের চালার নতুন বাসিন্দাকে ঘিরে যে আড্ডা একদা জমে উঠেছিলো তাতেই ঘটতো একদল যুবকের সাহিত্যিক মনের রসায়ন। সেই আড্ডা থেকেই জন্ম নিয়েছিলো অতি-আধুনিক সাহিত্যের তৃতীয় মুখপত্র প্রগতির।

স্কুলের গণ্ডী পেরোবার আগেই বুদ্ধদেব বসুকে কেন্দ্র করে যে আড্ডার সূত্রপাত হয় তার মূলবীজ ছিলো সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা। সেই ভালোবাসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো কিশোর আড্ডাধারীদের মন ও মতের সাধর্ম্য, রুচি ও পছন্দের সৌষম্য। বয়স সকলের এক ছিলো না—কেউ ছিলেন বড়ো, কেউবা ছোট—কিন্তু তাতে আড্ডার মেজাজ ও মৌতাত কখনও বিঘ্নিত হয় নি। নিত্যসহচরতা ও উষ্ণ সান্নিধ্যের সেই ক্রমবর্ধমান ইতিহাসের প্রথম দুটি নাম অজিত দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু। আর ছিলেন প্রভু গুহঠাকুরতা ও ভৃগু গুহঠাকুরতা। এই সময়ে বুদ্ধদেবের আরও দু'জন বন্ধু হয়েছিলেন সহপাঠী হিসেবে। এঁরা হলেন সুকুমার বসু ও সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা অতিশয় তুখোড় ছাত্র ছিলেন, পরে দু'জনেই আই. সি. এস হয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে বুদ্ধদেবের আড্ডা চলতো। কেননা প্রখর বুদ্ধি ও ক্ষুরধার মেধায় তাঁরা ছিলেন আকর্ষণীয় কিশোর-ব্যক্তিত্ব। বুদ্ধদেব পুরানা পল্টনে যাবার পর আরও দু'জন বন্ধু পেয়ে যান। তাঁদের একজন হচ্ছেন ওখানের 'পরম-ভবনের' মালিক পরমেশপ্রসন্ন রায়ের ছেলে পরিমল রায়। পরিমল সাধারণ ছেলে ছিলেন না। তিনি অর্থনীতির উজ্জ্বল ছাত্র ছিলেন এবং পরবর্তীকালে অর্থনীতিবিদ হিসেবে দেশে-বিদেশে খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন। কিন্তু সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তাঁর আকর্ষণ ছিলো খুবই গভীর। তাঁর রসবোধ ও রচনাশক্তির পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর লিখিত রচনায়, ছড়ায়, 'ইদানীং' নামক গ্রন্থে। কিন্তু সৃষ্টির চেয়েও পরিমলের ব্যক্তিত্ব ছিলো বেশি। কথা বলতেন কম, কিন্তু যা বলতেন তা হতো বেশ চতুর ও চৌকোশ। বাচনভঙ্গির মধ্যে মৃদুতা থাকলেও বুদ্ধির অভাব থাকতো না। বুদ্ধদেবের প্রতিবেশী পরিমল রায় তাঁর পরিচ্ছন্ন ও পরিশীলিত রুচি নিয়ে পুরানা পল্টনের নতুন আড্ডার রত্নবিশেষ হয়ে উঠেছেন। সেই সঙ্গে আরেক আড্ডাধারী বন্ধুর সমাগম হলো। তিনি হচ্ছেন ঢাকার আর্মানি-

টোলার অমলেন্দু বসু (জ. ১৯০৮)। এই অমলেন্দু বসু আর্মানিটোলা হাই স্কুল থেকে ১৯২৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে এম. এ. পাশ করেন ১৯৩০ সালে। ১৯৪৭ সালে অক্সফোর্ডে ডি. ফিল. হন। ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবেও তিনি কীর্তিমান্—ঢাকা সলিমুল্লাহ্ কলেজ, রাজশাহী সরকারী কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অসামান্য অধ্যাপনার ইতিহাস ছড়িয়ে আছে। তাঁর সাহিত্যচর্চার পরিচয় আছে 'সাহিত্যলোক' (১৯৭০) ও 'কবি জীবনানন্দ' গ্রন্থে। অজিত দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু যেমন কবি-সাহিত্যিক হিসেবে শ্রুতকীর্তি ছিলেন, তেমনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবেও (বুদ্ধদেব বসু আমেরিকায়ও কিছুকাল অধ্যাপনা করেছেন) বহু সম্মানিত ছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ঢাকার চারজন প্রতিশ্রুতিমান কিশোর, যাঁরা সকলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া উজ্জ্বল রত্ন হয়েছিলেন পরবর্তী-কালে, তাঁদের নিয়েই পুরানা পল্টনের প্রাক্-প্রগতি আড্ডার কেন্দ্র বিন্দু তৈরি হয়েছিলো।

মণীশ ঘটক (জ. ১৯০২) ওরফে যুবনাশ্ব ছিলেন বুদ্ধদেব, অজিত, পরিমল, অমলেন্দুর চেয়ে বয়সে বড়ো। পড়তেন প্রেসিডেন্সী কলেজে, থাকতেন ইডেন হস্টেলে। কিন্তু ঢাকার বাড়িতে এলেই পুরানা পল্টনের আড্ডায় গিয়ে উপস্থিত হতেন। এই দীর্ঘকায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি মার্জিত রুচি ব্যক্তিটি লিখেছেন কম, কিন্তু যা কিছু লিখেছেন তা নিয়েই কল্লোলের কাল থেকেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাব্য-গ্রন্থ 'শিলালিপি' (১৩৩৬), 'যদিও সন্ধ্যা' (১৩৭৫), 'বিদুষী বাক' (১৩৭৮), 'যুবনাশ্বের নেরুদা' (১৩৮০) ও 'একচক্রা' (১৩৮২) গল্পগ্রন্থ 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী', (১৩৮৩) [?] ও উপন্যাস 'কনখল' (১৩৬৮) ও 'মান্ধাতার বাবার আমল' (১৩৮৫) তাঁর নব্যধর্মী সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় বহন করছে। সেই যাই হোক্, মণীশ ঘটকের সঙ্গে পুরানা পল্টনের আড্ডায় যোগাযোগ শুরু হয় ১৯২৫ সাল থেকে।

সেই সময় ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করে বুদ্ধদেব পড়ছেন ঢাকা কলেজে, অজিত দত্ত জগন্নাথ কলেজে। এই সময়ে তাঁদের আরও কিছু বন্ধু লাভ হয়। প্রভু গুহ-ঠাকুরতার ভাই ভৃগু গুহঠাকুরতার সঙ্গে পরিচয় আগেই হয়েছিলো, কিন্তু সেই বন্ধুত্ব গাঢ়তর হয় কলেজে পড়বার সময়। কিন্তু এম. এ. পাশ করার কিছু পরে ভৃগুর অকাল মৃত্যুতে সেই বন্ধুত্বে ছেদ পড়ে। জগন্নাথ কলেজে সেই সময় এক ক্লাস ওপরে পড়তেন (আই. এ. দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়তেন) মণীশ ঘটকের ভাই সুধীন ঘটক, অনিল ভট্টাচার্য ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্র সেই অল্প বয়স

থেকেই স্বনামধন্য, তাঁর সাহিত্যসাধনার সহজাত শক্তি ছিলো সন্দেহের অতীত। পুরানা পল্টনের আড্ডার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্বল্পস্থায়ী হলেও (তিনি কিছুদিনের মধ্যেই ঢাকায় পড়াশুনো ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন) উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। মণীশ ঘটকের সাহিত্য-প্রতিভা সুধীশ ঘটকের ছিলো না বটে, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে তিনিও ছিলেন গুণী লোক। সুধীশের অনুরাগ ছিলো খেলাধুলোয়, ছবি আঁকায়, ছবি তোলায়। বিজ্ঞানের নিষ্ঠাবান ছাত্র হিসেবে ফটোগ্রাফিতে তাঁর বিশেষ আগ্রহ দেখা গেছে। মনে রাখতে হবে, সুধীশ ঘটক বড়ো হয়ে ফিল্মের মস্তবড়ো ক্যামেরাম্যান হয়েছিলেন। অনিল ভট্টাচার্যের আগ্রহ দেখা গেছে চিত্রশিল্পে, বাঁশি বাজানোর আর্টে। সেই অল্প বয়সেই তিনি বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্তের কবিতার বইয়ের প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়েছিলেন। পরে তিনি চিত্রশিল্পী হিসেবে লাভ করেছিলেন বিশেষ প্রতিষ্ঠা। মন্মথ রায়, অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, জসীমউদ্দিন, আবদুল কাদেরও কোনো সময়ে ঢাকার আড্ডার সঙ্গে অল্পস্বল্প যুক্ত ছিলেন বলে শুনেছি। তবে সেই সংবাদের সত্যতা এখন আর পুরোপুরি যাচাই করা সম্ভব নয়। এই আড্ডার কথা জানতেন ঢাকার বিখ্যাত ব্যক্তিরাও—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুশীলকুমার দে, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার ইত্যাদি। তাঁদের কারো কারো পরোক্ষ মদতও ছিলো বলে শুনেছি।

ঢাকার আড্ডা—পুরানা পল্টনের আড্ডা চলেছে অনেকদিন। বুদ্ধদেবরা যখন স্কুলে পড়তেন তখন এর শুরু, তাঁরা যখন এম. এ.-র পাঠ (বুদ্ধদেব, অজিত দত্ত, অমলেন্দু বসু, পরিমল রায় ও ভৃগু গুহঠাকুরতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ.) সমাপ্ত করে কর্মোপলক্ষে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন তখন তার সমাপ্তি। এই আড্ডা অনেকেরই মন তৈরী করতে সাহায্য করেছে। বহু সময়স্তর পর্যন্ত ব্যাপ্ত পুরানা পল্টনের আড্ডায় বিদেশী সাহিত্য, রবীন্দ্র-সাহিত্য, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, শনিবারের চিঠি, নজরুল মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা, দেশী-বিদেশী চিত্রকলা, রবীন্দ্রনাথ-অতুলপ্রসাদ-নজরুলের গান, ফ্রয়েড-ইয়ুং, সেক্স, নারী ইত্যাদি নানা মাপের নানা বিষয় আলোচিত হতো। মনে রাখতে হবে, আড্ডাধারীদের তখন কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়ার বয়স। তাঁদের কাছে তখন সত্য হচ্ছে যৌবনবন্দনা, নারীবন্দনা ও প্রেমবন্দনা। জীবনের নানা দিগন্তে তাঁদের তখন চোখ পড়তে শুরু করেছে। এই কথা ধরে নিতে কষ্ট হয় না যে, পুরানা পল্টনের টিনের চালাতেই বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী' আর অজিত দত্তের 'মালতী' ভূমিষ্ঠ হয়ে ক্রমশ যৌবনবতী হয়ে ওঠে।

২.

আড্ডার সঙ্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটা নিবিড় যোগ আছে। বঙ্গদর্শনের দরবার, ভারতীর ভিটে, মণিলালের আসর, প্রমথ চৌধুরীর সবুজ সভা, [পরিচয়ের আড্ডা], পূর্বাশার বৈঠক ইত্যাদির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলা সাহিত্যের নতুন কালের অনেক খানি ইতিহাস। আড্ডার রসতন্তু থেকে উর্ণনাভের সাহিত্যের জাল তৈরি করে আড্ডারসিক মন। ঢাকার পুরানা পল্টনের বিখ্যাত আড্ডাটি থেকেও জন্ম নিয়ে নেয় সবুজদ্বীপের মতো একখণ্ড সাহিত্যভূমি। তার নাম প্রগতি।

পুরানা পল্টনের আড্ডার নিত্যরসিকেরা সাহিত্যচর্চার কৈশোরক নেশায় প্রথমে বার করতেন একটি হাতে লেখা পত্রিকা। নাম 'পতাকা'। সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু, সহযোগী অজিত দত্ত। হাতে লেখার দায়িত্ব পড়েছিলো পত্রিকাটির একজন প্রধান পরিচালক প্রভু গুহঠাকুরতার বোন গায়ত্রী গুহঠাকুরতার ওপর। ঢাকার ৩:নং বাঙ্গলা বাজারের এক বিখ্যাত পরিবারের পরমা কন্যা গায়ত্রী দেবী এখন আমেরিকার লস এঞ্জেলস শহরের রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসিনী গুরুমা।[৩] সেই হাতে-লেখা কাগজটি ঢাকার পরিচিত মহলে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলো। তার আগে বুদ্ধদেবের নিজস্ব একটি হাতে-লেখা কাগজ ছিলো, অজিত দত্ত বলেছেন—তার নাম ছিলো 'ক্ষণিকা'।[৪] সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, হাতে-লেখা প্রগতির আত্মপ্রকাশের পূর্ব-লগ্নে ঢাকার পুরানা পল্টনে, আর্মানিটোলায়, ফরাসগঞ্জে, গেন্দারিয়ায় ও বাঙ্গলা বাজারে অতি আধুনিক সাহিত্যচর্চার একটা প্রস্তুতিপর্ব চলছিলো-হাতে-লেখা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে। শুধু বুদ্ধদেব-অজিত দত্তের কাগজগুলি নয়, সুধীশ ঘটকের 'ভগ্নরথ' নামে হাতে-লেখা কাগজটির কথাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এ-সম্বন্ধে অজিত দত্ত লিখেছেন—'সুধীশের পত্রিকার নাম হিসাবে খুবই মানানসই। কারণ পত্রিকা নিয়ে বেশিদিন মেতে থাকার মতো স্বভাব সুধীশের ছিল না। যতদূর মনে পড়ে মণীশ ঘটকের শ্বশুর নরেন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ি থেকেও শকুন্তলা দেবীর পরিচালনায় বোধহয় একটি হাতে-লেখা পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকাগুলির প্রচার ছিল বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে বাড়িতে। পরে 'ভগ্নরথ' ও আমাদের পত্রিকা এক হয়ে হাতে-লেখা প্রগতি বেরোয়।'[৫] এই হচ্ছে অমুদ্রিত প্রগতির জন্মের ইতিহাস।

মুদ্রিত প্রগতিরও একটা ছোট জন্মবৃত্তান্ত আছে। আই. এ. পরীক্ষায় বুদ্ধদেব বসু দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে কুড়ি টাকা বৃত্তি পেয়েছিলেন। তখনকার দিনের পক্ষে এটা অনেক টাকা! মুখ্যত এই টাকার ওপর নির্ভর করেই ছেপে প্রগতি বার করার সিদ্ধান্ত নেন বুদ্ধদেব বসু। অবশ্য অন্যান্য বন্ধুবর্গ ও আড্ডাধারীরাও

পকেট-খরচা থেকে পয়সা বাঁচিয়ে অল্পস্বল্প সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন বলে শুনেছি। ইতিমধ্যে বুদ্ধদেব বসু, অমলেন্দু বসু, পরিমল রায়, অজিত দত্ত (কলকাতায় পড়তে গিয়ে আবার ঢাকায় ফিরে আসেন) ইত্যাদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ক্লাসে ভর্তি হন। বুদ্ধদেব বসু যুক্ত হন জগন্নাথ হলের সঙ্গে। সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদক হিসেবে হলের বার্ষিক 'বাসন্তিকা'র শ্রীবৃদ্ধিতে তাঁর ভূমিকা ছিলো অগ্রগণ্য।[৬] এই যে তরুণ লেখকদের ঢাকাগোষ্ঠী, তাঁরা আত্মপ্রকাশের একটি উপযুক্ত মাধ্যম খুঁজছিলো। প্রগতির প্রকাশে সেই মাধ্যমটি পাওয়া গেলো। অজিত দত্ত মুদ্রিত প্রগতি সম্পর্কে বলেছেন—'কালি-কলমের মতো কল্লোলের সঙ্গে বিরোধিতা করে অথবা কল্লোলের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হবার উদ্দেশ্যে আমরা এ মাসিক পত্র প্রকাশ করিনি। আমরা যারা ঢাকায় ছিলাম, আমাদের একটি নিজস্ব সাহিত্য পত্রিকার প্রয়োজন বোধ করেছিলাম।'[৭]

আষাঢ়, ১৩৩৪ সালে মুদ্রিত প্রগতির ১ম বর্ষ প্রথম সংখ্যা বেরোয়। নামপত্রে একটি ছবি—এক বৃদ্ধের হাতে কলম। মধ্যভাগের এই ছবির ডানদিকে স্তূপীকৃত বই, বামদিকে 'প্রগতি' কথাটি মুদ্রিত। অন্যান্য বিবরণ এই রকম—

সম্পাদক
শ্রী বুদ্ধদেব বসু
শ্রী অজিতকুমার দত্ত
প্রথম বর্ষ, ১৩৩৪-৩৫
প্রগতি কার্যালয়
৪৭ নং পুরাণা পল্টন
রমনা, ঢাকা

পত্রিকাটির সাইজ ছিলো প্রবাসীর সাইজ থেকে কিছু ছোট। যত্ন নিয়ে প্রতিটি সংখ্যা ছাপা হতো। প্রগতিতে কবিতা ছাপা হতো পাইকা টাইপে, অন্যান্য লেখা স্মল পাইকা টাইপে। প্রতি সংখ্যায় একটি করে ফোটো থাকতো। যেমন প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় ছিলো কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ফোটো। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বিখ্যাত ব্যক্তিদের ফোটো ছাপার যে রেওয়াজ কল্লোল শুরু করেছিলো, তা যেমন কালি-কলমে অনুসৃত হয়েছে তেমনি অনুসৃত হয়েছে প্রগতিতে। প্রগতি সব দিক্ থেকেই—কী সম্পাদনা, কী লেখা, কী বক্তব্য—কল্লোলের পথই পরিক্রমা করার চেষ্টা করেছে। কল্লোলের সঙ্গে প্রগতির এই সাদৃশ্যের একটা কারণ আদর্শগত সৌষম্য, অন্য কারণ লেখক-তালিকার অন্তত আংশিক একরূপতা। একথাটাই স্পষ্ট করে বলতে গিয়ে অজিত দত্ত বলেছেন যে, কল্লোল থেকে সরে যাওয়ার জন্য

তাঁরা প্রগতি প্রকাশ করেন নি। কল্লোলের লেখকদের মধ্যে অনেকে প্রগতিতে লিখতেন।[৮] অন্যত্র বলেছি, কালি-কলমের জন্মের মধ্যে একটা আপাত-বিচ্ছিন্নতার ব্যাপার থাকলেও আসলে ছিলো কল্লোলপন্থী পত্রিকা। উভয় পত্রিকার সম্পাদনার গুণাগুণ ও লেখক-তালিকার মধ্যেও যথেষ্ট মিল আছে।

প্রগতির পুরো ফাইল এখন দুষ্প্রাপ্য। তবে পত্রিকাটি ১৩৩৪-৩৭ / ১৯২৭-৩০, এই পুরো তিন বছর প্রকাশিত হয়েছিলো। কাগজটি যাতে চলে সেদিকে বুদ্ধদেবদের যথেষ্ট সজাগ দৃষ্টি ছিলো। সেজন্য কল্লোলেতো বটেই, প্রবাসীর মতো প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক পত্রিকায়ও প্রগতির বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। এখানে ধূপছায়া মাসিক-পত্রে (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫) প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন পুরোপুরি উদ্ধৃত করছি—

প্রগতি

সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকের মাসিকপত্র

সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্ত

আগামী আষাঢ়ে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিবে

এ-বৎসর প্রগতিতে যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহাদের
মধ্যে কয়েকজনের মাত্র নাম

সুনীলকুমার দে	প্রভু গুহ ঠাকুরতা	নজরুল ইসলাম
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	মোহিতলাল মজুমদার	প্রিয়ম্বদা দেবী
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	জগদীশ গুপ্ত	হেমচন্দ্র বাগচী
জসীমউদ্দীন	যুবনাশ্ব	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
বুদ্ধদেব বসু	জীবনানন্দ দাশগুপ্ত	অজিতকুমার দত্ত

বৈশাখ সংখ্যা হইতে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

"প্রবাসী"

ধারাবাহিকভাবে বাহির হইতেছে—

প্রগতিতে কখনো কোনো অনুৎকৃষ্ট রচনা প্রকাশিত হয় নাই

নব-বর্ষের বার্ষিক মূল্য (তিন টাকা ছয় আনা)

২৫ শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে প্রেরিতব্য।

দ্বিতীয় বর্ষের প্রগতির এই প্রারম্ভিক বিজ্ঞাপন থেকে বোঝা যায়, প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন—এই দুই শ্রেণীর লেখক সংগ্রহের দিকে পত্রিকা-কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি ছিলো। লক্ষ করার বিষয় এই যে, প্রতিষ্ঠিত লেখক মাত্র চার জন—সুনীলকুমার দে, মোহিতলাল মজুমদার, প্রিয়ম্বদা দেবী ও নজরুল ইসলাম। অবশিষ্ট সকলেই তরুণ লেখক। এ থেকে বোঝা যায়, অতি-আধুনিক সাহিত্যের মুখপত্র রূপেই

প্রগতি স্বীকৃতি পেতে চেয়েছিলো। তরুণ লেখকরা যে স্বনামে এখানে অজস্র লিখেছেন তা নয়, ছদ্মনামেও লিখেছেন।। যেমন অভিনব গুপ্ত = অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত. দেবদত্ত = অজিত দত্ত, যুবনাশ্ব = মণীশ ঘটক, বিপ্রদাস মিত্র = বুদ্ধদেব বসু। প্রগতিতে কোনো কোনো সংখ্যায় পরবর্তী সংখ্যার ঘোষণা থাকতো। একটা ঘোষণার নমুনা দিচ্ছি—

(আগামী সংখ্যায়) প্রভু গুহ ঠাকুরতার 'বল্‌শেভিবস্‌ট সাহিত্যের ধারা।' বিপ্রদাস মিত্রের 'পুরাণের নবজন্ম' (উর্মিলা)। বেনিতো মুসোলিনির একটি ছোট গল্পের অনুবাদ। আইরিশ্‌ নাট্যকার শ্যন্‌ ও কেইসী-লেখক প্রভু গুহ ঠাকুরতা। প্রভু গুহ ঠাকুরতার 'আজকালকার ফরাসী সাহিত্য'। ডঃ সুশীলকুমার দে-র 'প্রাচীন বাঙ্গালা নাটক ও তাহার অভিনয়।' অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের একটি ছোটগল্প 'বিবাহের চেয়ে বড়।'

৩.

প্রগতির লেখক ও লেখা সম্বন্ধে একটা ধারণা দেওয়ার জন্য পত্রিকাটির লেখকানুক্রমিক সূচি উপস্থাপিত করছি—

প্রগতি

আষাঢ়, ১৩৩৪—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫

প্রথম বর্ষ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আমার পরাণ মুখর হয়েছে সিন্ধুর কলরোলে (কবিতা)—আষাঢ়, ১৩৩৪, এই মোর অপরাধ (কবিতা)—চৈত্র, ১৩৩৪, ওগো ও অপরিচিতা (কবিতা)—ফাল্গুন, ১৩৩৪, "কোথায় তোমারে দেখেছি বল ত" (কবিতা)—চৈত্র, ১৩৩৪, তবুও কাটিবে দিন (কবিতা)—ফাল্গুন, ১৩৩৪, তাই ভেবে শিরে সিন্দুর দিয়ো (কবিতা)—মাঘ, ১৩৩৪, তোমার হাসির পিছে (কবিতা)—শ্রাবণ, ১৩৩৪, প্রবাসী (বড় গল্প)—বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫, বলিতে পার কি পাখী (কবিতা) —পৌষ, ১৩৩৪, বসিতে বলিলে কাছে (কবিতা)—পৌষ, ১৩৩৪, বসে' আছি নিরালায় (কবিতা)—কার্তিক, ১৩৩৪, বিবাহের চেয়ে বড় (গল্প)—আশ্বিন, ১৩৩৪, ভৃঙ্গার ভরে' মদ রেখেছিনু (কবিতা)—ভাদ্র, ১৩৩৪, মৃত্যুর সাথে

বিয়া (কবিতা)—শ্রাবণ, ১৩৩৪, হেরিনু চমৎকার (কবিতা)—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪।

অজিতকুমার দত্ত

আমারে রাখিও মনে (কবিতা)[৯]—কার্তিক, ১৩৩৪, আমি কি লুপ্ত হ'ব (কবিতা)—আশ্বিন, ১৩৩৪, একটি মেয়ে (কবিতা)—আষাঢ়, ১৩৩৪, জাপানী (কবিতা)[১০]—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪, তুলনা (কবিতা)—বৈশাখ, ১৩৩৫, নহে সে মোদেরে (কবিতা)—পৌষ, ১৩৩৪, মানসী (কবিতা)—শ্রাবণ, ১৩৩৪, মালতী (কবিতা) [২৬টি স্তবক সমন্বিত দীর্ঘ কবিতা]—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫, রহস্য (কবিতা)—ভাদ্র, ১৩৩৪, সে খোঁজে কি কাজ (কবিতা)—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪।

অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ

সোনা (গল্প)—চৈত্র, ১৩৩৪।

অমলেন্দু বসু

টমাস হার্ডি (প্রবন্ধ)—মাঘ, ১৩৩৪, পথের দেখা (গল্প)—ফাল্গুন, ১৩৩৪।

জগদীশ গুপ্ত

স্মৃতির বাঁধন (গল্প)[১১]—শ্রাবণ, ১৩৩৪।

জসীমউদ্দীন

বিদায়-বেদন (কবিতা)—আশ্বিন, ১৩৩৪।

জীবনানন্দ দাশগুপ্ত

১৩৩৩... (কবিতা) বৈশাখ, ১৩৩৫, কবি (কবিতা)—আশ্বিন, ১৩৩৪, খুশ্‌রোজী (কবিতা)—শ্রাবণ, ১৩৩৪, পরবাসী (কবিতা)—মাঘ, ১৩৩৪, পলাতক (কবিতা)—পৌষ, ১৩৩৪, পিপাসার গান (কবিতা)—ফাল্গুন, ১৩৩৪।

বুদ্ধদেব বসু

অতি-আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্য (প্রবন্ধ)—মাঘ, ১৩৩৪, অতীতের স্মৃতি (প্রবন্ধ)—বৈশাখ, ১৩৩৫, অসূর্যম্পশ্যা (কবিতা)—ভাদ্র, ১৩৩৪, আসন্ন (কবিতা) —অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪, কৃপাণ-গাথা (অনুবাদ কবিতা)—পৌষ, ১৩৩৪, ক্ষণিকা (কবিতা)—আষাঢ়, ১৩৩৪, চৌরঙ্গী (উপন্যাস)[১২]—আষাঢ়, ১৩৩৪, ছায়াচিত্র (গল্প)—ফাল্গুন, ১৩৩৪, জাপানী কবিতা (অনুবাদ) [অজিত দত্তের সঙ্গে] —অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪, ঝুট (গল্প)—ভাদ্র, ১৩৩৪, টান্ (গল্প)—কার্তিক, ১৩৩৪, তৃতীয় (কবিতা)—মাঘ, ১৩৩৪, তোড়া (কবিতা)—আশ্বিন, ১৩৩৪, পদ্মার ঢেউ (গল্প)—পৌষ, ১৩৩৪, পরাজিতা (কবিতা)—চৈত্র, ১৩৩৪, প্রিয়তমার প্রতি (কবিতা)—কার্তিক, ১৩৩৪, বাসর রাত্রি (কবিতা)—ফাল্গুন, ১৩৩৪, বিজয়িনী

(কবিতা)—চৈত্র, ১৩৩৪, বিরহীর চিঠি (কবিতা)—পৌষ, ১৩৩৪, ব্যঙ্গ-সাহিত্য —ফাল্গুন, ১৩৩৪, মঞ্জরী-সঙ্গীত (অনুবাদ কবিতা)[১৩]—পৌষ, ১৩৩৪, মায়াবী (কবিতা)—শ্রাবণ, ১৩৩৪, সুদূরিকা (কবিতা)—ভাদ্র, ১৩৩৪, স্বপ্ন (কবিতা) —জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫, হে বিধাতা, আর কিছু নহে (কবিতা)—বৈশাখ, ১৩৩৫।

মণীশ ঘটক

প্রতীক্ষায় (কবিতায়)[১৪]—আষাঢ়, ১৩৩৪।

মোহিতলাল মজুমদার

শ্রাবণ-শর্বরী (কবিতা)—শ্রাবণ, ১৩৩৪।

যুবনাশ্ব

উদয়াচলের যে তীর্থপথে (গল্প)—শ্রাবণ, ১৩৩৪, এয়োতি (নাটিকা)— অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪।

হেমচন্দ্র বাগচী

পীতপাণ্ডু পত্রদল ঝরি যায় (কবিতা)—চৈত্র, ১৩৩৺, বন্দিনী সে নারী (কবিতা)—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪, বিশ্বনর্তকী (কবিতা)—ভাদ্র, ১৩৩৪, মর্ম মোর হয়েছে উদাস (কবিতা)—চৈত্র, ১৩৩৪।

বিষ্ণু দে

পুরাণের পুনর্জন্ম (গল্প)—চৈত্র, ১৩৩৪, ফিরে-ফিরুতি (গল্প)—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫।

নজরুল

সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে (কবিতা)—বৈশাখ, ১৩৩৫, এছাড়া ৪টি সংখ্যায় নজরুলের গজলগান ও স্বরলিপি আছে।

অন্যান্য লেখক ও লেখার তালিকা হচ্ছে—

আইভান বুনিন—দশ তারিখ (গল্প)।

আকিকো ওসানো—(দশটি জাপানী কবিতা) অনুবাদক অজিতকুমার দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু।

আন্তন চেহভ্—কাল একটা পরীক্ষা (গল্প)।

আব্দুল কাদের—বিবসনা (কবিতা)।

গায়ত্রী দেবী—অন্দরের চিঠি (পত্রাকারে প্রবন্ধ)।

দেবদত্ত—আষাঢ়ে (গল্প), সেই শিল্পীর তীরে (কবিতা)

পরিমল রায়

অন্ধকার (কবিতা), অশ্রু (কবিতা), আহুতি (কবিতা), তুমি মোরে গেছো ভুলে (কবিতা), জাপানী কবিতা।

প্রফুল্লশঙ্কর সেন—নির্বাণ (কবিতা)

প্রভু গুহঠাকুরতা

আজকালকার ফরাসী কথাসাহিত্য, চৌরঙ্গী—উপন্যাস, গীত-নাট্য, বর্তমান জার্মানীর চিন্তাধারা, বল্‌শেভিস্‌ট সাহিত্যের ধারা, লুইজী পিরান্‌দেল্লো, হ্বন্‌ ও কেইসা।

প্রিয়ম্বদা দেবী

পথ চেয়ে (কবিতা), হেমন্ত (কবিতা)

বালারাণী গুহ

বাতাসীর মৃত্যু (গল্প)।

বিপ্রদাস মিত্র

চৌরঙ্গী (উপন্যাস), পুরাণের পুনর্জন্ম।

বেনিতো মুসোলিনী

কিছুই আসে যায় না (ছোটগল্প)।

বেলা দাশগুপ্তা

নৈবেদ্য (গল্প)।

ভৃগুকুমার গুহ

টুর্গেনিভের একাদক (প্রবন্ধ)।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ফা-হিয়ান্‌।

রমেশচন্দ্র দাস

তোমার প্রণয় (কবিতা)।

সমরেন্দ্র গুপ্ত

'ভোর হ'ল যেই শ্রাবণ-শর্বরী' (কবিতা)

সুশীলকুমার দে

প্রাচীন বাঙ্গালা নাটক ও তাহার অভিনয় (অনুবাদক-পরিমল রায়)।

সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

পথিক-অতিথি (কবিতা)।

৪.

প্রগতি যে কল্লোলের দোসর ও বাংলা সাহিত্যের পালাবদলের সপক্ষে ছিলো, তার প্রমাণ আছে প্রকাশিত গল্প, কবিতা ও উপন্যাসের মধ্যে। সর্বত্রই তরুণ

লেখকগোষ্ঠী ও সম্পাদকের নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ছড়িয়ে আছে। মাসিকপত্র হিসেবে প্রগতি কী করতে চেয়েছে তার ধারণা পেতে হলে পড়তে হবে পত্রিকাটির সম্পাদকীয় মন্তব্য ও 'মাসিকী' ফিচার। অতি-আধুনিক সাহিত্য নিয়ে যে বাদানুবাদ তখনকার দিনের সাহিত্যিক আবহাওয়াকে উত্যক্ত করে তুলেছিলো, প্রগতি ছিলো তার সরব অংশীদার। অতি-আধুনিক সাহিত্যের সপক্ষে সে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছিলো। তার কিছু পরিচয় এখানে সংকলিত করছি—

[ক] মাঘ মাসের প্রগতিতে···বর্তমান বাংলা সাহিত্য হইতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ক্রমশঃ অপসৃত হইতেছে—এই উক্তি সমর্থন করিতে গিয়া লিখিয়াছিলাম যে, যতীন্দ্রমোহনের কবিতা আগাগোড়া রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভঙ্গী লইয়াই রচিত হইয়াছে বলিয়া তাহা মৌলিকত্ব বর্জিত ও স্বাতন্ত্র্যহীন হইয়া পড়িয়াছে।···

রবীন্দ্রনাথের দিন এক রকম ফুরাইয়া আসিয়াছে, একথা আমি কোনো খানেই বলি নাই। আমি শুধু লিখিয়াছিলাম যে আধুনিক সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ক্রমশঃ সরিয়া যাইতেছে।···

আধুনিক লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অনুকৃতি করিবার স্পৃহা আর তত উগ্র নাই, প্রত্যেকে একটি বিশিষ্ট রূপ লইতে প্রত্যাশী,হয় তো এখনো কেহই সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র হইয়া উঠেন নাই, বরং সেই দিকে একটা চেষ্টা দেখা দিয়াছে, সেই কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। এবং সেই চেষ্টা যে নিন্দনীয় তাহা আমি বিশ্বাস করি না। বরং আমি ইহা বিশ্বাস করি প্রত্যেক সাহিত্যসৃষ্টির পশ্চাতেই একটি চেষ্টা লুক্কায়িত থাকে। সমস্ত আর্টের মধ্যেই একটি সজ্ঞানতা ও সচেষ্টতা আছে।···

রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণ গ্রহণ করিলে কোনো বাঙালী লেখকেরই জাত যাইবে না, তাহা সত্য কথা। কিন্তু ইহার চেয়েও আরও একটা বড় সত্য কথা কি নাই যে, যে-কবি খালি রবীন্দ্রনাথের অক্ষম অনুকরণই করিল, নিজে স্বাধীন কিছুই সৃষ্টি করিতে পারিল না, সে অতিশয় দুর্ভাগ্য কবি? যে অনুকরণ স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত সাহিত্য-সৃষ্টিতে লেখককে প্ররোচিত করে না, একটা প্রাচীরাবদ্ধ কূপে বন্দী করিয়া রাখে, তাহা রবীন্দ্রনাথেরই হোক্ বা বিদেশীয় সাহিত্যেরই হোক্, সমান রূপেই নিন্দার্হ।···

প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটা যথেচ্ছাচারিতা আছে বলিয়া প্রথমে ভুল হওয়া স্বাভাবিক, এবং সেই প্রতিক্রিয়া যে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী—ইহাও মনে হয়। কিন্তু যে প্রতিক্রিয়ার শক্তি সমস্ত নূতন সৃষ্টির অন্তরালেই পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে, তাহা যখন একদিন প্রথম বিপুল বন্যাবেগে নিজেকে উৎকীর্ণ করিয়া দেয় তখন সেই ধ্বংসলীলা যতই ভয়াবহ ও অনাহুত হোক্ না কেন, সেই উন্মত্ততার পশ্চাতে একটি

অদূরবর্তী শস্যশ্যামলতা, একটি প্রচুর উৎপাদিকা শক্তির আভাস সুপ্ত থাকে। বাংলা সাহিত্যে প্রতিক্রিয়া যে একটি নিয়মানুবর্তিতায়ই দেখা দিয়াছে, তাহাই সত্য কথা, এবং সেই জন্য আশার কথাও বটে। ··

···একমাত্র বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্যই যে প্রতিক্রিয়া, তাহার স্থায়িত্ব নাই। তাহা শুধু একটা বিলাস বই আর কিছুই নয়, কিন্তু যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিশক্তির অজস্র উচ্ছ্বাসেই সজ্ঘটিত হয় তাহাতে সর্বাগ্রে কিছু উৎকট আতিশয্য থাকিলেও তাহা সাহিত্যের পক্ষে পরম কল্যাণকর, ইহা আমরা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি। ··

—প্রত্যুত্তর, অভিনব গুপ্ত (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)। প্রগতি, বৈশাখ, ১৩৩৫।

[খ] ১. একজন তরুণ ও অখ্যাত লেখকের কথা বিশেষ গর্বে ও আনন্দের সহিত উল্লেখ করছি। শ্রী নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এ-যাবৎ বড় জোর দশ বারোটি প্রবন্ধ লিখেছেন এবং সেগুলি সবই এক কল্লোলেই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ঐ ক'টি রচনার ভিতর দিয়েই তিনি একাধারে যে রসবোধ ও ভাষা-সম্পদের পরিচয় দিয়েছেন, তা বাস্তবিকই অপূর্ব।···বাঙ্‌লা সাহিত্যক্ষেত্রে এখনো অনাগত সমালোচকদের পক্ষে তার আদর্শ অনুকরণীয়।

২. 'শনিবারের চিঠি' 'কল্লোল'-'কালি-কলম'কে প্রাণ খুলে গালাগাল দিতেই থাক্‌বেন, কারণ ঐ দুই পত্রিকাতে প্রকাশিত গল্প ও কবিতায় স্ত্রী-পুরুষের দেহের কামনা মাঝে-মাঝে উঁকি মারে। রচনাগুলি সাহিত্য-সৃষ্টি রূপে কেমন হয়েছে, সে বিষয়ে শ্রীসজনীকান্ত দাস বা রবীন্দ্রনাথ কেউ কিছু বলেন নি ; একজন আবেদন করেছেন আধুনিক অশ্লীলতার বন্যাকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য, অপরজন যদিও 'আধুনিক সাহিত্য' তাঁর 'চোখে পড়ে না', তবুও তাতে 'হঠাৎ কলমের আব্রু ঘুচে' গেছে' বলে' মত দিয়েছেন। আব্রু ঘুচে' যাওয়ার বিরুদ্ধে কি 'সাহিত্যিক' কারণ আছে, তা রবীন্দ্রনাথ জানালেও পারতেন। সে কি এই ভদ্রশ্রেণী উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা হওয়া এতকাল যাঁদের একচেটে সৌভাগ্য ছিল —ও নিম্নস্তরের লোকের মধ্যে সাহিত্যের দিক দিয়ে যে ব্যবধান এতকাল ছিল, তা হঠাৎ খসে' গেছে ; না এই যে, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র যে সব জিনিষ ইঙ্গিত মাত্র করেছেন, আধুনিকেরা সেইটেই একটু স্পষ্ট করে বলেছেন ? গোগোলের আমলে রুশীয় নাটক-নভেলে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ভিন্ন কোনো লোক স্থান পেত না ;—সেই ব্যবধান লঙ্ঘন করে' চেহভ, গর্কী নিশ্চয়ই মহাপাতক করেছেন। 'যুবনাশ্বের' গল্প যে ভালো নয়, তা'র একমাত্র কারণ কি এই যে, তাঁর চরিত্রগুলি পুরনো আমলের জমিদার বা বালীগঞ্জনিবাসী ব্যারিষ্টার নয়।···

পুরুষ যে নারীর দেহকে কামনা করে, এই কথাটির একটু খোলাখুলিভাবে উল্লেখ ছিল'বলে' 'বন্দীর বন্দনা' কবিতাকে সাহিত্যের পুলিশম্যানরা ধরে' নিয়ে একেবারে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে বিচারের জন্য উপস্থিত করলেন। কবিতা কেন্দ্রগত ভাবে যা-ই হোক্ না কেন, যা'তে 'রমণী-রমণ-রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নিতি'—একথা থাকতে পারে, সে কি কখনো ভালো হ'তে পারে ?…

রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র তাঁদের বিনোদিনী-বিমলা কিরণময়ী-সাবিত্রীর দল নিয়ে চির নির্বাসন লাভ করুন।'

প্রগতি ঠাট্টা করে বলেছেন, জলধর সেন একটিও 'অশ্লীল' লাইন লেখেন্ নি বলে এঁদের মতানুসারে তিনিই বোধহয় বাঙ্‌লার শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক।

—মাসিকী, প্রগতি, কার্তিক, ১৩৩৪।

[গ] জোড়াসাঁকো-ভবনে যে সাহিত্য সভা হয়, তা'তে…রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেন '…তোমরা, যারা সাহিত্যে একটা নবযুগ এনেছ, তোমাদের এই নবত্ব কোন্ বিশেষ রূপটি ধারণ করেছে, বলতে পারো? কোথায় তোমাদের নব প্রতিমা? কেমন তার অলঙ্কার? কোথায় তাঁর রূপের বৈশিষ্ট্য।'

অতি-আধুনিকদের পক্ষ থেকে যাঁরা উপস্থিত তাঁরা এই প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেন নি। তাই মাসিকীতে প্রগতির বক্তব্য—

'অতি-আধুনিক বলে' যাঁরা বর্তমান সাহিত্য জগতে পরিচিত, এক শৈলজানন্দ ভিন্ন কারু খুব কম লেখাই এ-পর্যন্ত পুস্তকাকারে বেরিয়েছে, অনেকের এ-পর্যন্ত একখানা বইও বেরোয়নি।…অতি আধুনিকদের প্রণীত পুস্তকের সংখ্যা অত্যল্প ;— কাজেই সাহিত্যে তাঁর কোন্ বিশেষ রূপটিকে আনবার চেষ্টা করছেন, তা সাধারণ সহজে বুঝতে পারবে না।…

রবীন্দ্রনাথের গৃহে…প্রথম দিনের সভায় শ্রীযুক্তা রাধারাণী দত্ত দৃঢ়তার সঙ্গে শনিবারের চিঠির জঘন্যতার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ করেন, তা উল্লেখ করা কি (রবীন্দ্রনাথের পক্ষে) উচিত ছিল না? প্রবাসীতে প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধে তিনি এমন কিছু কিছু কথা বলেছেন, যা সভায় তিনি বলেন নি। দ্বিতীয়, প্রমথ চৌধুরী অপূর্বচন্দ্র, প্রশান্ত যে সব কথা বলেন, তাও উদ্ধৃত করা হ'ল না,—অথচ কোথাকার কে সজনী দাস,—তিনি কি বলেছিলেন তা সযত্নে প্রকাশ করাতে কোন কুণ্ঠা বোধ হ'ল না। মোট কথা রবীন্দ্রনাথের ঐ দু'টি প্রবন্ধ দুই সভার যথাযথ বিবরণ নয়। …সেই সভায় আধুনিক সাহিত্যের পক্ষ থেকে যা যা বলা হয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে সযত্নে বর্জন করা হবে,—এরূপ পক্ষপাতিত্ব আমরা কবিগুরুর কাছে প্রত্যাশা করিনা।…

অধুনা বাঙলা সাহিত্যে একটি পরমবিস্ময়কর ও অভিনব movement শুরু হয়েছে, একথা আমরা বিশ্বাস করি, এবং সেই নব-রসের আস্বাদ বাঙলার প্রত্যেক শিক্ষিত সন্তানকে গ্রহণ করার ভার 'প্রগতি' নিয়েছে।...

—মাসিকী, প্রগতি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫।

১. এই ধরণের অনেক বর্ণনা শুনেছি হরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, অজিত ঘোষ, আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অমূল্যভূষণ সেনের কাছে। অজিত দত্তও লিখেছেন—'অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সকলেরই উৎসাহ তখন ছিল ব্রহ্মচর্য পালন, গীতা পাঠ এবং দেশোদ্ধারের জন্য কোনো দলের কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দিকে। আমি নিজেও কিছুদিন রাজনৈতিক দলে জড়িত ছিলাম।'—কবিতা লেখার কথা, দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৯।

২. 'সে সময়ে অর্থাৎ ইস্কুল জীবনে বুদ্ধদেব ও আমি ছিলাম নিত্যসঙ্গী।'—অজিত দত্ত, কবিতা লেখার কথা, দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৯।

৩. বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ (১৯৭৬), তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬৮২।

৪. অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব (প্রবন্ধ) দেশ, ২৩ চৈত্র, ১৩৮০। অজিত দত্ত, কবিতা লেখার কথা, দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৯।

৫. অজিত দত্ত, কবিতা লেখার কথা, দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৯।

৬. বুদ্ধদেব বসু, আমার যৌবন (১৯৭৬), পৃঃ ৭।

৭. অজিত দত্ত, কবিতা লেখার কথা।

[৮ নং পাদটীকা পাণ্ডুলিপিতে নেই। প্রকাশক।]

৯. শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'আমারে ভুলিও ভাই' পড়িয়া লিখিত।

১০. শ্রীবুদ্ধদেব বসু সহযোগে। Arthur Waley-কৃত ইংরেজী অনুবাদ থেকে। এর আগে কবিতাগুলি বাঙলায় অনূদিত হয়নি বলে তাঁরা দাবি করেছেন।

১১. ইংরেজী থেকে। সংলাপে সাহায্যে নাট্যাকারে লিখিত গল্প। সূচীপত্রে গল্প বলা হয়েছে।

১২. চৌরঙ্গী (উপন্যাস। ১ম কিস্তি, আষাঢ়, ১৩৩৪)—বুদ্ধদেব বসু।

চৌরঙ্গী (উপন্যাস। ২য় কিস্তি, শ্রাবণ, ১৩৩৪)—প্রভু গুহ ঠাকুরতা।

চৌরঙ্গী (উপন্যাস। ৩য় ও ৪র্থ কিস্তি, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৩৪)—শচীন্দ্রনাথ কর।

চৌরঙ্গী (উপন্যাস। ৫ম কিস্তি, কার্তিক, ১৩৩৪,)—বিপ্রদাস মিত্র।

১৩. জাপানী কবিতার অনুবাদ। একা।

১৪. ইংরেজী থেকে অনুবাদ।

অষ্টম অধ্যায়

ধূপছায়ার দিন ঃ বাংলা সাহিত্যে পালাবদল

২৬শে জুলাই, ১৯২৪ ; ১০ই শ্রাবণ, ১৩৩১। এইদিন সাপ্তাহিক শনিবারের চিঠির প্রথম সংখ্যা বের হয়। এর আগে বৈশাখ, ১৩৩০ (১৯২৩) তারিখ কল্লোল আত্মপ্রকাশ করে। শনিবারের চিঠির পরে বৈশাখ, ১৩৩৩ (১৯২৬) তারিখে কালি-কলম, আষাঢ়, ১৩৩৪ (১৯২৭) তারিখে প্রগতি এবং বৈশাখ, ১৩৩৪ (১৯২৭) তারিখে ধূপছায়া ভূমিষ্ঠ হয়। এই সব তথ্যের উল্লেখ করার কারণ আছে। সাহিত্য-মনস্ক পাঠক জানেন, কল্লোল-কালি-কলম-প্রগতি-ধূপছায়া ছিলো আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রবক্তা ও পরিপোষক ; অন্যদিকে শনিবারের চিঠি ছিলো বাংলা সাহিত্যের সংরক্ষণশীল গোষ্ঠীর মুখপত্র ও সমর্থক। পত্রিকাটি জন্মের কিছুকাল পরে থেকেই আধুনিক (বা অতি-আধুনিক) সাহিত্যকে তীক্ষ্ণাগ্র আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকে। শনিবারে চিঠির কর্ণধার সজনীকান্ত দাস তাঁর আত্মস্মৃতিতে সেই আধুনিকতা-বিরোধী ভূমিকার যে সবিস্তার বিবরণ দিয়েছেন, তা কল্লোলের ইতিবৃত্তে আগেই উল্লেখ করেছি। এখানে শুধু এইটুকু লক্ষণীয় যে, শনিবারের চিঠি ও সজনীকান্ত দাস অন্যান্য পত্রিকার সঙ্গে ধূপছায়াকেও আধুনিকতা-পন্থী ও আক্রমণের লক্ষ্যস্থল বলে মনে করেছেন। বর্তমান প্রসঙ্গে ধূপছায়ার কথা আলোচনা করার প্রশ্ন এইজন্যই উঠছে।

ধূপছায়ার প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠার বিবরণ হুবহু উদ্ধৃত করছি—

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা — বৈশাখে, ১৩৩৪

নমুনা সংখ্যা ৯ [sic] আনা — বার্ষিক মূল্য আড়াই টাকা

সম্পাদক

শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়

ধূপছায়ার নিয়মাবলীতে নূতন কোনো কথা নেই। আর দশটা কাগজের মতোই।

সুরেন ভট্টাচার্য বি. এ.

কার্যাধ্যক্ষ-ধূপছায়া

৭৯।২৩ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

আখ্যাপত্রে অতিরিক্ত সংবাদ আছে—মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। পত্রিকাটির সাইজ ছিলো ডিমাই। সম্পাদক রেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বৃত্তিতে ডাক্তার ছিলেন। কয়েকটি সংখ্যার বিষয়সূচি উদ্ধৃত করছি—

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা

বৈশাখ—১৩৩৪ সাল

আনার কলি (কথা-সাহিত্য)—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাঙ্গলিকী (কবিতা)—কল্পনা দেবী

জংলা পাখী (গল্প)—শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

সিন্ধু ও বিন্দু (কবিতা)—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সাতখুন মাপ (গল্প)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কবিগুরুর প্রতি (কবিতা)—প্রভাতকিরণ বসু বি.এ. ও স্নেহময়ী বসুজায়া

মাটির খেলা (দৃশ্যকাব্য)—জ্যোৎস্নানাথ চন্দ

নীলকণ্ঠ (উপন্যাস)—শ্রী……

নিদাঘে (কবিতা)—জিতেন চক্রবর্তী

সাহিত্যের দান (প্রবন্ধ)—অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, এম. এ. বিদ্যারত্ন

সওদা—

প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৪

এই দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে সহ-সম্পাদক হিসেবে শ্রী সুরেন ভট্টাচার্যের নামের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। দ্বিতীয় সংখ্যায় 'সওদা' সহ লেখার সংখ্যা দশ। উল্লেখযোগ্য নতুন লেখক হচ্ছেন—

সাজাহান (কবিতা)—হুমায়ুন কবির

রাখে কেষ্ট মারে কে (গল্প)—জগদীশ গুপ্ত

সূর্যোদয় (ভ্রমণ-কাহিনী)—রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

পরিচয় (কথাসাহিত্য) -অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এম. এ.

প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা

শ্রাবণ—১৩৩৪

এই সংখ্যার উল্লেখ্য লেখক ও লেখা—

রুদ্রের আহ্বান (গল্প)—৺বিজয় সেনগুপ্ত

বঞ্চিত (কবিতা)—হুমায়ুন কবির

ঝড় (গল্প)—পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

একটি চিঠি—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ধূপছায়া

(মাসিক সাহিত্য পত্রিকা)

দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৩৫ সাল

সম্পাদক

রেণুভূষণ গাঙ্গুলি

কর্মসচিব

নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ধূপছায়া কার্যালয়

৭৯।২৩ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত।

দ্বিতীয় বর্ষে আকার হয়েছে প্রবাসীর মতো ডবল ক্রাউন। প্রথম বর্ষে আকার ছিলো ছোট, ডিমাই। সংখ্যাটির প্রথমেই নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের ফোটো মুদ্রিত হয়েছে। বিষয়সূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে আছেন—

ওরে নেশাখোর মন (কবিতা)—সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

সোনার কাঠি রূপোর কাঠি (রস-রচনা)—রেণুভূষণ গাঙ্গুলি

বুকের বিষ (নাটক)—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

তীর্থপথ (উপন্যাস)—যোহান বোয়ার [অনুবাদকের নাম নেই]

দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ সাল

এই সংখ্যায় প্রথমেই ছাপা হয়েছে প্রমথ চৌধুরীর ফোটো। এই সংখ্যার লেখকদের মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে এই—

সাহিত্যে আধুনিকতা (প্রবন্ধ)—প্রমথ চৌধুরী

সত্য-মিথ্যা (গল্প)—প্রেমেন্দ্র মিত্র

কেহ আসিয়াছে (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

দূরের লিপি (কবিতা)—প্রভাতকিরণ বসু

সন্ধ্যাতারা (গল্প)—প্রণব রায়

ঘরে বাইরে—গ্রহাচার্য

সওদা—উপগুপ্ত

দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা

আষাঢ়, ১৩৩৫ সাল

সম্পাদক

রেণুভূষণ গাঙ্গুলি : অরিন্দম বসু

লক্ষণীয় এই যে, আষাঢ় সংখ্যা থেকে সম্পাদক একজন নয়, দু'জন। এই সংখ্যার উল্লেখ্য লেখা ও লেখক—

হে ধরণী বক্ষে তব (কবিতা)—অজিতকুমার দত্ত

সুধা ও গরল সম (কবিতা)—সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

কবি সত্যেন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)—সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

ঘরে বাইরে

ধূপছায়া কতদিন চলেছিলো এবং পত্রিকাটির মোট কতগুলি সংখ্যা বেরিয়েছিলো তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। কারণ পত্রিকাটির সামগ্রিক ফাইল পাওয়া যায় না। তবে ধূপছায়া যে ক্ষীণকায় ও অল্পজীবী ছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এটা জানা গেছে যে, সম্পাদক রেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় পেশায় চিকিৎসক হলেও সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। পত্রিকাটির গ্রাহকসংখ্যা ও বিক্রীর পরিমাণ ছিলো অত্যন্ত সীমিত। তৎসত্ত্বেও রেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় যতদিন পেরেছেন নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে কাগজটি চালিয়েছেন।

২.

পত্রিকাটির আকারে ও প্রকারে জৌলুস ছিলো না। প্রত্যেক সংখ্যাতে লেখার সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বেশি ছিলো না। তবু ধূপছায়াকে যে অতি-আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান দেওয়া হয়, তার কারণ পত্রিকাটি কখনও সাহিত্য-শাসকদের স্তাবকতা করেনি এবং যতটা পেরেছে নতুন সাহিত্যেরই পোষকতা করেছে। তার কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩৩৪) প্রকাশিত শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের জংলা পাখী এক ডব্‌কা ছুঁড়ির গল্প। চোখের বিদ্যুৎ দ্বিগুণ করে ময়না নামে সেই ছুঁড়ি বাবুর বাড়ি ঝিয়ের কাজে যায়। তার ভিজে কাপড়ে যৌবন যখন উথলে ওঠে, তখন বাবুলাল চোখ তুলে চাইতে পারে না। এ-গল্পে অশ্লীলতা আছে বলে সজনীকান্ত মনে করেন, কারণ এ-গল্পেও তাঁর লাল পেন্সিলের দাগ পড়েছিলো। তবে ময়নার গল্পে যদি অশ্লীলতা থাকে তবে রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ', শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' ও 'বিরাজ-বৌ'-তেও অশ্লীলতা আছে। এখানে ময়নার ঠোঁট দুটো দোক্তার রসে টল্‌টলে, 'যোগাযোগে' যে শ্যামার যৌবন যাই-যাই করেও যায়নি সেই শ্যামার ঠোঁট দুটো টস্‌টসে। ভিজে-কাপড়ে ময়নার যৌবন অনিবার্যভাবেই স্মরণ করিয়ে দেয় ভিজে-কাপড়ে রমা ও বিরাজের শারীরিক যৌবন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখা গল্প 'সাত খুন মাপ'। এক সাত-আগুনে-পোড়া গরিব মানুষের কাহিনী। কাঠের ঘোড়া, সজ্‌নে গাছ, উইর ঢিবি, খাড়ু পেসাদি, ঘর আর চালকুমড়োর লতা—এক এক করে বুড়ো বেচারামের জগতে সাতটি খুন হয়ে গেলো ;—এক-একটি খুন হয়, আর সে ক্ষুরে শান্ দেয়। কিন্তু সে-সবই নির্বিষ ফণার ফোঁস ফোঁসানি—শেষ পর্যন্ত নিজের গলায় ক্ষুর চালিয়ে তিন বছর জেল খাটলো বেচারাম। সংসারের অসহায় দুর্বল মানুষের আত্মহননের এক তীক্ষ্ণাগ্র কাহিনী রচনা করেছেন অচিন্ত্যকুমার। 'গেঁয়ো মেয়ের গা-ভরা সবুজ মাঠের স্বপ্ন, বুড়ো বেচারামের চোখ দুটো নরম হয়ে আসে'—এই ধরনের বাক্য-বিন্যাসের মুন্সিয়ানা অচিন্ত্যকুমারের বরাবরই করায়ত্ত।

পত্রিকাটির প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (শ্রাবণ, ১৩৩৪) 'রুদ্রের আহ্বান' নজরুলের নিজস্ব ঢঙের কবিতা। এখানে নতুন যুগের ভেরী বেজে উঠেছে—'আজি রুদ্রের রথ থেমেছে তোদেরি অঙ্গনে, | ওরে পুরবাসী, তোরা সবে তার সঙ্গ নে।' ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'একটি চিঠিতে' যতীন্দ্রনাথ সিংহ, অনুরূপা দেবী থেকে শুরু করে সজনীকান্ত দাস পর্যন্ত সব সনাতনীকে এক হাত নিয়েছেন। তিনি কোনো 'মহিলা ও নারীময় পুরুষকে' বাদ দেননি। বাইরে কৌতুক, অন্তরে গভীর ব্যঞ্জনা —এই ভঙ্গিতে তিনি এই চিঠি লিখেছেন। যাঁরা মনে করেন 'আধুনিক সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের সকলেই বায়ুগ্রস্ত, এবং তাঁদের স্নায়ুবিকারের জন্য যৌবন-সুলভ চিত্তচাঞ্চল্য দায়ী', তাঁদের প্রতি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ চিঠিটির ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে।

ধূপছায়ার দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩৩৫) আছে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের লেখা নাটক 'বুকের বিষ'। নরেশচন্দ্র বয়োজ্যেষ্ঠ লেখক হলেও প্রগতি-পন্থী ছিলেন। তাই তিনি ছিলেন তরুণ সাহিত্যসেবীদের কাছে প্রিয়। এই সংখ্যায় নরেশচন্দ্রের ফোটো ও নাটক ছেপে ধূপছায়া তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রদর্শন করেছে। বোয়ার সেকালের উঠতি লেখকদের মন ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর 'A pilgrimage' শীর্ষক উপন্যাস 'তীর্থপথ' নামে বাংলায় অনূদিত হয়েছে। সৌরীন্দ্রমোহন কবি হিসেবে উল্লেখযোগ্য নন, কিন্তু তাঁর কবিতাটির একটি চাঞ্চল্যকর পংক্তি উল্লেখযোগ্য এবং শনিমণ্ডলকে খেপিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট—'ফুল ফোটে কিরে চুমু-খাওয়া তার অধরের কুঙ্কুমে ?' এই বৈশাখ সংখ্যার বিজ্ঞাপন আছে—'আসছে সংখ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প।' এর অর্থ হচ্ছে, প্রেমেন্দ্র মিত্র ততদিনে বিজ্ঞাপিত হওয়ার মতো লেখক হয়ে উঠেছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ধূপছায়া পত্রিকায় যে-সব লেখা প্রকাশিত হতো, তাতে অতি আধুনিক সাহিত্যের প্রতি পক্ষপাত স্পষ্টই ফুটে উঠতো। আসল কথা, কাগজটি সাহিত্যে রক্ষণশীলতার সমর্থক ছিলো না।

৩.

অন্যের লেখায় যে সব মতামত প্রকাশিত হয়, তা কখনওই কোনো পত্রিকার নিজস্ব মতামত হতে পারে না। অবশ্য লেখক ও লেখা নির্বাচনের মধ্যে পরোক্ষভাবে পত্রাধ্যক্ষের পছন্দ অপছন্দের প্রতিফলন ঘটে। ধূপছায়া পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি লেখা বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে আধুনিকতা তথা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি কোথায়, তা দেখাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আরও স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে পত্রিকাটির 'সওদা' ও 'ঘরে বাইরে' বিভাগে কিছু কিছু সম্পাদকীয় মন্তব্যে। ওগুলি ধূপছায়ার সম্পাদক নিজেই লিখতেন। মনে রাখতে হবে, কল্লোল বাংলা সাহিত্যের সংরক্ষণশীল গোষ্ঠীর দ্বারা অশ্লীলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার দায়ে অভিযুক্ত আসামী রূপে ধিকৃত হয়েছিলো, কিন্তু অতি-আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে দু' একটি প্রবন্ধ বা পত্র প্রকাশ করা ছাড়া পত্রিকাটি আধুনিকতার সপক্ষে সম্পাদকীয় ওকালতি করার তেমন কোনো চেষ্টা করে নি। কালি-কলম সম্পর্কে মোটামুটি একই কথা বলা চলে, অবশ্য 'সাহিত্যের আটচালা' বিভাগে এর কিছু ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু প্রগতি ও ধূপছায়া একই সঙ্গে অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আসামী ও ফরিয়াদী। সেকালের সাহিত্যিক বাদানুবাদে ধূপছায়া কতটা ছড়িয়ে পড়েছিলো তা 'সওদা' বিভাগটি মনোযোগ দিয়ে পড়লে বোঝা যায়।

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা 'সওদায়' নতুন সাহিত্যের কিছু ইঙ্গিত আছে। 'বলে —মানে বুঝিনা কবিতার। যেন না বোঝাটাই তার অহংকার। কিন্তু কে তাকে জিগ্‌গেস করবে—তোমার মন কতখানি? বোঝবার কতটুকু অধিকারই বা তোমার আছে? উপক্রমণিকা প'ড়ে বুঝতে চায় উপনিষৎ,—পদ্মমালা সাঙ্গ করেই বলাকা।...

বলে—রচনাভঙ্গী ত নয়, মুদ্রাদোষ!...বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে দিয়ে আরেকদিনের পুরাণো পথে প্রাচীন গরুর গাড়ী চ'ড়ে যারা চলতে চায়, চলুক! যদি কেউ ঢিমেয়ে চলার পক্ষপাতী না হয়ে পায়ে হেঁটেই ঘুরে ঘুরে মাঠ পেরোতে চায়, যেতে দাও তাকে। পায়ে কাঁটা ফুঁড়বে, কাদা লাগবে—লাগুক একটু। খোলা মাঠের হাওয়াও সঙ্গে সঙ্গে লাগুক গায়ে।...

যাঁরা ভাবে প্রাচীন তাঁদের পারি শ্রদ্ধা করতে; ভালবাসতে তাঁদের, যাঁরা তরুণ। আর যাদের না আছে গাম্ভীর্য, না আছে নিবিড়তা, যারা লট্‌কে আছে এ দু'য়ের মধ্যে—আধমরা যারা,—রাতকানা—তারা পাঁজি লিখুক সাহিত্য ছেড়ে।

বাংলা সাহিত্যের অভিভাবকদের অভিবাদন করি। রমাকে গালাগালি না দিয়ে আমিনাবিবিকে নিয়ে তাঁরা শিক্ষানবীশ করুন।

সিংহের গলা ভেঙে যাওয়ায় যদি গর্জন না বেরোয় তবে কুনো ব্যাঙই আসুন এবার।'

লক্ষণীয় এই যে, সেই যতীন্দ্রনাথ সিংহ যিনি 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' গ্রন্থ লিখে শরৎচন্দ্রকে আক্রমণ করেছিলেন, তিনিই এখানে ধূপছায়ার আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয়েছেন।

প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যার (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪) 'সওদা' বিভাগে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সপক্ষে কিছু চাঞ্চল্যকর উক্তি আছে—'(চরিত্রহীনের) উপেনকে স্বীকার করি না কিরণময়ীকে ছাড়া। উপেন শুধু মূর্তি,—কিরণময়ীতে তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। কিরণ-ময়ীকে চিনি বলেই উপেনকে চিন্‌লাম। তাই কিরণময়ী থাকাটাই বড় সত্য। তাই কিরণময়ীকে আগে প্রণাম না করলে উপেনের কাছে প্রণাম পৌছবে না।'

এতো গেলো শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে ধূপছায়ার খোলাখুলি সমর্থনের কথা। তারও পরবর্তী সাহিত্য সম্পর্কে পত্রিকাটির স্পষ্টবাদিতার অভাব ছিলো না। অতি-আধুনিক সাহিত্য নিয়ে সজনীকান্ত দাস ও শনিবারের চিঠির ভূমিকা পত্রিকাটি সরাসরি অগ্রাহ্য করেছে। প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা (শ্রাবণ, ১৩৩৪) ধূপছায়ার 'সওদায়' তিরস্কারের ভঙ্গিতে সজনীকান্তকে 'সজ্‌নে কাঠি' বলা হয়েছে, বলা হয়েছে 'দাঁত খুঁচাবার খড়্‌কে 'পুঁচকে দু'আনি।'[১] আরও বলা হয়েছে 'বাসি প্রবাসী আর মেকী বিচিত্রা।' উল্লেখযোগ্য আর একটি মন্তব্য—'অভিজাত সাহিত্য মানে গরদের পাঞ্জাবীর সাহিত্য। কিন্তু পাঞ্জাবী ছিঁড়ে গেলে, বা টায়ার ফাট্‌লেই তা বেমালুম অপকৃষ্ট সাহিত্য হয়ে যাবে। কানাকে পদ্মলোচন বলে ডাকলেই সে অভিজাত!'

প্রথম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা (ভাদ্র, ১৩৩৪) 'ধূপছায়ার' 'সওদা' থেকে কিছু মন্তব্য উদ্ধৃত করছি—'আধুনিক সাহিত্যে বে-আব্রুতা এসেছে বলে' রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্বাস, তা তিনি কি নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বল্‌ছেন না আর কারু ভুয়ো ফালতু উপদেশ শুনে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে। আধুনিক সাহিত্যে যে নির্জলা নির্লজ্জতা এসেছে এবং তার অন্তরালের মনোভাব যে একান্তই অসঙ্গত,—আজকালকার লেখার সঙ্গে পরিচিত হয়ে গবেষণা করে, তিনি যদি এই সহজ সিদ্ধান্তে এসে থাকেন,—তবে অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তার আব্রু খুলে কেন তিনি বলতে সাহস করলেন না, কা'র কা'র ও কোন্ কোন্ লেখা মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে পঙ্কিল হয়েছে! অন্ততঃ সমালোচনা থেকে আব্রু বাদ দিলে হয়ত রসবোধের আভিজাত্য লাঞ্ছিত হয় না।

আধুনিক সাহিত্য বল্‌তে তিনি কি বুঝেছেন তাও স্পষ্ট করে জানানো উচিত

ছিল।[২] কেননা রবীন্দ্রনাথ নিজেও পৌরাণিক নন্। এক কালে ছিল তাঁর বিমলাও সকলের চোখে বিমলা ছিল না। অনেকের তাকেই অত্যন্ত বে-আব্রু লেগেছিল।...

...আধুনিক সাহিত্যে এমন কোনো বে-আব্রুতা আসেনি, যা'কে নির্বিচারে অসঙ্গত বলা যেতে পারে। যদি কিছু বা এসেই থাকে তার নাম অশ্লীলতা নয়,—অক্ষমতা। আধুনিক সাহিত্যে হট্টগোলই বা কোথায়, অট্টহাস্যই বা কোথায়,—তবে এতে যে নবশক্তির উদ্দীপনা আছে, আছে মৌলিকত্ব, জীবনকে নূতন সুসম্পূর্ণ করে' লাভ করবার জন্যে আগ্রহ ও সংগ্রাম, দুঃখ দারিদ্র্য অভাব উৎপীড়নের সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা,—এবং জ্যোতির্ময় আদর্শের অনুপ্রাণনা—সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই।'

দ্বিতীয় বর্ষের (১৩৩৫) জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রমথ চৌধুরীর 'সাহিত্যে আধুনিকতা' প্রবন্ধের সঙ্গে যে সম্পাদকীয় পাদটীকা মুদ্রিত হয়েছে তা উদ্ধারযোগ্য। কারণ এতে ধূপছায়ার মতাদর্শের একটা পরিচয় পাওয়া যাবে। মন্তব্যটি এই—'কয়েকদিন আগে রামমোহন লাইব্রেরিতে "সাহিত্যে আধুনিকতা" সম্বন্ধে একটি আলোচনা সভা বসে। সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী। সভাতে শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা একটি অতি-দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতি-আধুনিক বাংলা-সাহিত্য যে কিছুই নয়, কতকগুলি প্রাদেশিক শব্দের সংযোগে অসুন্দর ভাষার দৌরাত্ম্য মাত্র,—এবং এই সাহিত্যের বিষয়বস্তু অশ্লীল তো বটেই, সমাজের পক্ষেও নাকি অসম্ভব রকমের অকল্যাণকর। সেদিন লাহা মহাশয় এমন ধরণের অনেক কিছুই বলেছিলেন—তাঁহার বলার মধ্যে, যুক্তি যতখানিই থাক্—কবিত্ব ছিল প্রচুর, নাটকীয় হাবভাবও কম কিছু নয়; সর্বোপরি ছিল—মনের ঝাঁজ ও ঈর্ষা।

সাহিত্যে আধুনিকতার বিষয় বলতে গিয়ে তিনি অন্ততঃ দশ বারোটি বিষয়ের অবতারণা করেন—কিন্তু সবগুলিই অপ্রাসঙ্গিক ও নিতান্তই অহেতুক। তাঁর সবচেয়ে বড় কথা আধুনিক তরুণ সাহিত্যিকগণ বঙ্গ-বাণীর কমল বনে পচা নর্দমা কাটছেন,—সুসাহিত্য কি তাঁরা তা' জানেন না—সেরূপ শক্তিও তাঁদের নেই—ইত্যাদি।

সভায় অনেকেই উপস্থিত ছিলেন—যথা, ডাঃ কালিদাস নাগ, শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, কবি নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি।

লাহা মহাশয়ের ঘণ্টা-ব্যাপী প্রবন্ধ-পাঠের পর,—সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন।

সম্প্রতি, তাঁর নিকট হতে সেই আলোচনাটি পরিবর্ধিত প্রবন্ধ আকারে পাওয়া [য়] "ধূপছায়ায়" প্রকাশিত হ'ল।'—সম্পাদক।

ওই সংখ্যার 'ঘরে বাইরে' বিভাগ থেকে উদ্ধার করার মতো কিছু কথা আছে। ধূপছায়া যে অতি-আধুনিক সাহিত্যের পোষকতা করতো তার স্পষ্ট নিদর্শন এতে পাই—'অতি আধুনিক কথাটার অর্থ লইয়া বাদ বিসম্বাদ চলিতেছে যথেষ্ট। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তর্কটা নিরর্থক। শ্লীলতা কিম্বা অশ্লীলতা, প্রাদেশিকতা, অথবা এমন কোনও লেখার ধরণ-সম্বন্ধীয় বিশেষত্বের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক কিছু নাই। ধূপছায়া, কল্লোল অথবা প্রগতির ছাপ মারা থাকিলেই অতি আধুনিকের পর্যায়ে পড়িল, অথবা কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের অনুকরণে যাঁরা লেখেন তাঁরাই শুধু ঐ বিশেষণটার গৌরব দাবী করিবেন এমন কোন কথা হইতে পারে না। সাময়িক ইতিহাসের সঙ্গে অতি আধুনিকের সম্পর্ক আছে এবং এই সম্পর্কটার মধ্যেই তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজ এবং চিন্তার ধারায় বাইরে ইহার অর্থ খুঁজিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। লেখকের বয়স অথবা লেখার ধরণের মধ্যে অতি আধুনিকত্বের কোনও প্রমাণ বা যুক্তি নির্ভর করে না। যে লেখার ভিতরে যুগধর্মের প্রভাব পূর্ণভাবে ফুটিতে দেখি, বর্তমান সমাজ এবং সভ্যতার রূপটুকুই যাহার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে কেবল তাহাকেই আমরা অতি আধুনিক বলিয়া স্বীকার করিব।—সে লেখার লেখক তরুণ হোন বা বৃদ্ধ হোন, সে খোঁজে আমাদের দরকার নেই।

হাজার বছর আগে সমাজে যে আদর্শ ছিল, আজ যদি মানুষ তা না স্বীকার করে, আমাদের সাহিত্যও আমরা বর্তমান আদর্শকেই বড় বলিয়া মানিব। পুরাতনকে না মানার নাম বিদ্রোহ নয় কিছুতেই।...

...বিবাহের বন্ধনটাকেই মানুষ সব সময় বড় বলিয়া মনে করে না।...কেবলমাত্র স্বামীত্বের অধিকারের দাবীতে স্ত্রীর দেহটিকে হয়তো বাঁধিয়া রাখা সম্ভব হইতে পারে মনের উচ্ছ্বাস বা উচ্ছৃঙ্খলতা কেমন করিয়া রোধ করিবে? এমনি চলিবার পথে প্রতি পদক্ষেপে আজ আমরা প্রতি মানুষকেই মুক্তি দিতে চাই যদি,—তাতে হয়তো ইষ্ট বা অনিষ্ট অনেক কিছুই ঘটিতে পারে, তথাপি সেইটাই জীবনের লক্ষণ।...

...বস্তির চিত্র আঁকা, অসহায় পতিতা সমস্যা লইয়া মাথা ঘামান উচিত না, গরীব দুঃখী এবং মুটে মজুরের ব্যথা বেদনার ছবি অহেতুক—এমন বিধিনিষেধের মানে হয় না। ব্যারিষ্টার দত্ত সাহেবের সংসারের সম্পূর্ণ চিত্রটীরও সাহিত্যের দরবারে প্রবেশের যতটুকু অধিকার আছে পতিত এবং দুঃখীরও তেমনি।

...অতি আধুনিকদের সমালোচনা করিতে গিয়া আমরা আর একটা কথা প্রায়ই ভুলিয়া যাই,—এঁরা শুধু যে দুঃখের কবি, তা নন। এঁরা আনন্দকেও প্রাণ দিয়ে অনুভব করেন।

···রবীন্দ্রনাথ একদিন সাহিত্যের সীমানার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা নির্দেশ করিতে গিয়া নরেশচন্দ্রকে কতই নাকাল হইতে হইয়াছে। কোন কোন বিষয়বস্তু সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হইবে, কোন গুলাই বা বাতিল এ আলোচনার শেষ মীমাংসা হওয়া অসম্ভব; তর্ক চিরদিনই চলিবে।

সত্যেন্দ্র দত্ত অক্ষয় বড়ালের কথা ছাড়িয়া দিলে রবীন্দ্রনাথের পরে সত্যিকারের কবি চিনিয়া লইতে অনেক কষ্ট পাইতে হয়। মাঝে মাঝে যতীন সেনগুপ্ত, মোহিতলাল, অচিন্ত্য, নজরুল, সৌরীন চট্টোপাধ্যায় এবং বুদ্ধদেবের দু-একটা কবিতার মধ্যে কিছু কিছু কবিপ্রতিভার লক্ষণ দেখিতে পাই। সৃষ্টির সৌন্দর্য বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য ওঁদের লেখার মধ্যে ফুটে ওঠে।—কিন্তু সে কতটুকু মাত্র? (রবীন্দ্রনাথের প্রশংসার পর)···মোহিতলাল একরূপে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে অভিযান করিতেছেন সদর্পে, আর একরূপে কবিতা যে কত অশ্লীল লেখা যায় নিজের সঙ্গেই নিজে প্রতিযোগিতা ঘোষণা করিতেছেন, ওঁর শক্তি কি ঐটুকুতেই পর্যাপ্ত? অচিন্ত্য কি ভাবিতেছেন মরীচিকা ছন্দে প্রিয়ার উদ্দেশে দুফোঁটা ব্যর্থ চোখের জল ফেলা ছাড়া তাঁর আর কোনও শক্তি নাই?

···যতীন সেন, মোহিতলাল, অচিন্ত্য, প্রেমেন, সৌরীন, বুদ্ধদেব প্রভৃতি আধুনিক যুগের কবিযশঃপ্রার্থী সকলেই ফাঁকি দিয়া কাব্য সাহিত্যের শুধু একটি অথবা আর একটা অংশের প্রতিকৃতি আঁকিয়াই নাম করিতে চান,—কিন্তু এরকম আশা করাটা ধৃষ্টতার নামান্তর।'

'সওদা'য় কোথায়ও প্রত্যক্ষভাবে, কোথায়ও প্রচ্ছন্নভাবে নিন্দা আছে মোহিতলাল, রাজশেখর বসু [?], রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের। অন্তিমে 'কালি-কলম' সম্পর্কে একটি মন্তব্য আছে—'কালিকলমের ত্র্যহস্পর্শের[৩] যোগটা ভালভাবেই কেটে গেছে,—এবার দেখা যাক্—গঙ্গাস্নানের ফল কতখানি।'

দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (আষাঢ়, ১৩৩৫) 'ঘরে বাইরে' বিভাগে শনিবার চিঠির প্রতি বিষোদ্গার আছে। উদ্ধারযোগ্য মন্তব্য—'যদি মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্যই শনি দেবতার আবির্ভাব হয়ে থাকে, অন্ততঃ এটুকু ওঁদের দেখা উচিত, যে লেখা যাঁর হাত থেকে বেরিয়েছে তাঁর দোষ বা গুণের জন্য শুধু তিনিই নিন্দিত বা প্রশংসিত হোন। সৎ সাহসের অভাবটা কি ওঁদের বংশগত অধিকার?'

১. শনিবারের চিঠির প্রতি সংখ্যার মূল্য দু'আনা ছিলো। তাই এই বিদ্রূপ।
২. [পাণ্ডুলিপিতে পাদটীকা নেই। প্রকাশক।]
৩. প্রথম বর্ষের (১৩৩৩) কালি-কলমের সম্পাদক ছিলেন তিনজন, দ্বিতীয় বর্ষের (১৩৩৪) কালি-কলমের সম্পাদক হলেন দুজন। উক্তিটির মধ্যে তারই ইঙ্গিত আছে।

নির্ঘণ্ট—১

অ

খ

গ

চ

নির্ঘণ্ট—২

(পত্র-পত্রিকা ও প্রতিষ্ঠান নাম-সূচি)

যেহেতু কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি ও ধূপছায়া নিয়ে গ্রন্থটি রচিত, সেইকারণে নির্ঘণ্টে পত্রিকাগুলির উল্লেখ নেই। সংকলক